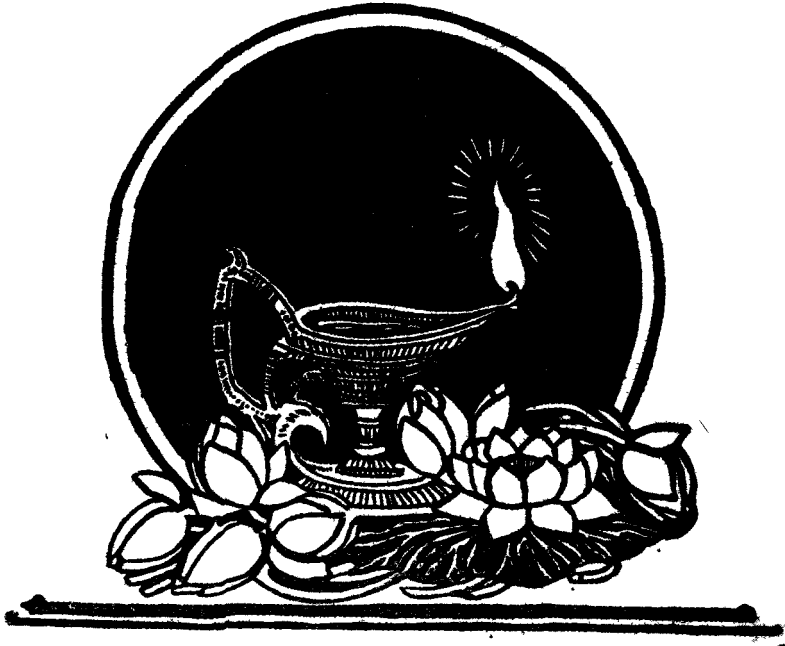


1957 (Ma)



093-7
P.926

প্রিন্সিপাল কলেজ
পত্রিকা



১৩৬৩

17-1
08

সূচীপত্র

	<i>Page</i>
কলেজ প্রসঙ্গ	১
বিদিশা	৫
আজকের কবিতা	৭
স্থির মেঘ	৮
সুরঞ্জনা বধু	৯
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
অজ্ঞাত-ভারতীয়ের আত্মজীবনী	১১
সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ	১৪
নূতন মানবতাবাদ	৩০
নিতান্তই সন্ধ্যার গল্প	৩৯
কলেজ স্ট্রীট	৪২
অন্যতর মূল্যায়নে	৪৭
'প্যাশন-প্লে'	৫৬
এমিয়েলের জার্নাল ও রবীন্দ্রনাথ	৬০
চেস্টারটন ও ইংরেজী সাহিত্যের এক অধ্যায়	৬৬
প্রকৃতির রূপ	৬৮
শেষ কথাটির শেষ নাই	৭১
ডাক্তার ও জরাসন্ধ	৭৬
আমাদের কথা	৮১
FOREWORD	1
THOUGHTS FOR THE FOUNDERS' DAY	1
MARXISM AND LITERATURE	3
THE "IMPERFECTIONS" OF SHAKESPEARE'S STAGE	7
THE FASCINATION OF SHOP WINDOWS	10
A CRITIQUE OF MARXIAN ECONOMICS	12
SOME ASPECTS OF CONTEMPORARY CAPITALISM	18
A FEW NOTES ON INDIA'S PEACE POLICY	25
SOME IMPRESSIONS ON MUSIC	31
THE BEGINNINGS OF THE EUROPEAN DIPLOMATIC SYSTEM	33
PAUL SWEEZY'S QUESTIONS	36
ON A HOLIDAY BY THE SEA WITH ME	41
THE FALLACY OF GENERAL WILL	45
COLOUR PHOTOGRAPHY	52
USE OF RADIO ISOTOPES IN MEDICINE AND INDUSTRY	55
FAREWELL ADDRESS OF PROF. S. C. SIRCAR TO THE STUDENTS OF THE COLLEGE	59
EDITORIAL	61

এই সংখ্যার সম্পাদনী সভা

অধ্যাপক ডাঃ অমলেশ ত্রিপাঠী (সভাপতি)

„ শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

„ শ্রীঅমল ভট্টাচার্য

„ শ্রীহীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীঅশোককুমার চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক)

শ্রীসুবল দাশগুপ্ত (কর্ম-সচিব)

ছবির রক করেছেন শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ—শ্রীগোরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
গত শতবার্ষিকী স্মারক সংখ্যার আলোকচিত্রগুলি
ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কে. বালসুব্রাহ্মানিয়ামের
সৌজনে প্রাপ্ত ।

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

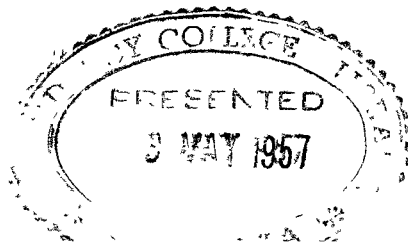
Foreword

Once again the College Magazine makes its appearance, and I gladly write the usual brief prefatory message.

Though it is not as bulky as the Centenary number, readers will find in the present issue of the Magazine no variation from the uniformly high quality, both of style and of matter, which they have come to expect—and rightly—from a Presidency College publication.

I may be permitted a brief reference to our late beloved Governor, Dr. H. C. Mukherjee. His death on the 8th August, 1956, removed from our midst one of the most distinguished of ex-Presidency College men. May his exemplary devotion to duty, and his many other qualities of head and heart, be long remembered with the admiration they deserve, and may their remembrance encourage in us a spirit of noble emulation!

F. P.





“বিহেলম নদীর তীর”

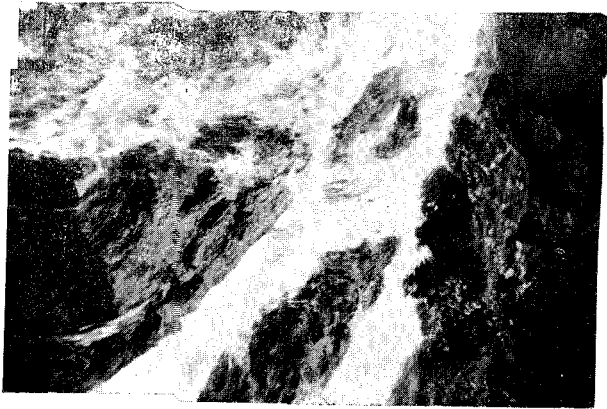
বন্দনা রায়
পদ্মগ বর্মা, কলা



“মৌনগিরি”



“শান্তধারা”

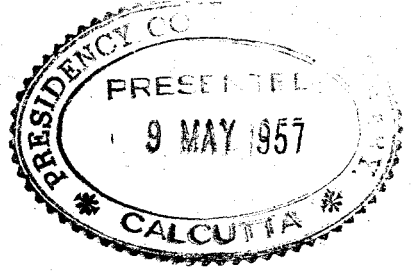


“উন্মত্ত”



“তুবার-মৌলি হিমালয়”

আলোকচিত্র—পঞ্চানন মিত্র
তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান



প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা

ফাল্গুন ১৩৬৩

:::

অষ্টত্রিংশৎ বর্ষ

:::

মার্চ, ১৯৫৭

কলেজ-প্রসঙ্গ

পত্রিকার কথা

বৎসরান্তে একবার, কখনও বা দুবার, এ পত্রিকা আপনাদের হাতে পৌঁছায়। তাই স্বভাবতঃই সবার মনে এ আশা থাকে যে আমাদের এ পত্রিকা সব পাঠকেরই মনোরঞ্জন সমর্থ হবে। সেদিক দিয়ে পত্রিকার এ সংখ্যা কতদূর সফল হয়েছে তার বিচারের ভার আপনাদের ওপর। তবে বিরূপ সমালোচনার ভার যখন সবটাই বহঁতে হয় সম্পাদককে তখন নিজের তরফ থেকে দু'একটা কথা বলা বোধহয় আবশ্যিক।

এ পত্রিকাকে মনোরম ও সুখপাঠ্য করে তোলার ভার সম্পূর্ণরূপে আপনাদেরই। সেখানে সম্পাদকের স্থান অনেকটা অর্থনীতির ভাষায় "middleman"-এর মতন আপনাদের তরফ থেকে সাড়া না পেলে সম্পাদক সম্পূর্ণরূপে অসহায়। যেমন আশা ছিল পত্রিকার এ সংখ্যায় একাধিক গল্প, রম্যরচনা, কৌতুক-রচনা, সাহিত্য-চিত্রকলা প্রভৃতি নিবন্ধের সন্নিবেশে আমাদের পত্রিকার নামে দুর্বোধ্যতার যে ঘোরতর অপবাদ তা বহুলাংশে ঘোচাতে পারব। কিন্তু আপনাদের তরফ থেকে উপযুক্ত সাড়ার অভাবে তা আর সম্পূর্ণরূপে সম্ভব হল না। বিশেষ করে বাংলা বিভাগে লেখার দৈন্য আমাদের ভীষণভাবে হতাশ করেছে। এ সংখ্যার জন্ম তাই অধ্যাপকদের শরণাপন্ন হতে হল। তবে আশা করি পরের সংখ্যায় আপনাদের লেখনীচালনায় অধ্যাপকেরা স্থানচ্যুত হবেন এবং এর জন্ম তাঁরাই আনন্দিত হবেন সবচেয়ে বেশি।

এদিক দিয়ে ইংরেজী বিভাগটি বেশি মর্যাদা দাবি করতে পারে, কারণ এখানে সব লেখাই ছাত্রদের এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, ললিতকলা প্রভৃতি কোন দিকই অবহেলিত হয়নি। এই বিভাগে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ওপর দুটি বিরোধী দৃষ্টিকোণ থেকে একটি আলোচনা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত লেখাদুটি শেষ মুহুর্তে এসে না পৌঁছোনয় তা আর সম্ভব হল না।

যা হোক, এই পত্রিকা প্রকাশের জ্ঞান যাদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি তাদের সবাইকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আশা করি আপনাদের সমালোচনায় অভিজ্ঞ হয়ে পরবর্তী সংখ্যাটি আরও সুন্দর ও মনোরম করে প্রকাশ করতে সক্ষম হব।

কলেজে পরিবর্তন

কলেজে পরিবর্তনের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই মনে হয় আমাদের কলেজ তার প্রিয় অধ্যাপক শ্রীমুশোভন সরকারের সংস্পর্শ হারিয়েছে। গত চব্বিশ বছর ধরে তিনি এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং নানা দিক দিয়ে আন্তরিকভাবে এর সেবা করেছেন। এই দীর্ঘকাল ধরে ছাত্রসমাজে ও সহকর্মীদের ভেতর তিনি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্থান অধিকার করে ছিলেন তা আর পূর্ণ হবার নয়।

কলেজের অগ্রাগ্রহণ বিভাগেও গত এক বছরে বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র অবসরগ্রহণ করেছেন। ইতিহাসের অধ্যাপক এ. ডব্লু. মাহমুদ ও গণিতের অধ্যাপক ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ বসু যথাক্রমে হুগলি মহসিন কলেজ ও দার্জিলিং কলেজের অধ্যক্ষপদে উন্নীত হয়েছেন। ভূবিদ্যা বিভাগের শ্রীপ্রিয়ংকর চক্রবর্তী, ভূগোল বিভাগের শ্রীপ্রমথনাথ হোড়, সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগের শ্রীসমরেন্দ্রকুমার ধর, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীশ্রীমাশঙ্কর ভট্টাচার্য এবং বাংলা বিভাগের শ্রীঅজিত দত্ত এ কলেজ ত্যাগ করে অগ্রাগ্রহণ চলে গিয়েছেন। ইংরেজী বিভাগের শ্রীকালীপদ দাশগুপ্ত উচ্চতর শিক্ষালাভের জ্ঞান ইংলণ্ডে গিয়েছেন। রসায়ন বিভাগের ডক্টর সুভাষকুমার ঘোষ ও ডক্টর শিশিরকুমার সিংহ অগ্রাগ্রহণ বদলী হয়েছেন।

বিদায়ী অধ্যাপকদের স্থান পূরণ করেছেন নতুনরা। তাঁদের মধ্যে সেন্ট্রাল ক্যালকাতা কলেজের অধ্যাপক শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগে যোগদান করেছেন। ইংরেজী বিভাগে শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, বাংলা বিভাগে শ্রীভবতোষ দত্ত, শরীর বিজ্ঞানে শ্রীপ্রফুল্ল কর্মকার, রসায়ন বিভাগে শ্রীপ্রভাতনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপরিমলকৃষ্ণ সেন, ভূবিদ্যা বিভাগে শ্রীমিহিরকুমার বসু, সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে শ্রীনিতাই ঘোষাল বিভিন্ন অধ্যাপকদের শূন্য স্থান পূর্ণ করেছেন। অর্থশাস্ত্র ও রাজনীতি বিভাগের শ্রীপ্রভাকর সেন ও ডঃ ভবতোষ দত্ত এবং ভূ-বিদ্যা বিভাগের ডক্টর অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে স্ব স্ব পদে পুনরায় যোগ দিয়েছেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ডক্টর পরমনাথ ভাড়াড়ি প্রধান অধ্যাপকপদে,

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে ডক্টর সমরেন্দ্র ঘোষাল অধ্যাপকপদে এবং শরীরবিজ্ঞান বিভাগে শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় সহকারী অধ্যাপকের পদে উন্নীত হয়েছেন। দর্শন ও সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে দুটি নতুন পদের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে যথাক্রমে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীনরেশনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীঅতীন্দ্রমোহন গুণ।

কলেজে পরিবর্তনের বিবরণ শেষ করার আগে কলেজে দুটি নতুন পঠিতব্য বিষয় যোজনার কথা উল্লেখ করা দরকার। অ্যাডভান্সড অপটিক্স ও এক্স-রে—পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ পঠিতব্য বিষয় হিসেবে এ দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া পাস বিষয় হিসেবে সংখ্যাবিজ্ঞান অধ্যয়নের ব্যবস্থাও এ বছর থেকে করা হয়েছে।

পরীক্ষার ফলাফল

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় অসামান্য সাফল্যের যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য আমাদের কলেজে গড়ে উঠেছে এবারেও তা কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নি। আই এ এবং আই এন্-সি পরীক্ষায় আমাদের পাশের হার যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৯৯ ও ৯৫'৪। আই এ-তে প্রথম দশজনের মধ্যে চারজন এবং আই এন্-সি-তে প্রথম দশজনের মধ্যে নয়জনই আমাদের ছাত্র। এর মধ্যে আই এন্-সি-তে প্রথম ও আই এ-তে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন যথাক্রমে শ্রীচঞ্চলকুমার মজুমদার ও শ্রীপ্রণবকুমার বর্ধন।

এবারে বি-এ ও বি এন্-সি পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৮৯'৪ ও ৬৩। বি-এ পরীক্ষাতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন দশজন ও বি এন্-সি-তে পঁচিশজন। বি-এ পরীক্ষার সর্বোচ্চ সম্মান ঈশানবুদ্ভি লাভ করেছেন অঙ্ক বিভাগের ছাত্র শ্রীম্মনয় সনাতনী।

এবারে বি-এ ও বি এন্-সি পরীক্ষায় আমাদের কলেজের ছাত্রীদের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শন, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, সংখ্যাবিজ্ঞান ও অঙ্ক (বিজ্ঞান) বিভাগে আমাদের কলেজের ছাত্রীরা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন এবং আরও অনেকে প্রথম শ্রেণীর সম্মান লাভ করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী সমাবর্তন উৎসবে আমাদের কলেজে খাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে ডি-ফিল উপাধি লাভ করেছেন তাঁরা হলেন অধ্যাপক শ্রীমথীন্দ্র বসু রায়চৌধুরী ও শ্রীঅনাথজীবন ভট্টাচার্য (রসায়ন), শ্রীস্বধীরকান্ত দাসগুপ্ত (শরীরবিজ্ঞান) ও শ্রীঅশোক বসু (প্রাণীবিজ্ঞান)।

শোক সংবাদ

গত বৎসর আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট প্রাক্তণ ছাত্র হারিয়েছি। সর্বপ্রথম স্মরণ করতে হয় ভূতপূর্ব রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জীকে। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সারল্যের, কর্মপ্রেরণার সঙ্গে মহানুভবতার এমন যোগাযোগ দুর্লভ। তিনি শুধু এই কলেজের একজন কৃতী ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকই ছিলেন না—রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাঁর দান অসামান্য। সারা জীবন কঠোর পরিশ্রমের ফলে যে প্রভূত অর্থ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন দেশের ও দেশের কল্যাণে তার শেষ কপর্দক পর্যন্ত তিনি ব্যয় করে গিয়েছেন। এই জ্ঞানবীর, কর্মবীর ও দানবীরের স্মৃতি আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরদিন বহন করব।

শ্রীক্ষেত্রপালদাস ঘোষ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও দার্জিলিঙ্ গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষতা করেছিলেন, শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দান নগণ্য নয়। শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগের কর্মকর্তা। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হারালো। শ্রীমল্লিনাথ রায়ের প্রতিভা সরকারী চাকুরীর ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। শ্রীপান্নালাল বহু বহুদিন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁর সময়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হয়—বিশেষ করে বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে কলেজের প্রাণের যোগ ছিল। তাই এঁদের হারিয়ে আমরা আত্মীয়বিয়োগের দুঃখ অনুভব করছি।

বিদিশা

স্বরজিৎকুমার দাশগুপ্ত—তৃতীয় বর্ষ, কলা

গ্যালারির শেষছবি দেখা হলে হাসি-হাসি মুখে
দাঁড়ালো আমার পাশে কিরকম আশ্চর্য কৌতুকে
লোনা-লোনা চোখ তুলে তারপর আয়ত দৃষ্টিতে
যখন তাকালো, তাকে মনে হোল তুয়ার-নিভুতে
লাডেন্-লা রোডের মত ছায়া-ছায়া তুহিনশীতল ;
হাসির শিশিরে সিক্ত তার ধনী হৃদয়ের দল
খুলে গেলো একে একে তারপর সন্ধ্যার বাতাসে—
জোনাকির মত চোখে অপরূপ যুগনাভি-শ্বাসে
(ঘরের উদ্দেশে ধীর মুহূবাক্ পদচারণায়)—
তাকে মনে হোল গ্রহ : পূর্ণিমার রাত্রির আকাশে ।

বিদিশা কখনো কিন্তু হৃদয়ের এ দুর্বলতাকে
আশ্রয় দেয়নি কিংবা আশ্রয় দিয়েও পরে তাকে
ভেঙেছে নিজের হাতে । রাত্রিশাস্ত নিভৃতশয়নে
শিথিল কবরী খুলে স্নত্ববাস শরীরে গোপনে
কাউকে চায়নি কাছে ।

টেবিলল্যাম্পের ম্লান আলো

তার জীবনের সব কটি একা রিক্ত অগোছালো
প্রহরের সহচর । দীর্ঘ ঋজু লাল-নীল রেখা—
আকীর্ণ হৃদয়ে তার কেবলি অক্লান্ত পড়া-শেখা ।
অনেক অনেকবার পউষের শান্তিনিকেতনে
কোপাই নদীর তীরে, ছাতিমের দীর্ঘায়ত বনে
অথবা মার্চের রৌদ্রে সোনাংলা কাঞ্চনজঙ্ঘায়
সুন্দরবনের পথে বিকেলের নির্জন নৌকায়
বিদিশা আমার পাশে ছিল, তবু হয়ত ছিলোনা ।
বিদিশার প্রাণ নেই । অহুভব ? একটি তিলও না :
বুঝেছি, যেহেতু তার হৃদয়ের মানচিত্রপটে
অজস্র স্বাক্ষর আছে ইতিহাস-দর্শনের বটে

তথাপি আমার দীর্ঘ নিভৃতির দীর্ঘ অন্তর্ভবে
 সে কোন মূর্তির মত : পাথরের। বারান্দার টবে
 লতানো চারার মত সূর্যমুখী মনের ভূভাগ
 হয়ত বা নেই তার। রুপোলি পেনসিল দিয়ে দাগ
 দেওয়া আছে যে-কদিন আমাদের দুজনের কাছে
 বিদিশা বোঝেনা কিন্তু তার অর্থ কোনখানে আছে !
 দারজিলিঙে, শিউড়িতে, ময়ূরাক্ষী নদীর ওপারে
 কয়েকটা দিনের দাম বোঝেনা সে কত হতে পারে !

বিদিশা করেনি জানি কোনদিনই চেতনার ট্রেনে
 নিঃসঙ্গ একক যাত্রা ; নামহীন প্ল্যাটফরমে নেমে
 অবাক ছুচোখ তুলে তাকায়নি। দেখেনি আকাশে
 কোন্ ভাষা উৎসারিত নীলিমার অপার বিশ্বাসে।
 বিদিশা কবিতা পড়ে : এলিঅট, হাইনে, বদলেঅর,
 মালার্মে, রবীন্দ্রনাথ বিদিশার নিত্যসহচর।
 বিদিশা দর্শন বোঝে : পাভলভের জটিল খিঙরি
 অতিমানবের তত্ত্ব তার শূন্য গ্রহেরে গ্রহরী।
 গগাঁর এচিং কিংবা সেজ্ঞানের ল্যাঙ্কস্কেপ দেখে
 উচ্ছল সে ঘরে এসে বহুতর অন্তর্দেহ লেখে :
 দেগার ডাইড্রপ কিংবা অজন্তার তুলিকাসম্পাতে
 কতদূর সার্থকতা, কতটা বা এই বাঙলাদেশে
 নন্দলাল-যামিনীতে আর গ্রাম্য পোটোদের হাতে।
 টেবিলল্যাম্পের নীচে ধীরে ধীরে ঘন হয় রাত
 নম্র পিলোফোমে তার নেমে এলে ক্লাস্তির প্রপাত
 রোবসনের গান শোনে আর শোনে নাইন্থ সিম্ফনি :
 বিদিশার রাত্রি কাটে ; বিদিশার বিনিদ্র রজনী।

বিদিশা অনেক জানে। পৃথিবীর সব কারুকলা
 তার জানা। তার বহু নিদ্রাহীন রাত্রে আলো-জ্বলা
 অধ্যয়ন। বিদিশাকে একদিন তাই পাশে নিয়ে
 অজস্র গৌরব ছিল আমার সমস্ত মন ছেয়ে।

না না সে জানেনা কিছু। হৃদয়ের স্থনিভসিটিতে
 সে এক অকৃতী মেয়ে। লালনীল লাইনের ফিতে

তার মন বেঁধে রাখে, অপরাহ্নে সিঁদুর সন্ধ্যায়
লাল কাঁকরের রাস্তা দূরে ফেলে একা বারান্দায়
নরম ডিভানে বসে নোট লেখে বিখ্যাত কবির
কবিতার নীচে নীচে। তার মনে অর্থহীন ভিড়
অনেক তত্ত্বের। তবু বিদিশার জগতে এখনো
অজস্র অজানা আছে। তার চোখে চশমার কাঁচে
কখনো জমেনি বাষ্প। বোবোনি সে এ-জীবন কেন
বোবোনি সৃষ্টির লক্ষ্যে কোন্ অর্থ অবগুপ্ত আছে ॥

আজকের কবিতা

শ্রীঅমিয়কুমার সামন্ত—তৃতীয় বর্ষ, কলা

দিবা-স্বপ্নের রাঙা দিনগুলি একে একে হ'ল শেষ,
ঝড়ের আবেগে ঝরে গেল কোথা আকাশ-কুম্বুমগুলি ;
কালের কেতনে যাত্রা পথের অলজ্ব্য নির্দেশ,
অগ্রগতির পিচ্ছিল পথ ঢেকেছে ঝড়ের ধুলি ॥

তবু কি বন্ধ, দৃঢ়সংঘমে নিজেকে বাঁধতে পারো
সনাতন শত বাধা-নিষেধের নিরাপদ সীমানায় ?
প্লাবনের বেগ উন্মাদ হয়ে, দুর্বীর যবে আরো ;
জীর্ণ কুলের ক্ষীণ প্রতিরোধে কতু তারে রাখা যায় ?

আজ বৃকে বৃকে থরো থরো কাঁপে কি আবেগ, হৃঃসহ ;
সন্ধানী চোখে উন্মুগ্ন হ'লো বহু প্রশ্নের ভীড়,
দিক্‌হারা পথে পদক্ষেপের দুঃস্বপ্ন আগ্রহ,
আজ আহ্বান এসেছে হেথায় অশাস্ত পৃথিবীর ॥

মুক্ত আজকে সীমিত মনের রুদ্ধ ছুয়ারগুলি,
হেথা বিস্তৃত চেনা-অচেনার অবাধ আমন্ত্রণ ।
তীক্ষ্ণ আলোক ছিন্ন করেছে কুয়াশার কুণ্ডলী,
এখানে আমার নবীন মনের সজীব উত্তরণ ।

আজকের ঘৃণা নির্মম বড়ো, ভালবাসা স্বর্গভীর ;
 চোখে চোখে আজ সহায়ভূতির স্বচ্ছ অশ্রুজল ;
 আঠারোর প্রাণ ঘাত-সংঘাতে উদ্দাম-অস্থির ;
 আঠারোকে ক'তু দেখেছ বন্ধু, শ্রান্ত অচঞ্চল ?

স্থির মেঘ

অনীশ মজুমদার—তৃতীয় বর্ষ, বিজ্ঞান

বিদায়ী বিকালের বিষণ্ণ অবশেষে—
 সারা আকাশে পড়েছে ছড়িয়ে
 একটি নিশ্চিন্ত ধূসরতা ।
 শুধু আকাশের পশ্চিমপ্রান্ত একটুখানি উদ্ভাসিত
 স্নান উজ্জল্যে
 অতিক্রান্ত-দিগন্ত সূর্যের প্রতিমূর্ত বিবর্ণ আলোকে ।

আর একটুকরো স্থির মেঘ,
 অনুজ্জল বাদামী রঙে রাঙানো,
 প্রসারিত—ঐ ক্লান্ত আকাশের—
 পাণ্ডুর পশ্চিমে ।
 তবু ঐ গতিহীন মেঘে,
 প্রতিটি অণুতে সঞ্চিত
 এক বিপুল ঝড়ের শক্তি,
 বিদ্যুতের কঠিন আঘাত,
 উত্তাপের অসহ প্রার্থন ।
 স্তম্ভী গতির প্রাবল্যে
 দেশ দেশান্তরে, পৃথিবীর প্রতি কোণে কোণে,
 যাত্রার ভূমিকা
 ঐ স্নান পশ্চিম আকাশে ।

স্বরঞ্জনা বধু

সন্তোষ চক্রবর্তী—প্রাক্তন ছাত্র

স্বরঞ্জনা, এবার তবে হৃদয়দ্বার খোলো ।
সন্ধ্যা হানে নরম দিগ্টি তোমার সাদা সিঁথি
ব্যথায় ঘন স্বপ্নে লাজে । ভাষণ-ছলোছলো
স্বরঞ্জনা বধুর চোখে সিঁছুর-রাঙা তিথি ।

ব্যাকুল বুঝি নম্রতম উদাস প্রদোষেরও
দিগন্তটি । প্রদীপ-ছায়ে ঘোমটা-তোলা হাওয়া
একলা ওড়ে ; শিশির তুলে নরম পায়ে ফেরো—
গভীর চোখে হৃদের সীমা : শান্তি খুঁজে পাওয়া ।

চিত্রলেখা লগ্ন তুমি—তোমার নামে ধ্বনি,
নিদ্রালুতা : স্বপ্ন দিয়ে হৃদয়খানি জালো
শিখায় সুরে । বসন্তেরি প্রহরগুলি গণি ।
স্বরঞ্জনা বধুর চোখে নেতুর-মায়া আলো ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবীপদ ভট্টাচার্য

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও মাথা নিচু করে হাঁটেননি ।
দীর্ঘ ছ ফুট খাড়া দেহ, কর্কশ-বলিষ্ঠ মুখ, চশমার আড়ালে শড়কির ফলার মতো দৃষ্টি ।
বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে চেহারার দিক থেকে তিনি অনন্য । লেখার চেহারায়ও ।
আমাদের কথাসাহিত্য তারিখের নিরিখে শতবর্ষ পার হতে চলেছে । এই আয়ুষ্কাল অদীর্ঘ
হলেও তার ঐশ্বর্য যে-কোনও দেশের সাহিত্যের পক্ষে দীর্ঘ-উদ্রেকক্ষম । আমাদের কথা-
সাহিত্যতরুর একটি উন্নত-পুষ্পিত শাখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মানিক বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন । বঙ্কিম-শরৎ থেকে শুরু করে বিভূতিভূষণ
বন্দ্যোপাধ্যায়, তারারশঙ্কর সকলেই আর্টস্-এর ছাত্র । মানিক বিজ্ঞানের যথার্থ ছাত্র । যথার্থ

শব্দটিকে এখানে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করছি। বিজ্ঞান-চিহ্নিত মন নির্মোহ চোখে তাকায়। মানিক প্রথম জীবনে ফলিত মনোবিজ্ঞানের ফ্রেড-অ্যাডলার-ইয়ুং ধারাকে একলব্যনিষ্ঠায় অধ্যয়ন করেছিলেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টি মোহ ঘোচায়, সত্যকে যাচাই করে নেয়। বিজ্ঞানীর সেখানে অণুবীক্ষণে দৃষ্টি অতন্দ্র। তাই মানিকের চোখে বিজ্ঞানীর ছিন্ন-মোহ দৃষ্টি, মৌলিক উপাদান খোঁজার নিরাসক্ত অভিযাত্রা। এই নিরীক্ষায় ধরা পড়ে টলটলে জলের ভিতরে অসংখ্য ব্যাসিলি, সাচা খেতাবের আড়ালে ভেজালের হাজার টুকরো। এই 'বৈজ্ঞানিক' দৃষ্টি মানিকের পূর্বে বা পরে আমাদের সাহিত্যে আর কারোর লেখায় দেখিনি। তার কারণ এই মনকে, এই নির্মোহ, কঠোর মনকে 'অর্জন' করতে হয়। বিজ্ঞান ভাবালুতা, শিথিলতা, অতিশয়োক্তির প্রতিপক্ষ। যার মন বিজ্ঞানসেবী তাঁর কথাবস্ত, ভাষা, বা অবয়ব-সংস্থান ঋজু, পরিমিত ও কঠিন হবেই। মানিকের রচনা বাংলা কথা সাহিত্যে এইদিক থেকে ঐতিহ্যহীন বলা যায়। বরং তিনিই তাঁর ঐতিহ্যনির্মাতা বললেই সঙ্গত হয়। আবার একথা অধিকতর সত্য যে তাঁর প্রকৃত ঐতিহ্যবাহক বাংলা কথাসাহিত্যে কেউ হতে পারেননি। একান্ত সাম্প্রতিক কালে কোন কোন সাহিত্যিক যৌন সমস্তার (প্রধানত অতি বিকৃতরূপ) রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁদের গল্পে ও উপন্যাসে। কিন্তু intellect-এর অভাবে, বিজ্ঞানীর অণুবীক্ষণী দৃষ্টির অভাবে তাঁদের সাহিত্য যুগপৎ 'সস্তা' ও মারাত্মক হয়ে উঠছে। মানিকের মননে ও বচনে যে একটি কঠিন ঋজুতা, একটি প্রবল 'জোর' ছিল তাঁদের রচনায় ঐগুলির অনুপস্থিতি। মানিকের সাহিত্যজীবন শুরু যুগটাই ছিল বিদ্রোহের হাওয়ার। দৃশ্যমান আপাতহৃৎ জীবনের তলায় ব্যাসিলির আবিষ্কার সেদিনকার বিদ্রোহের অঙ্গ ছিল। মানিকের রচনায় এমন সব মাল্লু দেখা দিল যারা ঠিক পুরো মাল্লু নয়, ভাঙা-চোরা মাল্লু, মাল্লুঘের ভগ্নাংশ। এই মাল্লুকে দেখা ও দেখানো অতি দুর্লভ কাজ। মানিক সে-পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

মানিক আমাদের সাহিত্যে নতুন, নিষ্ঠুর নতুন। তাঁর পূর্বজ ও সময়জ সকল সাহিত্যিক প্রথা ও রীতি থেকে তিনি স্বতন্ত্র। তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ মূলত শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যবাহী। বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্যকুমারের প্রথম দিকের লেখায় একদিকে লরেন্স-হাক্সলি-হামল্টন অপরদিকে চারঅধ্যায়-শেষের কবিতার প্রভাব। কিন্তু মানিক পৃথক। তাঁর চিন্তন ও চিত্রণ, বাক্ ও রীতি পৃথকধর্ম।

চল্লিশের পর্বে তিনি রাজনৈতিক সাহিত্য তথা মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদী বই অভিনিবেশের সঙ্গে পড়তেন, ভাবতেন। বিশেষ করে মার্কসবাদ। এই মার্কসবাদ তাঁর চিন্তায় আনল ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা। সং-শিল্পীর জীবনজিজ্ঞাসা এই ঐতিহাসিক দর্শনে নতুন উত্তর লাভ করেছিল। এই কারণেই যুদ্ধ চুক্তি মহামারী দাঙ্গায় বিধ্বস্ত দেশ ও দেশবাসী তাঁর সাহিত্যে মহৎ মানবিকতায় আত্মপ্রকাশ করল। একথা ঠিকই যে সমসাময়িকতার স্বর তাঁর কোন কোন রচনায় খুব

চড়া হয়েছে। কিন্তু যে পরীক্ষা তিনি শুরু করেছিলেন ‘শহরতলী’ উপন্যাসে তার সার্থক বা সমাপ্ত রূপ তিনি দিয়ে যেতে পারেননি।

আমাদের দেশে মানিকের যথাযোগ্য সমাদর হয়নি। হবার কথা নয়। এখনও আমাদের দেশে গ্রামীন সংস্কার, পরমপুরুষবাদ, সিঁদূর মহিমা, উনিশ শতকের উপকথা অথবা আয়ুর্বেদের জয়গান না করলে নাম কেনা যায় না। মানিকের রচনার এক বিরাট অংশ সর্বজনবোধ্য নয়, হতে পারেনা। হবেওনা। তবু মানিকের মত তাঁর নামটি জ্বলবে।

অজ্ঞাত ভারতীয়ের আত্মজীবনী*

অধ্যাপক স্ত্রীশোভন সরকার

গত কয়েক মাসের মধ্যে শ্রীনিরদ চৌধুরীর আত্মজীবনী দেশী ও বিদেশী পাঠকমহলে উল্লেখযোগ্য খ্যাতি অর্জন করেছে, প্রশংসা ও নিন্দার বাদামুদ্রা শোনা গিয়েছে নানাদিকে। তাই বইখানি হাতে আসা মাত্র আত্মপাস্ত হুঁবার পড়ে দেখবার লোভ সামলানো গেল না। নিঃসন্দেহে বলতে পারি এ গ্রন্থ অনেকাংশে অসামান্য।

প্রথমেই চোখে পড়ে গ্রন্থকারের ভাষার দীপ্তি, লেখার প্রসাদগুণ, প্রকাশভঙ্গির বলিষ্ঠতা। অনেকের মতে নীরদবাবুর ইংরাজি ঠিক আধুনিক ইংরাজ লেখকের পর্যায়ে পড়ে না, আমার মনে হয় এখানে সে-প্রশ্ন তোলাটাই অবাস্তব। লেখক যদি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য পাঠকদের মনে পৌঁছে দিতে পারেন, তাহলেই তাঁর স্টাইল সার্থক, প্রচলিত রীতি থেকে পৃথক হলেও সার্থক। নীরদবাবুর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য আছে, পাঠককে তিনি স্পর্শ এমনকি অভিভূত করতে পারেন।

মৌলিক স্বকীয় চিন্তার যে ছাপ আলোচ্য গ্রন্থে পরিস্ফুট হয়েছে তাকেও অসাধারণ বলা উচিত। নির্ভীকভাবে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন, প্রচলিত সংস্কারকে তীব্র আঘাত হানতে কুণ্ঠিত হননি, জাত্যাভিমান ও আত্মতুষ্টির ভাবকে করেছেন অগ্রাহ্য, সামাজিক জীবনে পুঞ্জীভূত অনেক গলদকে দিনের আলোতে টেনে আনতে চেয়েছেন। স্তোত্রবাক্যে আমরা অনেক সময় মন ভোলাই, বক্তৃতা ও কথার প্লাটিচুডের শ্রোতে ভেসে চলি, নির্মম সমালোচনার কশাঘাতকে তাই শ্রদ্ধা করাই সম্ভব। কিন্তু শুধু বিশ্লেষণ নয়, বর্ণনাতেও নীরদবাবু সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনটি অধ্যায়ের উল্লেখ করব—ভারতীয় রেনেসাঁসের জয়যাত্রা, মহানগরী কলিকাতা ও জ্ঞানচর্চার উদ্বোধন শীর্ষক রচনাগুলি নিঃসন্দেহেই পরম উপভোগ্য।

* ১৩৫৯, জ্যৈষ্ঠের ‘পরিচয়’ প্রকাশিত শ্রীনিরদ চৌধুরীর “Autobiography of An Unknown Indian” শীর্ষক পুস্তকের সমালোচনা।

ভাষা ও ভাবের বিশেষত্ব ছাড়াও এক বিশেষ ব্যক্তিত্বের স্বপ্রকাশ পাঠককে আকর্ষণ করে। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য জগতে অজ্ঞাত ভারতীয় হতে পারেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে তাঁর পাণ্ডিত্য, সঙ্গীতজ্ঞান, রসশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা একেবারে অবিদিত নয়। কিন্তু অন্তরঙ্গ বন্ধুহলের বাইরে তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় অপরিচিত পাঠক সহজে ভুলতে পারবেন না। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সর্বদাই কৌতুহল জাগায়, লোকচক্ষুর লক্ষ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আত্মচারিতের উদ্দেশ্য যদি আত্মপ্রকাশ হয় তবে এখানে লক্ষ্যসিদ্ধি হয়েছে, এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় ছাপার অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ নীরদবাবুর লক্ষ্য আরও সুদূরপ্রসারী। মুক্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেছেন যে তাঁর এই লেখা আত্মজীবনের ঘটনা-সমষ্টি নয়। ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় ইতিহাসই তাঁর আলোচনার বস্তু। বহু পরিশ্রমে ও বহু আয়াসে তিনি আমাদের অজ্ঞানতার মোহ থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাঁর দাবি এই যে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ভ্রান্তিমেষমুক্ত স্থির সিদ্ধান্ত (গ্রন্থের ১২২, ৪৬৫, ৪৬৬, ৫১৩ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু স্থলিখিত, মৌলিক ও ব্যক্তিত্বচিহ্নিত হলেই কি সিদ্ধান্ত ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়ায়? সত্যের মাপকাঠি বস্তুনিষ্ঠা, অসাধারণত্ব নয়। মতভেদ অবশ্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য, কিন্তু গ্রন্থকার যখন স্বমত প্রমাণের চাইতে প্রচারের দিকে বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন, তখন সমালোচককেও বাধ্য হয়ে বলতে হয় যে, নীরদবাবুর মতবাদ আংশিক, একদেশদর্শী ও অনেকটা কল্পনাবিলাসী। তাঁর আত্মজীবনীর সার্থকতা আত্মপ্রকাশে, সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় নয়।

আলোচ্য গ্রন্থের আগাগোড়া একটা সুর ধনিত হয়েছে বাংলা তথা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সমগ্র জাতীয় জীবন আজ অধঃপতনের পথে চলেছে, নতুন প্রাণের অভ্যুদয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ইউরোপে স্পেন্সার যে বিভীষিকা দেখেছিলেন তারই অমূর্তনে গ্রন্থকার তাঁর নিজের দেশে দেখছেন অবসান ও পতনের করাল ছায়া। মাথার উপরে ধ্বংস নেমে আসছে, পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে, যা কিছু মূল্যবান তা আজ নষ্টপ্রায় (৪৮, ১২২ পৃষ্ঠা)। প্রকৃত অবনতির যুগে আমরা বাস করছি, পুরুষত্ব আজ নিশ্চত, সমালোচনার শক্তি পর্যন্ত লোপ পেয়েছে, চারিদিকে ক্ষয়ের চিহ্ন এগিয়ে আসছে (৩৬৪, ৩৩৪, ৪৪৪, ৪৬২ পৃষ্ঠা)। গ্রন্থকারের চোখে এই অধঃপতন কোনও সাবেকী স্বর্ণযুগের থেকে আধুনিক জগতের বিচ্যুতি নয়। সমাজের স্থিতিশক্তির পতন স্পষ্ট হয়েছে ১৯১৯এর পর থেকে, ১৯৩০-এর পরে কলকাতা আর তাঁর মনকে তৃপ্তি দিতে পারিনি (৪০৩, ২৫২ পৃষ্ঠা)। তাঁর যৌবনের যুগেই বাংলার জীবনে নেমেছে অভিশাপ, সে দুর্দশা সারা ভারতে সাম্প্রতিক বর্বরতার পুনরাবির্ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া (১৮৬, ১৮৭ পৃষ্ঠা)। পূর্ববর্তী যে যুগের তুলনায় এই অধঃপতন সে যুগ হল উনিশ শতকের পুনর্জাগরণের যুগ, বাংলার রেনেসাঁসের আমল, যার পূর্ণপ্রকাশ ঘটেছিল ১৮৬০ থেকে ১৯১০ এই অর্ধ শতাব্দীতে (২২১ পৃষ্ঠা)।

উনিশ শতকের রেনেসাঁসের এই মূল্যনির্দেশ বস্তুনিষ্ঠার দিক থেকে অতিরঞ্জিত নয়



অধ্যাপক সূর্যশোভন সরকার

কি? সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় ব্রিটিশ আমলে আমাদের মধ্যশ্রেণীর কীর্তির দুর্বলতার দিকটা অনেকখানি পরিস্ফুট হয়েছে। অর্ধকলোনির জীবনে সাম্রাজ্যবাদের আওতায় যে জাগরণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের পক্ষপুটে যে প্রাণস্পন্দন তাকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমান পর্যায়ে তোলা দুরাশা বৈকি। জনগণের সঙ্গে বিচ্ছেদ, হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য, জন্মগত স্ববিরোধিতা আমাদের রেনেসাঁসকে পদে পদে ব্যাহত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' থেকে সংস্কৃতিবান বাঙালী ভদ্রলোকের যে ছবি গ্রহণকার উদ্ধৃত করেছেন তাতে শ্রদ্ধার চেয়ে উপহাসের ভাবটাই মনে উদয় হয় না কি? তার মধ্যে কি আমরা ইউরোপের পনের-ষোলো শতকের দুর্ধর্ষ মনের পরিচয় খুঁজে পাই? উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক নেতাদের মতন সিপাহি বিদ্রোহকে তিনি পুরাতন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখেছেন। মার্ক্সের দৃষ্টিতে তার যে সবল দিকটা ধরা পড়েছিল, নীরদবাবুর চোখে তা অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

এখানে অবশ্য বলা যায় যে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় না হলেও আমাদের রেনেসাঁসই আমাদের জাতীয় জীবনের মূলধার। কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তাহলে শিক্ষিত ভদ্রলোকের চিন্তাধারার সঙ্গে একাত্ম করে দেখতে হয়। শুধু তাই নয়, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে মেনে নিলেও তার ক্ষীণ প্রাণভাব, স্ববিরোধিতা, স্বল্পপ্রসার ও আংশিক উৎকর্ষের বিচার না করলেও চলে না। উনিশ শতকের অবদানের দুর্বলতা উপলব্ধি না করলে আমাদের কেবল কয়েকটা বাঁধাবুলির আশ্রয় নিতে হবে।

বাংলার রেনেসাঁসকে অতিরঞ্জিত করে গ্রহণকার সাম্প্রতিক অধঃপতনের যে চিত্র এঁকেছেন তাকেও একদেশদর্শী অতিকথন বলা চলে। গত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে ভারতে নতুন কিছুই মাথা তোলেনি এ হল গায়ের জোরে প্রচার। গান্ধীজির আমলে জনজাগরণ, দুঃশাসনিক ও স্বার্থত্যাগী বিপ্লবী অভিযান, পরবর্তী যুগে শ্রমিক বা কৃষাণ আন্দোলন, সাম্রাজ্যবিরোধী গণসংগ্রাম কোন কিছু নীরদবাবুর সভ্যতা ও প্রগতির সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না, তাঁর মতে এ সমস্তই জাতীয় পতনের নির্দেশক। উনিশ শতকের শিক্ষিত ভদ্রলোকের চরিত্র-শক্তি গ্রহণকারকে শ্রদ্ধায় অবনমিত করেছে দেখতে পাই। কিন্তু কোন যুক্তিতে আমরা এ যুগের অনেক মাহুষের উত্তম প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ করব? আদর্শের ডাকে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন, অসীম সাহসে দুঃখকষ্ট বরণ, সহযোগিতা, অধ্যবসায়, সংগঠনের শক্তি—এমন সাধনার অভিজ্ঞতা কি আমাদের চোখে পড়ে না, আজ কি তার এমনই অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে? নীরদবাবুর অভিজ্ঞতায় এমন দৃষ্টান্তের পরিচয় না থাকলে সেটা তাঁরই দুর্ভাগ্য, জাতির নয়। আর সংস্কৃতিকে যদি দেয়ালঘেরা সাহিত্য ও চিন্তার রাজ্যেই আবদ্ধ রাখতে হয়, তাহলে কি বাংলা সাহিত্য ও ভারতীয় চিন্তা গত পঁচিশ বছরে অনেকটা পুষ্টিলাভ করেনি? কেবল কয়েকজন মহারথীর আবির্ভাবেই জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না—সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞান-ইতিহাস আলোচনা, নতুন ভাবধারা ইত্যাদির বিস্তারও সংস্কৃতির একটা দিক।

ভূমিকাতে গ্রন্থকার অবশ্য বলেছেন যে, তাঁর লক্ষ্য সাধারণ সূত্রের সন্ধান, ব্যতিক্রমের নয়। কিন্তু সমাজের একটা বড় অংশ যার প্রভাবে আসে তা কি ব্যতিক্রম না সাধারণ নিয়ম? গত দুই-তিন শতকের অনেক কিছু আলোড়নকে অথবা ফীত করে না দেখলেও দেশে প্রাণশক্তির স্পন্দনকে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত।

নৈতিক, মানসিক ও ব্যবহারিক পতনের যে দৃশ্য গ্রন্থকারকে ব্যথিত করেছে, তার মধ্যে অনেকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে,—কিন্তু সে সত্য গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের অধোগমন, সমস্ত জাতির নয়। উপরতলার একটা স্তরের মধ্যে নীরদবাবু তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছেন, প্রকৃত হিউম্যানিস্টের মতন দৃষ্টি প্রসারিত করলে তিনি দেখতে পাবেন যে, একটা গোষ্ঠীর অধোগতি সারা জাতির পতনের সমার্থক নয়। অবশ্য এখানেই আসে দৃষ্টিভঙ্গীর কথা, ইতিহাসকে দেখবার রকমফের।

জনতা সম্বন্ধে নীরদবাবুর অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা লক্ষ্যণীয়। লোকের ভিড়কে তিনি শুধু অপছন্দ করেন তাই নয় (২৬০ পৃষ্ঠা)। প্রথম যৌবনে তিনি বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিলেন গণ-অভ্যুত্থানে নয়, সামরিক স্বেচ্ছা বিদ্রোহে (২৪৯ পৃষ্ঠা)। গান্ধিয়ুগের জনবিক্ষোভ তাঁর মনে এনেছিল ক্রোধ (৪০৭ পৃষ্ঠা)। ছাত্রাবস্থায় ফরাসী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত তিনি আয়ত্ত করে ফেললেও মনে হয় যে, সাবেকী কোন ঐতিহাসিকের মতন জনতা তাঁর কাছে canaille মাত্র। শুধু ব্যক্তিগত পছন্দের কথা নয়, ইতিহাস আলোচনাতেও তিনি এই দৃষ্টি নিয়ে এসেছেন।

ইতিহাসে দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনায় গ্রন্থকার বাস্তবনিষ্ঠ পন্থার আদর্শ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠাও যে অচল অনড় পদার্থ নয়, আদর্শ যে শুধু কথায় কাটে না সে সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ নন। তিনি এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন যেন গ্রীক ঐতিহাসিক মিউকিডিভিস জাতি বা দলমত প্রভাবের উর্ধ্ব (৩৪৫ পৃষ্ঠা) কিংবা যেন বিশপ স্টাব্‌সকে দলীয় মনোভাব স্পর্শ করতে পারেনি (৩৫১ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য, আজকের দিনে কোনও ঐতিহাসিক একথা জোর দিয়ে বলতে পারেন না। যে ফরাসী ঐতিহাসিকের বাণী তিনি একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর মুখ দিয়ে স্বয়ং ইতিহাস কথা বলছে, তাঁর সেই দস্ত আজ আর কেউ শিরোধার্য করে না। দেশ-কাল-শ্রেণী-নির্বিচারে ইতিহাসের এই অমোঘ বিচারের দাবি নীরদবাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এটা উনিশ শতকের একটা বিশেষ অবস্থার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, যে-মতে মনে হত যে রাষ্ট্র একটা গোষ্ঠী বা শ্রেণীনিরপেক্ষ শক্তি অথবা বুদ্ধিবাদ বৃষ্টি সামাজিক পরিবেশের উর্ধ্বস্থিত সনাতনী এক প্রক্রিয়া। বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে অগ্রাহ্য করবার কথা উঠছে না, কিন্তু ঐতিহাসিক ফতোয়া মাত্রকেই বিচারের বাইরে রাখা চলে না। স্বতরাং নীরদবাবুর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকেও বস্তুনিষ্ঠা কষ্টিপাথরে যাচাই করা প্রয়োজন। ইউরোপের যে জয়যাত্রা সফল হল, তার পিছনে ইসলাম বিরোধী ধর্মযুদ্ধের প্রভাব গ্রন্থকার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন (৫০৬ পৃষ্ঠা), অথচ তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল আর্থিক প্রেরণা যে ইউরোপীয়দের মুসলিম-বর্জিত আমেরিকায় টেনে নিয়ে গেল তার উপরে তিনি

জোর দিলেন না। স্পেন্সারের প্রতিধ্বনি করে তিনি গোটা ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংসপ্রায় বলে মাঝে মাঝে ভয় পেয়েছেন (৩৪১ পৃষ্ঠা), কিন্তু ইউরোপের অনেকাংশে প্রাণশক্তির জোয়ার তাঁর নজরে পড়েনি কেন না ইউরেশিয়ার অনেকটাই নাকি আজ সত্যত্বে—বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের এই নমুনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর চার্চিলের মতন ‘জিনিয়াস’ নাকি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে চিরদিনের জঘ্ন চূর্ণ করে দিতে পারতেন (৩২০ পৃষ্ঠা)। আর আমাদের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল স্বর্ষ্বরূপ আমেরিকার চারিদিকে গ্রহের মতন প্রদক্ষিণ (৫১০ পৃষ্ঠা)। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত আশা-ভরসার কথা বোঝা সহজ, কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস আলোচনার পাদটীকা হিসাবে এমন ভবিষ্যদ্বাণীর অবতারণা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক।

দেশের ইতিহাস আলোচনাতেও তেমনি বিভ্রান্তিকর মন্তব্যের অভাব দেখি না। গ্রন্থকার ধরে নিয়েছেন যে গোষ্ঠীগত হিন্দু আত্মপ্রত্যয় জাতীয়তাবোধের নামাস্তর (৪০২ পৃষ্ঠা); সেই যুক্তিতে তাহলে মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রিস্টান সভ্যকেও জাতীয় মনোভাব আখ্যা দিতে হয়। হিন্দু সাধারণের চোখে নাকি দেবদেবীরা মান্নুষের উৎকোচের নাগালের বাইরে নয় (৪৫০ পৃষ্ঠা), অথচ সকল ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগের বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ আনা সম্ভব। হিন্দু-মুসলিম বিরোধ লেখকের কাছে স্বাভাবিক সত্য, এদেশে দুই জাতির তত্ত্ব তিনি ঐতিহাসিক ‘ফ্যাক্ট’ বলে গণ্য করেছেন—(২৩১ পৃষ্ঠা), আবার বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দ্বিখণ্ডন তাঁর কাছে মনে হয়েছে অস্থায় ও অস্বাভাবিক। এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? নবজাগরণের যুগে জাতীয়তাবোধ তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত ও উদার মনে হয়েছে, গান্ধিবাদকে তিনি দেখেছেন প্রাচীন প্রতিক্রিয়া ও অন্ধ-সংস্কারের স্তূপ হিসাবে, দ্বিতীয়ের প্রভাবে তাঁর মতে প্রথমটির স্ক্রুকার উদার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে (৪৩৫, ৪৪১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু জাতীয় মধ্যশ্রেণীর বিবর্তনের দুই পর্যায়ের প্রতীক—এই দুই যুগের মধ্যে যে স্পষ্ট ধোঁয়াসহ রয়েছে তার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। ব্যাপক বস্তুনিষ্ঠতার নামে এই ভাবে পদে পদে চোখে পড়ে ভাববাদী বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ।

নীরদবাবুর ইতিহাসে আমাদের নবজাগরণ হয়েছে অতিরঞ্জিত, সামাজিক স্তরবিশেষের সাম্প্রতিক অধোগতি সমগ্র জাতির পতনে রূপান্তরিত হয়েছে, আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতায় সমাজবাদী চিন্তা ও কর্ম হয়েছে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, স্বদেশের সমাজবিবর্তন বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে তিনি আবার ভারতের ইতিহাসের ধারার এক স্বকীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, এখানে তাঁর গুরু টয়েনবি।

ইতিহাসে বিভিন্ন সমাজের পার্থক্য খুঁজতে গিয়ে টয়েনবি মূলত ধর্মগত সংস্কৃতির প্রভেদের আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর মতে তাই ইউরোপে মধ্যযুগ ও আধুনিক কাল একই পশ্চিম-ইউরোপীয় সমাজের রূপ গ্রহণ করেছে। এইরূপে নির্দিষ্ট সমাজগুলির উত্থান-পতনের বিশ্লেষণে সাধারণ সূত্র নির্ণয় তাঁর লক্ষ্য। নীরদবাবুও ভারতের ইতিহাসে তিনটি সংশ্লিষ্ট

অথচ তাঁর মতে স্বতন্ত্রসভ্যতার সন্ধান পেয়েছেন—হিন্দু, ইসলামি ও ইউরোপীয়। প্রত্যেক সভ্যতার লীলাস্থল ভারতের মাটি হলেও সৃষ্টিকর্তা হল বহির্জগতের একটা প্রবল আলোড়ন— অর্থাৎ আর্ধজাতির দ্বিধিজয়, ইসলাম ধর্মের প্রসার ও ইউরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার। সুতরাং ভারতে পর পর তিনটি সভ্যতার চালক ও শাসকশক্তি হল বৃহত্তর বিদেশী সংস্কৃতি। সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজী পর পর তিন পর্যায়ে তিন সংস্কৃতির বাহন। খাস সংস্কৃতির দিক দিয়ে ভারতের তিন সভ্যতাকে ক্রমশ নিম্নগামী বলা চলে, রাষ্ট্র সংগঠনের দিক দিয়ে তারা আবার ধাপে ধাপে উচ্চতর হয়েছে—কিন্তু আসল সত্তা ও স্বভাবের বিচারে প্রত্যেকেই বিদেশী, শুধু বহিরাগত নয়। প্রতি পর্যায়ে সভ্যতার বাহন হল বিদেশী শাসক ও সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর ও অনুচরেরা। দেশের অধিকাংশ লোক মনে প্রাণে তখনকার সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারেনি, তাই সর্বদাই সভ্যতার সঙ্গে ‘অসভ্যতা’র একটা লড়াই চলেছে। এখানে অমার্জিত ‘অসভ্য’ লোকেরা অবশ্য হল জনসাধারণ, টয়েনবির ভাষায় আভ্যন্তরীণ প্রলেটেরিয়াট। কালক্রমে এক একটি সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে—প্রধানত দেশের নির্মম জলবায়ু আবহাওয়ার চাপে, ধানিকটা বিদেশী সৃষ্টিকর্তার অবসাদ ও শক্তিক্ষয়ে। চালক ও শাসক শক্তির পতন এসেছে ‘অসভ্য’ জনসাধারণের চাপে নয়, কারণ এই সাধারণ লোক সর্বদাই সভ্যতার বাহনদের তুলনায় নিকৃষ্টতর, দেশের গুণে তারা আরও বেশি নির্জীব। তবে একটা সভ্যতার যখনই সংকট এসেছে তখনই এই সাধারণ লোকে হট্টগোলের সৃষ্টি করে, সে বিশৃঙ্খলা যেন সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের আক্ষালন। সভ্যতার পুনর্জন্ম আসতে পারে আবার কোনও বিদেশী সংস্কৃতির হস্তপ্রসারে। গ্রন্থকার-নির্দিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসের ছক বা প্যাটার্ন হল এই।

প্যাটার্নের মাহাত্ম্যই এই যে তাতে একটা মনের মতো ছবি আঁকা চলে, যে তথ্য ছকে পড়েনা তাকে অগ্রাহ্য করাই যথেষ্ট। বিপরীতমুখী তথ্যের আপেক্ষিক বিচারের প্রয়োজন থাকে না। তাই বিদেশী প্রভাব ও দেশীয় অবস্থার মিশ্রণে ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তির সম্ভাবনা গ্রন্থকার এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছেন। আর্ধ জাতির আগমন পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই লক্ষণীয়, তবু হিন্দুসভ্যতা হল বিদেশী আর্ধ মার্ক। অথচ অশ্রান্ত অল্পরূপ অঞ্চলে টয়েনবি নির্দিষ্ট হেলেনিক, পশ্চিম-ইউরোপীয়, পূর্ব-ইউরোপীয়, ইরানী ইত্যাদি সমাজে আর্ধপ্রভাব আর বিদেশী রইল না—এও কম বিচিত্র নয়। বৈদিক ও পরবর্তী হিন্দু সংস্কৃতি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত ভাষা সবই বহিরাগত এক ধাক্কার ফল—দেশের মাটি ও সাধারণ লোকের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা বিরোধের—এ তত্ত্বও চমকপ্রদ। গোটা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎপত্তিটা কোন্ বিদেশী অনুপ্রেরণায় তা-ও রয়ে গেল অব্যক্ত। নীরদবাবুর ব্যাখ্যায় ভারতে বহিরাগত ধাক্কাগুলি বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যাখ্যায় First Cause-কে মনে আনে। ভারতীয় আর্ধসমাজে বহির্বিশ্বের উপর নির্ভর নগণ্য, ইসলামিক ভারতে অবশ্য বাইরের সঙ্গে ধর্ম ও আইনগত যোগটা প্রত্যক্ষ কিন্তু সেইজন্ম টয়েনবি পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান সমষ্টিকে এক সমাজের অন্তর্গত করতে ভরসা পান নি। খাঁটি মুসলমান ধর্ম, ভাষা, রীতি-নীতি যদি মধ্যযুগীয় ভারত-

সভ্যতার প্রধান নির্দেশক হয়, তবে সে যুগের মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে দেখবার প্রয়োজন কোথায়? মধ্যযুগের ভারতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান ও পারস্পরিক প্রভাবকেও এভাবে তুচ্ছ করে দেখবার অর্থ কি?

হিন্দু ও মুসলমান আমলকে ব্যাপ্ত করে এক ভারতীয় সভ্যতার অস্তিত্ব ও স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ গ্রহণকার কল্পিত দুই পৃথক সমাজের খিওরির চাইতে কম শক্তিশালী নয় কারণ ভারতীয় জনগণের জীবনযাত্রার ধরণ, গ্রাম-সংগঠন, সমাজ-সংস্থান মোটামুটি একই ধরণের থেকে যায় বহুদিন ধরে। প্রচলিত মতে সে সভ্যতা বিবর্তিত হয়ে আজও বিদ্যমান। আর যদি বিরাট আর্থিক পরিবর্তনে সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলে যায় বলে স্বীকার করি তবে ব্রিটিশ শাসনের প্রকোপে পুরাতন কাঠামো ভেঙ্গে পড়ায় নূতন ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে এ কথাও বলা চলে। গ্রহকারের নির্দিষ্ট তিনটি পৃথক সভ্যতার অস্তিত্ব তাই এক চমকপ্রদ মত হিসাবেই চিহ্নিত হবার সম্ভাবনা।

আসলে মনে হয় ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যা এ-গ্রহে গৌণ। গ্রহকারের মনের নিবিড় অহুভূতিকে একটা বৈজ্ঞানিক রূপ দেবার ইচ্ছা থেকে তার উৎপত্তি। কাম্য আদর্শের সন্ধানে প্রথম যৌবনে তিনি নিজেকে একটা চিন্তাজগতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তার দেশীয় উপাদান ছিল বাংলার নবজাগরণের রঙীন ছবি আর বিদেশী আশ্রয় ও পটভূমিকা হল ইউরোপীয় ধ্যানধারণার পুরাতন আংশিক একটা দিক। বাস্তবের রুঢ় আঘাতে সে জগৎ ভগ্নপ্রায়, নবজাগরণের বাহকশ্রেণী অবনত ও অবসন্ন, নূতনের পদক্ষেপে ইউরোপও আজ আবর্তের মধ্যে এবং গ্রহকারের চোখে পথভ্রষ্টপ্রায়। এ-অবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর মনে বাজছে যুগাবসানের সুর। যেহেতু সাধারণ লোক নীরদবাবুর কাছে মূর্খ বর্বর জনতা মাত্র, সেইজন্ম ভারত কিংবা ইউরোপে আশার রেখা তাঁর কাছে অজ্ঞাত। নিজস্ব প্রাথমিক স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে খাপ খায় এমন প্রাণশক্তির সন্ধান তিনি তাই অনিবার্ধভাবে দেখতে পান একমাত্র ধনিকতন্ত্রী আমেরিকায়। নীরদবাবু তাই পথ চেয়ে আছেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক্ষায়—এই বিদেশী শক্তিই নাকি ভারত-উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ইতিহাস-দর্শন রচিত। ভারতীয় সভ্যতার অহুপ্রেরণা যদি বিদেশী সংস্কৃতিতে আরোপ করা যায় তাহলে ত্রাণকর্তা আমেরিকার আগমন একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু আমেরিকা ত' ইউরোপীয় সভ্যতারই সন্তান। স্তরাস্তর গ্রহকারকে বলতে হয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে ভারতের তৃতীয় অর্থাৎ ইণ্ডো-ইউরোপীয় সভ্যতার এখনও সমাপ্তি ঘটে নি, তারই মধ্যে আমরা জোয়ার-ভাঁটার খেলা দেখছি মাত্র। আমেরিকার ইনজেকশনে আমাদের নষ্টস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হবে। অতএব মা ভৈঃ। নীরদবাবু সান্ত্বনালাভ করুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু ইতিহাসের গতি বিচিত্র। এবং বস্তুনিষ্ঠ আলোচনায় তাঁর স্থিরসিদ্ধান্ত ভেঙে পড়ার সম্ভাবনাই বেশি।

সেকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ

হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

[হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সতীর্থ ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী গিরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র । তিনি তাঁর পিতার লিখিত অসমাপ্ত আত্মচরিত সমাপ্ত করেন ।]

(১)

এক্ষণে প্রেসিডেন্সী কলেজের তাৎকালিক অবস্থা যথাজ্ঞান কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতেছি । ১৮৬২ সালে সংস্কৃত কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তথায় ফার্স্ট আর্টস পড়িতে লাগিলাম । ১৮৬৪ সালে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি-এ পড়িবার জন্ত আলবার্ট হলের দোতলায়স্থিত প্রেসিডেন্সী কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়িতে গেলাম । আমরা যত্বপি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতাম তথাপি সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপেই পরিগণিত হইতাম । ১ আনন্দমোহন বসু আমাদের সতীর্থ, ইহা মনে করিয়া আমরা আপনাদিগকে ধন্য মনে করি । আমাদের আর দুইজন বিখ্যাত সতীর্থ, অতাপি জীবিত আছেন । ১ম—প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুদিন ধরিয়া এলাহাবাদ হাইকোর্টে জজীয়তি করিয়া এক্ষণে পেনশান্ লইয়াছেন । ২য়—রামচরণ মিত্র, কলিকাতা হাইকোর্টের গবর্ণমেন্ট উকীল ছিলেন । নিমাই বসু নামক বিখ্যাত হাইকোর্টের এটর্নী আর-একজন সতীর্থ ।

আমরা যখন থার্ড ইয়ারে গিয়া ভর্তি হইলাম, তখন স্মাওয়ার্ড নামক একজন বয়ীমান্ সাহেব আমাদের ইংরেজি-সাহিত্য পড়াইতেন । সার্ভিক্লিপ অঙ্ক কষাইতেন । বীবি নামক একজন সাহেব ইতিহাস পড়াইতেন । বোধ হয় তখন কাউয়েল সাহেব ছুটিতে বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন । নীচের তালায় একজন সাহেব কেমিস্ট্রী পড়াইতেন । তৎকালে ফিজিক্স স্বতন্ত্র ছিল না ; ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রী একই ছিল । কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বাঙ্গালা পড়াইতেন । ইতিপূর্বে রামচন্দ্র মিত্র নামক একটি বাবু বাঙ্গালা পড়াইতেন । আমরা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র স্মতরাং আমরা বাঙ্গালা পড়িতাম না । কে এম ব্যানার্জি কৃত যজ্ঞদর্শন-সংবাদ এবং মাইকেল মধুসূদন কৃত মেঘনাদবধ কাব্য কোর্স ছিল । ফোর্থ ইয়ারে উঠিয়া অনেক নতন সাহেব দেখিলাম । সী এইচ টনী নামক একজন ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন সাহেব আমাদের ইংরেজি সাহিত্য পড়াইতে লাগিলেন । ক্রফট নামে একজন সাহেব ফিলসফি পড়াইতেন । সী বী ক্লার্ক নামে একজন তৃতীয় রাংলার সাহেব অঙ্ক কষাইতে লাগিলেন । এই ক্লার্ক সাহেব চারিটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়া আনন্দমোহন বসুকে একবারেই বি-এ ও এম-এ পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিলেন । তৎকালে বি-এ পরীক্ষার একমাস পরে এম-এ পরীক্ষা হইত । স্মতরাং আনন্দমোহন আমাদের সঙ্গে বি-এ দিলেন,

এবং একমাস পরেই এম-এ দিলেন। দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ঐ ক্লার্ক সাহেব আনন্দমোহন বস্ককে বিলাত পাঠাইবার প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। আনন্দমোহনের অর্থাভাব হেতু সার্চক্লিফ্ সাহেব তাঁহাকে একবৎসরের জন্ম এঞ্জিনীয়ারিং প্রোফেসর করিয়া দিলেন। তাহাতে যে টাকা উপার্জিত হইল, তাহা লইয়া আনন্দমোহন বিলাত গেলেন। তৎকালে এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গেই ছিল। আনন্দমোহন যখন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন তখন ক্রীক্ রোতে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন। একদিন আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি উপর তালায় ছিলেন। আমি নাম পাঠাইয়া দিবামাত্র তিনি চটজুতা পায় নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে আমার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং শ্রীতিপূর্ব্ববচনে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। আমি বলিলাম—“আনন্দমোহন! আমি মনে করিয়াছিলাম তুমি আমাকে চিনিতে পারিবে না! কিন্তু তাহা নহে। তুমি ঠিক সেই আনন্দমোহনই আছ।” তাহাতে আনন্দমোহন বলিলেন—“এ জীবনে আপনাদিগকে কখনো ভুলিতে পারিব না।”

আমাদের সময় ৬টি বিষয়ই কম্পালসারি ছিল। ১ম ইংরেজি, ২য় অঙ্ক, ৩য় সংস্কৃত বা বাঙ্গালা, ৪র্থ ফিলসফি, (mental ও moral) ৫ম ইতিহাস এবং ৬ষ্ঠ কেমিস্ট্রি বা কনিক্‌স। আমি দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাসে ৩ নম্বরের জন্ম ফেল হইয়াছিলাম। ক্যাপ্টেন্ আইভস্ ইতিহাসের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি আনন্দমোহন প্রভৃতি ভাল ভাল ছাত্রকে এত কম নম্বর দিয়াছিলেন, যে, সার্চক্লিফ্ সাহেব গ্রেস দিয়া অনেককে পাস্ করিয়া দিলেন। ইতিহাসে ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ হইলেই পাস হওয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে বৎসর ১২০ জন বি-এ ছাত্রের মধ্যে ৮০ জন ইতিহাসে ফেল হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছিলাম আইভস্ সাহেব নিজে বি-এ বলিয়া তাঁহাকে এম-এর পরীক্ষক করা হয় নাই। এইজন্ম তিনি রাগ করিয়া ঐরূপ ফেল করাইয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা ভগবান্ই জানেন। “রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, খড়ি খাগড়ার প্রাণ যায়।” প্রথমত ঐবার ফেল হওয়াতে আমার মনে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। কারণ ইতিপূর্বে আমি কখনো কোনো পরীক্ষায় ফেল হই নাই। সুতরাং ফেল হওয়াতে আমার শরীর এরূপ ভগ্ন হইয়া পড়িল যে, আমি পর বৎসরে আর বি-এ পরীক্ষা দিতে পারিলাম না। এস্থলে আমি পাঠক ছাত্রদিগকে একটি বিষয় বলিব। লোকপ্রবাদ আছে “দেখে শিখে ও ঠেকে শিখে।” আমার অদৃষ্টে “ঠেকে শিখে” ঘটিয়াছে। আমি পঠদশায় নিজ স্বাস্থ্যের প্রতি বড় মনোযোগ দিই নাই। অসময়ে আহার ও অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়াতে আমার সাংঘাতিক পিত্তশূল রোগ উপস্থিত হইল। অত্য়াপি ঐ রোগে ভুগিতেছি, এবং যতদিন বাঁচিব ততদিন ঐ রোগে ভুগিতে হইবে। আমি যখন চাকরি করিতাম তখন পকেটে খানিকটা সোডা লইয়া যাইতাম। পড়াইতে পড়াইতে শূল-বেদনা উপস্থিত হইলে মালী দ্বারা জল আনাইয়া ঐ সোডা খাইয়া কিঞ্চিৎ স্নহ হইলে তবে আবার পড়াইতাম। আমার ছায় আর যেন কেহ এরূপ পিত্তশূল রোগে আক্রান্ত না হন—ইহা আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। পাঠক বোধ হয়

শুনিয়া থাকিবেন মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই রোগে আক্রান্ত হওয়াতে একটি আশ্রয় খাইতে পারিতেন না। আমারও দশা তাহাই। অতএব হে ছাত্রগণ! তোমরা সাবধান হও; কালিদাস লিখিয়া গিয়াছেন—“শরীরামণ্ডং খলু ধর্ম সাধনম্”। শরীর রক্ষা কর, নতুবা ধর্মের সাধন হইবে না।

১৮৬৯ সালের প্রথমেই আমার প্রেসিডেন্সী কলেজে চাকরি হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় তৎকালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সিনিয়র সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। এবং স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জুনিয়র সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। একদিন হঠাৎ কৃষ্ণকমলবাবু আমাকে বলিলেন, “হরিশ! তুমি আমাদের কলেজে এডিশনাল পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছ; অতএব আগামী কল্যা হইতে চাকরিতে যাইও; তুমি অগ্রে সার্টিফিক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও।” আমি তাঁহার আদেশাল্লাসারে পরদিন সার্টিফিক্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন,—“কৃষ্ণকমল তোমাকে পাঠাইয়াছেন।” আমি কহিলাম,—“আজ্ঞে।” তিনি কহিলেন,—“যাও চাকরি করগে।” এইরূপে বিনা দরখাস্তে আমার চাকরি হইল।

আমার চাকরির কারণ আমি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছিলাম। ডাঃ কে এম ব্যানার্জি তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সাহিত্যের পরীক্ষক হইতেন। তিনি নাকি সার্টিফিক্ সাহেবকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, “তোমার কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য পড়ান হয় ভাল; কিন্তু ব্যাকরণ পড়ান বা অল্পবাদ করান ভাল হয় না।” সার্টিফিক্ সাহেব কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই কার্যের জন্ত আমাকে নিযুক্ত করেন।

আমি যখন প্রথম চাকরি করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন দেখিলাম প্যারিচরণ সরকার মহাশয় এবং মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফার্সট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ারে পড়ান। প্যারিবাবু ইংরেজি কবিতা ও মহেশবাবু ইংরেজি গণ্য পড়াইতেন। রীস নামে এক ফিরিঙ্গী সাহেব অঙ্ক কষাইতেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত পড়াইতেন। আমি প্রত্যহ এক ঘণ্টা মাত্র কার্য করিতাম। সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান ও ইংরেজি হইতে সংস্কৃত অল্পবাদ করান আমার উপর ভার ছিল। আমি প্রথম দিন যখন ক্লাশে পড়াইতে যাই, তখন ছাত্রেরা একটু চঞ্চল হইয়াছিল। তাহারা রাজকৃষ্ণবাবুকে বলিয়াছিল,—“মহাশয়! আমাদের একটি ‘কুচো’ পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন।” তাহা শুনিয়া রাজকৃষ্ণবাবু নাকি বলিয়াছিলেন,—“ওহে বাবু! ও বড় কুচো পণ্ডিত নয়, ও বড় বুড়ো পণ্ডিত, ইহার পর দেখিতে পাইবে।” ইহার পর হইতে ছাত্রেরা আমাকে খুব ভক্তি করিতে লাগিল। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; এবং কেহ কেহ অধরচন্দ্র [লাল] সেন প্রভৃতি। সেই অধর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিল রাজকৃষ্ণবাবু যাহা পড়া দিতেন তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা করিত। আমি বলিতাম,—“দেখ বাপু! ইহাতে রাজকৃষ্ণবাবু আমার উপর রাগ করিতে পারেন।” ছাত্রেরা বলিত,—“মহাশয় আমাদের ত পড়া চাই।”

এইরূপে ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৩ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর চাকরি করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন সার্টক্লিক সাহেব আসিয়া বলিলেন,—“Pundit, your service is no longer needed,” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন?” তিনি কহিলেন, “It is the order of the Lt. Governor.” আমাকে ঐ কথা বলিয়া মহেশবাবুকে কহিলেন, “You are pensioned off.” মহেশবাবু কহিলেন, “আমার ত এখন পেনশনের সময় হয় নাই।” তাহাতে সার্টক্লিক কহিলেন, “You are compelled to retire.” তৎকালে ক্যাশেল নামক একজন ছোটলাট বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হইয়া বিলাত হইতে ব্যয়সঙ্কোচার্থ আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়াই সকল সরকারী ডিপার্টমেন্ট হইতে লোক ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ক্যাশেল মেডিক্যাল স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করিয়া যান। ইতিপূর্বে পটলডান্ডার মেডিক্যাল কলেজের একদিকে বাঙ্গালা ডাক্তারী ক্লাশ ছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকরি যাওয়ার পর আমি আর কোন চাকরি করি নাই; পৈতৃক “গিরিশ বিহারত্ব যন্ত্র” চালাইতে লাগিলাম।

যখন প্রেসিডেন্সী কলেজের সৃষ্টি হয় নাই তখন Hindu College নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। তাহার দুইটি Department ছিল—Senior ও Junior। শ্রীযুক্ত প্যারিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, [প্রসন্ন] শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার ইত্যাদি অনেকগুলি ছাত্র এই বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন Captain Richardson নামে একজন সাহেব শিক্ষক ছিলেন। তিনি Richardson's Selections নামে দুইখানি বই প্রস্তুত করেন। এই পুস্তকগুলি Hindu College-এ পড়া হইত। আমরা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, একদিন Macaulay সাহেব ঐ College দেখিতে আসেন। তিনি ছাত্রদিগকে Hamlet হইতে স্লপ্রসিদ্ধ passageটি to be or not be ব্যাখ্যা করিতে দেন। ছাত্রেরা নীরব হইয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল—যখন Macaulay সাহেব এই স্থানটি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন এই স্থানে অল্প কোন গুঢ় অর্থ থাকিবে, এই ভাবিয়া তাহারা কেহ কিছু বলে নাই। তাহা দেখিয়া Richardson সাহেব ভারি বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি তোমাদিগকে যেরূপ পড়াইয়াছি, তাহা বল। তাহাতে ছাত্রেরা বলাতে Macaulay সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

এই সময়ে হরমোহন চট্টোপাধ্যায় নামে একটি বাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি Head clerk-এর কাজ করিতেন, এবং প্রত্যাহ ১১টার পর একবার সকল class পর্যটন করিয়া যাইতেন। তৎকালে Presidency College ১১টার সময় বসিত। (হরমোহন বাবুর ২য় পুত্র চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায় পরে Deputy Magistrate হইয়াছিলেন।) হরমোহনবাবুর আর একটি কাজ ছিল জরিমানা আদায় করা। Principal সাহেব বা অল্প কোন Professor যদি কোন ছাত্রের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাহাকে জরিমানা করিতেন,

তাহা হইলে হরমোহনবাবু ঐ জরিমানার টাকা আদায় করিতেন। একবার বিখ্যাত ছাত্র কমলাকান্তকে কোন Professor এক টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। পরদিন কমলাকান্ত ১২ টাকার পয়সা, আধ পয়সা ও কড়ি আনিয়া হরমোহনবাবুর টেবিলে রাখিয়া দেয়। হরমোহনবাবু কহিলেন, “কমলাকান্ত! ও কি?” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয় জরিমানার টাকা।” হরমোহনবাবু বলিলেন, “আমি এত পয়সা, আধ পয়সা ও কড়ি গণিতে পারিব না।” কমলাকান্ত কহিল—“মহাশয়! এ সবে কি মূল্য নাই? মহাশয়, আপনি যদি না লন, বলুন, আমি সাহেবের নিকট গিয়া দিই।” তাহাতে হরমোহনবাবু বলিলেন, “না, না, আর তোমার সাহেবের নিকট লইয়া যাইবার দরকার নাই। আমি লইতেছি।” বলা বাহুল্য যে হরমোহনবাবু সার্টক্লিফ সাহেবকে বড় ভয় করিতেন। হরমোহনবাবুর সহিত কমলাকান্তের এইরূপ তামাসা চলিত। একদিন First Year Class-এর একখানি কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। হরমোহনবাবু ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কমলাকান্ত, তোমাকে কাচের দাম দিতে হইবে।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয় জানিলেন কিরূপে যে আমি কাচখানা ভাঙ্গিয়াছি।” হরমোহনবাবু কহিলেন, “তুমিই যত অনিষ্ট করিবার কর্তা।” কমলাকান্ত কহিল, “মহাশয়! সেদিন দপ্তরি যে কালীর বোতল ভাঙ্গিয়াছিল, সে কাজটি কি আপনি করিয়াছিলেন?” হরমোহনবাবু বলিলেন, “আরে সে দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! আমাদের ঘরের কাচ যে দৈবাৎ ভাঙ্গে নাই, আপনি জানিলেন কেমন করিয়া?” হরমোহনবাবু কহিলেন, “তোমরা ছটোপাটি করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়াছ, আমি সাহেবকে বলিয়া দিব।” কমলাকান্ত বলিল, “আঞ্জে! আমিও সাহেবকে বলিব, যে হরমোহনবাবু গবর্নমেন্টের এক বোতল কালী নষ্ট করিয়াছেন।” হরমোহনবাবু কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে আমি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়াইতাম ও translation করাইতাম। একদিন কমলাকান্ত আমাকে বলিল,—“পণ্ডিত মহাশয়! ব্যাকরণ ত মুখস্থ হয় না, কি করি বলুন দেখি? ইহার কি কোন সহজ পথ নাই?” আমি বলিলাম, “বাপু! আমরা বালক কাল হইতে ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়াছি। কোন সহজ পথ ত দেখি নাই।” কমলাকান্ত বলিল, “পণ্ডিত মহাশয়! আপনি যদি না বকেন, তাহা হইলে বলি।” আমি কহিলাম। “কি বল না।” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! না পড়াই সহজ পথ।” আমি বলিলাম, “বাপু! একটু একটু পড়িও, নতুবা বিঘা হইবে কেন? পরীক্ষায় ফেল হওয়া বড় লজ্জার কথা।” আর একদিন কমলাকান্ত আমায় বলিল, “পণ্ডিত মহাশয়! আমি ত translation লিখিতে পারি না, আঙ্গুল ব্যথা করে।” আমি কহিলাম, “তুমি এত ইংরেজি লেখ কেমন করিয়া?” কমলাকান্ত বলিল, “মহাশয়! ইংরেজি খুব চড়চড় করিয়া লিখিতে পারি। তাহাতে ত আঙ্গুল ব্যথা হয় না। সংস্কৃত অক্ষর লিখিতে গেলে আঙ্গুলের বড় খাটুনি হয়; বিশেষতঃ বড়ো আঙ্গুলে সংযুক্ত অক্ষরগুলো লিখিতে বড় কষ্ট হয়। শীঘ্র লিখিতে পারা যায় না, বড় দেরি হয়।”

তিন বৎসর বেকার বসিয়া থাকার পর ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার আবার পূর্বের চাকরিই হয়। পাঠক দেখুন, আমার ৮ বৎসর break of service হইল। দ্বিতীয়বার চাকরির কারণ আমি যে রূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি। ছোট লাট ক্যাথেল সাহেব ৩ বা ৩।০ বৎসর চাকরি করিয়া অসুস্থ-দেহ হইয়া পড়েন। ডাক্তারগণ তাঁহাকে বিলাত যাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি স্বদেশে গমন করিলেন। মিষ্টার গ্রে নামক একজন সাহেব Offg. ছোট লাট হইলেন। ঐ সময় সার্টক্লিফ সাহেব কৃষ্ণকমলবাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি ছাপাখানার কাজ করিতেছি, হঠাৎ একদিন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব সংস্কৃত কলেজের একটি বেহারা দ্বারা পত্র লিখিয়া আমাকে জানাইলেন,—“হরিশ! তুমি এখনি সার্টক্লিফ সাহেবের সঙ্গে Senate House-এ গিয়া দেখা কর।” তাঁহার আদেশক্রমে আমি তথায় গিয়া সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলাম। আমি এমনি বোকা যে গত তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত একদিনও দেখা করিতে যাই নাই। কিন্তু তিনি আমাকে ভুলেন নাই। আমি যাইবামাত্র তিনি কহিলেন,—“How are you, Haris?” আমি কহিলাম,—“In a manner starving.” ইহা শুনিয়া সাহেব আমাকে কহিলেন,—“Go to the Presidency College and take out your Routine.” এই আমার appointment। এস্থলে পাঠক! একটি মজার কথা শুন। Presidency College-এ একটি ৫০ টাকার চাকরি হইবে জানিতে পারিয়া ৬মহেশচন্দ্র ত্রায়বর মহাশয় একটি M.A. ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া সার্টক্লিফ সাহেবের নিকট গিয়াছিলেন; গিয়া বলিলেন,—“Sir, Sir, শুনিলাম আপনার কলেজে একটি চাকরি খালি আছে; তজ্জন এই একটি M.A. ছাত্রকে আনিয়াছি। আপনি ইহাকে ঐ চাকরি দিন।” সার্টক্লিফ সাহেব বলিলেন,—“Where is Haris? Is he in Calcutta? Is he employed elsewhere? Better call him, Mahes! I do’nt want any M.A.”—ত্রায়বর মহাশয় হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসেন।

সার্টক্লিফ সাহেবের হুকুম পাইয়া আমি সেই দিনই Presidency College-এ গেলাম; এবং তথাকার Asstt. Secretary মহাশয়ের সহিত দেখা করিলাম। (পরে শুনিয়াছিলাম তাঁহার নাম ব্রজনাথ লাহিড়ী।) তিনি আমাকে দেখিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—“তুমি বৈদিক?” আমি বলিলাম,—“বৈদিক বলিয়া আপনি এত ভয় পাইলেন কেন?” তিনি কহিলেন “না, না।” পরে এই ব্রজনাথবাবুর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

এবার যখন Presidency College-এ প্রবেশ করিলাম তখন অনেক পরিবর্তন দেখিলাম। ১ম Senate House হইয়াছে। ২য় Presidency College বাড়ী হইয়াছে; ৩য় শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্বে Librarian ছিলেন, এফগে Asstt. Registrar হইয়াছেন; ৪র্থ হরমোহনবাবু নাই, তৎপদে পূর্বোক্ত ৬ব্রজনাথ লাহিড়ী নিযুক্ত হইয়াছেন, পঞ্চম Chemistry পড়াইবার জ্ঞান Pedler নামে এক সাহেব আসিয়াছেন; Physics

স্বতন্ত্র পড়ান হইতেছে, তজ্জন্ম Booth নামে একজন সাহেব আসিয়াছেন ; ৬ষ্ঠ অঙ্ক পড়াইবার জন্ম শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত আসিয়াছেন। B.A. Class-এ পড়াইবার জন্ম তাশ নামে আর একটি সাহেব আসিয়াছেন। তাহার অনেক দিন পরে লিটল নামে একটি সাহেব অঙ্ক পড়াইবার জন্ম আসেন। কার্ক সাহেব Botanical Garden-এ চলিয়া গিয়াছিলেন। সার্টিফিকার পড়াইতেন না। তিনি আমাদের Principal ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar ছিলেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র নামে এক ব্যক্তি Booth সাহেবের assistant ছিলেন। তিনি প্রাচীন হইয়াছিলেন এবং একটু বেশি মোটা ছিলেন। বুথ সাহেব তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না, এবং মধ্যে মধ্যে তাড়া করিতেন। একদিন সাহেবও রাজকৃষ্ণবাবুকে “নিকাল দেও” বলাতে উক্ত রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলেন যে সাহেব তাঁহাকে তাড়াইবার জন্ম চাপরাশিকে হুকুম দিতেছেন ও ভয়ে পলায়ন করেন। পরে জানা যায় যে সাহেব নিকল নামক সাহেবের গ্রন্থ চাহিয়াছিলেন। যতক্ষণ না রাজকৃষ্ণবাবু কলেজের কম্পাউণ্ডের বাহিরে যাইলেন ; ততক্ষণ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ঐ প্রকাণ্ড জোয়ান আইরিশম্যান বুথ সাহেব যাইলেন। রাজকৃষ্ণবাবু গেটের বাহিরে বড় রাস্তায় গেলে সাহেব নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া রাজকৃষ্ণবাবু শীঘ্র পেনশন লইলেন, তবে বুথের ভয় তাঁহার ঘুচিল। রাজকৃষ্ণবাবুর পদে হৃদয় বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন M.A. নিযুক্ত হন। হৃদয়বাবু অতি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বুথ সাহেবের মন যোগাইয়া চলিতে পারিতেন, তজ্জন্ম উক্ত সাহেব তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। দুঃখের বিষয় ! হৃদয়বাবু আর এ জগতে নাই।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ ভাটুড়ি B.A. নামক একজন ছাত্র Chemistry Professor-এর assistant ছিলেন। পেডলার সাহেব যখন Director হইয়া যান তখন পি. মুখার্জী নামক একজন বিলাত-ফেরত হুগলী কলেজ হইতে Presidency College-এ আসেন। তিনি পরে Presidency Circle-এর Inspector of Schools হইয়াছিলেন এবং এক্ষণে পেনশন লইয়াছেন। তাঁহার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি আমার পুরাতন ছাত্র হইলেও আমার সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা না কহিয়া ইংরেজি ভাষায় কথা কহিতেন।

তাঁহার অনেক দিন পরে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসু বিলাত হইতে আসিয়া Presidency College-এ ক্রমাগত Chemistry ও Physics পড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহারা দুইজনেই অতি ভদ্রলোক। বিলাতে গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মনে কোন অহঙ্কার নাই। জগদীশচন্দ্র বসু এক্ষণে একটি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রথিতযশা হইয়াছেন। সেকথা পাঠক জানেন বলিয়া আর বলিলাম না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় গান্ধী মহাত্মার শিষ্য হইয়া দেশে-দেশে চরকার চলন করিতেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় ও আমি একত্র হইয়া “রসার্ণব” নামে একখানি সংস্কৃত রসগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছি। Asiatic Society of Bengal এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়াছেন।

সার্টিফিক সাহেব পেনসন লইয়া বিলাত যাইবার সময় Croft সাহেবকে Director of Public Instruction করিয়া যান। ঐ পদ টনি সাহেবের পাওয়া উচিত ছিল; কারণ তিনি ১ বৎসরের senior in service ছিলেন। লোকে বলে যে, সার্টিফিক সাহেব Croft সাহেবকে বিশেষ চতুর দেখিয়া ঐ কাজ করেন। টনি সাহেব বড় ভাল মাহুস বলিয়া তাঁহাকে Presidency College-এর Principal ও বিশ্ববিদ্যালয়ের Registrar করিয়া যান। কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্তে Croft সাহেব ও টনি সাহেব এ উভয়ের মধ্যে বড় মনোভঙ্গ (বাঙ্গালা ভাষায় যাহাকে চটাচটি বলে) হইয়াছিল। টনি সাহেব যদি কখনও তাঁহার অধীনস্থ কোন শিক্ষকের প্রমোশন হউক বলিয়া লিখিতেন, Croft সাহেব তাহা অগ্রাহ করিতেন। এই বিবাদের মধ্যে পড়িয়া আমার দশ বৎসর কোন প্রমোশন হয় নাই। ৫০ টাকা বেতনে থাকিতে হইয়াছিল। পরে টনি সাহেব একবার বিলাত যাওয়াতে বেলেট নামে একজন স্কুল ইনস্পেক্টর সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। আমি ঐ বেলেট সাহেবকে আমার দুর্দশার কথা বলিয়াছিলাম। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ বেলেট সাহেবই ছয়মাসের জন্ত ডিরেক্টর হইয়া যান। তিনি আমার কথা মনে করিয়া স্বয়ং আমাকে ৫০ হইতে ৭৫ গ্রেড দেন। পরে যখন টনি সাহেব একবার ডিরেক্টর হইয়া যান, তখন আমাকে ১০০ হইতে ১৫০ গ্রেড দেন। টনি সাহেব বিপিনবিহারী গুপ্ত M.A. ও আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং আমরা যাহাতে কিছু টাকা পাই তাহার উপায় করিয়া দিতেন। বিপিনবাবুকে ১০০ টাকার একটি মেম পড়ান কাজ জুটাইয়া দিয়াছিলেন। লরেটো হাউসের একজন বিবি শিক্ষয়িত্রীকে অল্প কয়মাইতে হইত। আর আমাকে নক্‌স নামক এক সাহেব পড়ান কাজ জুটাইয়াছিলেন; বেতন ৪৫ টাকা। নক্‌স সাহেব পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের চিফ জাষ্টিস হইয়াছিলেন। আর Robinson Crusoe নামক একখানি ইংরেজী পুস্তক বাঙ্গালায় অলুবাদ করিতে আমাকে দেন। আমি ঐ কার্যে প্রায় ২৫০ পাইয়াছিলাম।

একবার প্রেসিডেন্সী কলেজের 1st year ছাত্রেরা টনি সাহেবের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিল যে,—“মহাশয়! আমরা মুসলমান ছাত্রগণের নিকট বসিতে পারিব না; কারণ, তাহাদের মুখ হইতে বড় পেঁজের গন্ধ বাহির হয়, তাহা আমাদের অসহ্য হয়।” এই দরখাস্ত পাইয়া প্রিন্সিপ্যাল টনি সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, “দেখ হরিশ! তোমার ছাত্রেরা কি দরখাস্ত করিয়াছে।” তাহা পাঠ করিয়া আমি বলিলাম,—“মহাশয় যে ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহা পালন করিব।” তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন হরিশ! আমি কোন বন্দোবস্ত করিব না, যাহা করিতে হয় তুমি কর। আমি “যে আজ্ঞে” বলিয়া পরদিন আমার ঘরের বেহারাকে একখানি বড় বেঞ্চ আমার বাম দিকে দিতে বলিলাম, এবং মুসলমান ছাত্রদিগকে বলিলাম, “তোমরা প্রত্যহ এই বেঞ্চে বসিও, আর কোন বেঞ্চে বসিও না।” এবং হিন্দু ছাত্রদিগকে সন্মোদন করিয়া বলিলাম,—“বাপুসকল! তোমরা সকলেই আমার ছাত্র; কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই আমি সমান চক্ষে দেখি; কোন ইতরবিশেষ করি

না।” এই বলিয়া ভবভূতির উত্তর চরিত হইতে বিতরিত গুরু: প্রাজ্ঞে ইত্যাদি একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সকল ছাত্রকে কহিলাম,—“বাপুসকল! তোমাদের পরস্পর জাতিভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু আমার নিকট কোন জাতিভেদ নাই। আমার নিকট পড়ার ভালমন্দই জাতি, অর্থাৎ যে ভাল পড়ে, সেই আমার নিকট ভাল জাতি। আর যে আমার লেকচারে মনোযোগ দেয় না, সে আমার নিকট মন্দজাতি। জগতে জাতিভেদে আহার ও ব্যবহারের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও ঘৃণা করা অপরের উচিত নহে। দেখ আমার পিতার একটি ছাপাখানা আছে। আমি তথায় কাৰ্য করি। ছাপাখানায় হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিই আছে। আমি তাহাদের সহিত সমান ব্যবহার করি।” আমার এইরূপ উপদেশ শুনিয়া আমার ছাত্রগণ নীরব হইয়া রহিল। হইতে পারে, এইরূপ বন্দোবস্তে হিন্দু ছাত্রেরা আমার উপর বিরক্ত হইল; জগতের সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না। একজনকে সন্তুষ্ট করিতে গেলে অপরজন বিরক্ত হয়। এরূপ স্থলে শিক্ষক সমদর্শী হইবেন; কখনো ভিন্ন-ভাবাপন্ন হইবেন না। ইহাই আমার মত।

আমার ছাত্রেরা এক-একদিন এক-একটি কুট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। একদিন এক ছাত্র কহিয়াছিল—“মহাশয়, কর্মফল যদি প্রবল হইল, তবে ঈশ্বরকে মানিবার দরকার কি?” আপনি বলিয়া থাকেন “নমস্ত্যকর্মভ্যো বিধিরপি ন যেতাঃ প্রভবতি।” অর্থাৎ কর্মফলের নিকট বিধাতাও প্রবল হইতে পারেন না। এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি কহিলাম “বাপু! তোমরা জান, হাইকোর্ট একটি আছে, এবং জেলখানাও আছে। কোন অপরাধীকে হাইকোর্ট দণ্ড দিলেন—৭ বৎসর মেয়াদ। পুলিশের লোক তাহাকে জেলে লইয়া গেল; তথায় জেল দারোগা সাহেব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন—“তাহাকে পাথর ভাঙিতে হইবে।” এক্ষণে দেখ বাপু! মনে কর, High Court ভগবান্। কর্মফল জেল দারোগা! এস্থলে অপরাধীকে ৭ বৎসর ধরিয়া মেয়াদ খাটিতে হইবে, ইহা High Court-এর ছকুম। High Court এমন কথা বলে নাই, যে তাহাকে এই-এই কাজ করিতে হইবে। সেকাজ জেল দারোগা বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। এক্ষণে এই উপমার সহিত জগতের জীবের তুলনা করিয়া দেখ। জীব পূর্ব জন্মে যে-সকল কাৰ্য করে, ভগবান তাহা দেখিয়া থাকেন; কারণ, তিনি সাক্ষীমাত্র ইহা হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। জীব পূর্বজন্মে পাপ বা পুণ্য বাহাই করে, পরজন্মে তাহার তদ্রূপ ফলভোগ করে। যদি একটু পুণ্য করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই পরিমাণে সুখভোগ করে। যদি একটু পাপ করিয়া থাকে, পরজন্মে সেই পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। এস্থলে দেখ, কিরূপ সুখ বা কিরূপ দুঃখ জীব ভোগ করিবে, তাহা তাহার কর্মফলের অঙ্গসারে হইয়া থাকে। ভগবান তাহার ইতর বিশেষ করেন না।

কিছুকাল পূর্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে Gilchrist পরীক্ষা দিবার জন্য দুইটি ছাত্র উপস্থিত হইলেন। ১ম H. M. Percival, ২য় P. K. Lahiri। যে-কয়েক দিন পরীক্ষা হইয়াছিল, সে-কয়েকদিন আমাকেই guard হইতে হইয়াছিল। ঐ পরীক্ষায় Percival

সাহেব পাস হইয়া বিলাতে চলিয়া যান ; পরে তথা হইতে পাস হইয়া আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে Professor হন। P. K. Lahiri Metropolitan Institution-এর অগ্রতম Professor ছিলেন। তিনি পাশ না হওয়াতে বিলাত যাইতে পারিলেন না। Tawney সাহেব তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহার বেতন ৫০০ করিয়া দিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি Tawney সাহেবের চিঠি দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “ওরে! সাহেবেরা আমার কলেজ খেলো করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি তাহা কখনই করিতে দিব না।”

আরও কিছুদিন পরে P. K. Ray ঢাকা হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসিয়া Philosophy পড়াইবার Professor হইলেন। তিনি একখানি Logic রচনা করেন।

Presidency College-এর Libraryর প্রথম Catalogue প্রস্তুত করিবার ভার Rowe সাহেবের উপর পড়ে। এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক সকলের Catalogue করিবার ভার আমার উপর পড়ে। কিন্তু Rowe সাহেব ইংরেজি ও সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সমগ্র Catalogue প্রস্তুত করিবার ভার আমার উপর দিয়াছিলেন; তিনি কেবল শেষ প্রফট দেখিতেন। আমি অনেকদিন পরিশ্রম করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

রাজকৃষ্ণবাবুর পেনশন হওয়াতে ঐ পদে নীলমণি মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। তিনি আমাদের অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন, এবং ৬ মাস আমাদের সঙ্গে পড়িয়া উপরি শ্রেণীতে উঠিয়াছিলেন। আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন—“এ ছেলেটা বড় ধেড়ে, একে উপর শ্রেণীতে দেওয়াই ভাল।” নীলমণিবাবু রামচন্দ্র মিত্রের Private Tutor ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন বাঙ্গালা পড়ান হইত, সংস্কৃত প্রবর্তিত হয় নাই, তৎকালে রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় বাঙ্গালা Professor ছিলেন। তাঁহার পর কৃষ্ণকমলবাবু Senior Professor হন। স্তত্রাং রাজকৃষ্ণবাবু গেলেও আমরা তিনজন Professor রহিলাম। ১ম কৃষ্ণকমল বাবু, ২য় নীলমণিবাবু, ও ৩য় আমি। নীলমণিবাবু M. A. পাস করিয়া ২৪ পরগণার Assistant Deputy Inspector of Schools হইয়াছিলেন। ২৪ পরগণায় ২ জন Deputy Inspector of Schools হইয়াছিলেন—১ম রাধিকা প্রসাদ [প্রসন্ন] মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি চাকরি খালি হওয়াতে (অর্থাৎ রাজকৃষ্ণবাবুর পেনশান হওয়াতে) নীলমণিবাবু যোগাড় করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন।

কিছুদিন পরে তৎকালীন High Court-এর জজ দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় কৃষ্ণকমলবাবুকে High Court-এর ওকালতি করিতে পরামর্শ দিয়া Presidency College ছাড়িতে বলেন। তিনি কলেজ ত্যাগ করিলে নীলমণিবাবু ঐ পদে উন্নীত হন; এবং আমিও নীলমণিবাবুর পদে উন্নীত হইলাম। স্তত্রাং এ সময় আমরা ২ জন বই আর Professor রহিলাম না; কারণ আমার পদটি গবর্নমেন্ট abolish করিয়া দিলেন, তৎপদে আর নতন

লোক রাখিলেন না। ইহাতে নীলমণিবাবু 3rd year ও 4th year পড়াইতে লাগিলেন আমি 1st year ও 2nd year পড়াইতে লাগিলাম। আমি তখন একজন Professor হইলাম। Lord Ripon যে Education Report প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে কলেজের অধ্যাপক মাত্রেরই Professor হইবেন, Assistant Professor বলিয়া আর নাম থাকিবে না। ঐ নিয়ম অনুসারে বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় Professor হইলেন। ইতিপূর্বে তিনি Assistant Professor of Mathematics ছিলেন। Lord Ripon Professor-দিগকে এরূপ ক্ষমতা দিয়াছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদিগকে fine করা বা rusticate করা যে কোন কার্য করিতে পারিবেন *without reference to the Principal*। এই সময় Rowe সাহেব কয়েক মাসের জন্ত Offg. Principal হইয়াছিলেন। তিনি Report-এর underlined কথাগুলি পাঠ করিয়া বড়ই চটয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন Principal সর্বময় কর্তা; Professor-গণ যাহার অধীন। Lord Ripon তাহা করিয়া যান নাই। তিনি সকল Professorকে সমান ক্ষমতা দিয়া গিয়াছিলেন। (Lord Ripon প্রকাশিত Education Report দেখুন)।

প্রতি বৎসর 1st year ও 3rd year class-এ যে পরীক্ষা হইত তাহার ফল দেখিয়া প্রমোশন দেওয়া হইল। ঐ দুই পরীক্ষার ফল বিপিনবাবু ও আমি দুইজনে একত্র হইয়া স্থির করিলাম। Tawny সাহেব ঐ ভার আমাদের দুইজনের উপর দিতেন। Tawny সাহেব এতাদৃশ সদাশয় লোক ছিলেন যে, ছাত্রেরা ফেল হইলে যদি আমরা অনুরোধ করিতাম, তাহা হইলে Tawny সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে Promoted করিতেন। একবার একছাত্র অঙ্কে শূন্য পাইয়াছিল। বিপিনবাবু অনুরোধ করিলেন,—“ঐ ছাত্রকে উঠাইয়া দিউন, আমি 2nd year-এ তাহাকে প্রস্তুত করিয়া লইব।” Tawny সাহেব হাসিয়া সই করিলেন। এইরূপ কার্য করাতে ছাত্রেরা আমাদের দুইজনকে বড় ভালবাসিত, এবং আমাদের খুব বাধ্য ছিল। একবার Robson নামে একটি সাহেবের টমটম গাড়ী ঘিরিয়া ছাত্রেরা দাঁড়াইয়াছিল। সাহেব কিছুতেই বাড়ী যাইতে পারিতেছিলেন না। এমন সময়ে আমি উপর তলা হইতে নামিয়া আসিয়া ঐ কাণ্ড দেখিলাম। সাহেব উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—“Pundit! see the behaviour of your students.” আমি তৎক্ষণাৎ ছাত্রদিগকে বাড়ী যাইতে বলিলাম, এবং কহিলাম, আগামী কল্য আমি তোমাদের উপায় করিব। ব্যাপার হইয়াছিল কি, পাঠক শুনুন। Robson Missionary সাহেব ছিলেন। ছেলেরা বলিল, তিনি ইংরেজি ভাল পড়াইতে পারেন না। তৎক্ষণাৎ Tawny সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল। সাহেব বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এইজন্ত তাহার Robson সাহেবকে উত্ত্যক্ত করিয়া তাড়াইয়া দিবে এই তাহাদের মতলব ছিল। পরদিন Tawny সাহেবকে সব বৃত্তান্ত বলিলাম। এবং Robson সাহেবকে transfer করিবার জন্ত Director সাহেবকে লিখুন বলিয়া অনুরোধ করিলাম। Tawny সাহেব আমার অনুরোধ রক্ষা

করিলেন। এক সপ্তাহ মধ্যে Gazette-এ দেখিলাম, Robinson সাহেব পাটনায় transferred হইয়াছেন।

একবার নীলমণিবাবু কিছুদিনের জ্ঞান ছুটি লইয়াছিলেন, বোধ হয় তিন মাস। শ্রীযুক্ত শামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেয়ার স্কুলের হেড পণ্ডিত ছিলেন এবং Tawny সাহেবের Private Tutor ছিলেন। Tawny সাহেব উক্ত পণ্ডিত মহাশয়কে নীলমণিবাবুর কার্বে নিযুক্ত করিলেন। একদিন পড়াইয়া তাঁহাকে আর 3rd year-এ পড়াইতে হয় নাই। কারণ তথাকার ছেলেরা দরখাস্ত করিয়াছিল—শামাচরণ পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়াইতে পারিবেন না, হরিশ পণ্ডিত মহাশয়কে আমাদের পড়াইতে দিন। Tawny সাহেব পরদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—“হরিশ! তুমি নীলমণির কাজের ভার নাও, এবং তোমার কাজের ভার শামাচরণকে দাও।” দুঃখের মধ্যে এই হইল—শামাচরণবাবু office allowance পাইতে লাগিলেন; আমি কিছুই পাইলাম না।

একবার Tawny সাহেব শামাচরণবাবুর প্রতি এরূপ অহুগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে Presidency College-এ আনিয়া আমাকে হেয়ার স্কুলে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি ঐ কথা Tawny সাহেবকে বলিয়াছিলাম, “কি অপরাধ দেখিলেন যে, আমাদের Presidency College হইতে দূর করিয়া দিতেছেন?” তাহা শুনিয়া সাহেব বলিলেন,—“আমি শামাচরণের উপকার করিবার জ্ঞান এরূপ বন্দোবস্ত করিব মনে করিয়াছি।” Tawny সাহেব আমার কথায় বড় মনোবোগ দিলেন না। কিন্তু আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা Tawny সাহেবের ঐ প্রস্তাব শুনিয়া 1st year, 2nd year, 3rd year ও 4th year-এর সমস্ত ছাত্র Tawny সাহেবের নিকট একটি দরখাস্ত করিলেন! তাহার মর্ম এই—যদি আপনি হরিশপণ্ডিত মহাশয়কে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অপসারিত করেন, তবে, আমরা সকলেই কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। Croft সাহেব এই ব্যাপার শুনিতে পাইয়া লিখিয়া পাঠান, হরিশকে কোনরূপে যেন স্থানান্তরিত করা না হয়। Tawny সাহেব শামাচরণবাবুর নিকট বড় অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, এবং ব্রজ লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, তুমি শামাচরণকে বলিও—“What can I do? The Whole Presidency College is for Haris. Even the Director is for Haris.”

যখন নীলমণিবাবু সংস্কৃত কলেজের Principal হইয়া যান তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী Senior Professor হইলেন এবং আমি কেবল Professor রহিলাম। তখন একটি মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. দিবার জ্ঞান আমাদের কলেজে আসে। সে প্রথমে সংস্কৃত কলেজে গিয়াছিল। কিন্তু মহেশ ত্রায়বর মুসলমান বলিয়া তাহাকে ভর্তি করেন নাই। সে ছাত্র নাগপুরের জেল দারোগার পুত্র। তাহার নিতান্ত ইচ্ছা—সংস্কৃতে M. A. দেয়। সে Tawny সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল ভর্তি হইবার জ্ঞান। সাহেব জবাব দিয়াছিলেন—“আমি একটি ছেলের জ্ঞান Class খুলিতে পারিব না।” পরে তিনি আমাকে ও হরপ্রসাদকে ডাকিয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন—“তোমরা এই ছাত্রটিকে M. A. পড়াইতে পারিবে কি না?” আমরা উত্তর করিলাম, “আপনি যদি হুকুম করেন, তবে পড়াইতে পারি।” সাহেব বলিলেন, “আমি একটি ছেলের জন্ম ২ জন Professorকে হুকুম দিতে পারি না। তবে তোমরা যদি ইচ্ছা করিয়া ইহাকে পড়াও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।” আমি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বলিলাম, “দেখ হরপ্রসাদ (হরপ্রসাদ আমা অপেক্ষা ১০ বৎসরের ছোট হইবে) যদি কোন মুসলমান ছাত্র সংস্কৃত M. A. পড়িতে আসে, তবে তাহাকে সংস্কৃত কলেজ যদি না লয়, এবং আমরাও (অর্থাৎ Presidency College) যদি না লই, তবে সে যায় কোথায়? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কহিলেন—“দাদা যদি তুমি খাটিতে পার, তবে ভার গ্রহণ কর। আমি দুই একখানা কাব্যের ভার গ্রহণ করিতে পারি।” আমি বলিলাম—“তুমি আমাকে যে ভার দিবে, আমি লইব।” এইরূপ কথার পর ঐ ছাত্রকে Presidency কলেজে ভর্তি করা হইল। আমি নিজ নিয়মিত কাজ করিয়া অবকাশকালে তাহাকে বেদান্তচতুঃসূত্রী, কাব্যপ্রকাশ, অলঙ্কার, পানিনি ব্যাকরণ (বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট অংশ) পড়াইবার ভার লইলাম। ছুঃখের বিষয় এই—উক্ত মুসলমান ছাত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

‘প্রবাসী’ কার্তিক, ১৩২২

নূতন মানবতাবাদ

অমরকুমার দত্ত—পঞ্চম বর্ষ, কলা

এক

আধুনিক যুগে মানবসভ্যতার সর্বগ্রাসী সংকট প্রত্যেক চিন্তাশীল লোকের মনে গভীর উদ্বেগের ছায়াপাত করেছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন দিকেই আজ পর্বস্ত এমন কোন রাষ্ট্রিক শাসনতন্ত্রের কাঠামো বা সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি হল না যার ফলে সমাজের সকল স্তরের সকল মানুষের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে। ধনতন্ত্রের অসাম্য, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নৈতিক বিদ্রোহ জানিয়ে এমন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা গঠন করা যেখানে সকলেই সমানভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করবে—এই ছিল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য যার পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মার্ক্সবাদের মধ্যে। মার্ক্সবাদের বাস্তব প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই বিপ্লবোত্তর রুশ সমাজ ব্যবস্থায় এবং বিংশ শতাব্দীর নিপীড়িত, শোষিত জনগণের মধ্যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অথচ এই আন্দোলন অকাল পরিণতি লাভ করেছে ব্যক্তির একনায়কত্বে যার প্রধান অর্থই হল স্বাধীনতার উচ্ছেদ ও নির্বাণন। পরিকল্পিত সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির আপন সত্তা

বিকাশের কোন স্বযোগই নেই ; সেখানে সমষ্টির যুগকার্ঠে ব্যক্তির স্বার্থকে বলি দিতে হয়, এবং দলীয় স্বার্থ উন্নয়নের জন্ত প্রদত্ত স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের প্রকৃত আদর্শকে বিকৃত করে। সংক্ষেপে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার এইটাই আধুনিক বিকৃত রূপ। অপর দিকে পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাও ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের কোনরূপ আশ্বাস দেয় না। এখানেও দেখি দলীয় স্বার্থ জনগণের বিপুল স্বার্থকে পদদলিত করে রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করতে চায়। মানুষ দুই দিক থেকেই কোন আশ্বাস পায় না, এবং সেইজন্ত সে এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এই অসহনীয় পরিস্থিতি পরিহার করে নূতন এক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার আশ্রয় গ্রহণ করবার শুভ ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাচ্যের আধুনিক কালের বিখ্যাত বিপ্লবী ও মানবতন্ত্রী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর “New Humanism” নামক গ্রন্থে। নূতন গণতন্ত্রে তিনি সমাজ ব্যবস্থার যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাতে স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক পরিকল্পনার এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে সামগ্রিক মঙ্গল ও প্রগতির সর্বাদীন উন্নতি সাধন সম্ভবপর।

দুই

নূতন মানবতার প্রসঙ্গ আসে স্বভাবতঃই মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রবাদের সমালোচনায়। মার্ক্সবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি-জাত অসহনীয় বাস্তব অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্ত এইরূপ একটি বৈপ্লবিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। তার পূর্বে মার্ক্সবাদ কি সংক্ষেপে তার বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, মার্ক্স পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজ-বিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণগুলি ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজের সকল সংগঠনই—রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—গতিশীলতার প্রাধাত্যকে স্বীকৃতি জানায়। মার্ক্স তাঁর পূর্বসূরীদের সমাজ পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে ফাঁকা আদর্শবাদ বলে অবজ্ঞা করেছেন এবং নিজের সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে বিজ্ঞানসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে সমাজ বিবর্তনের অবশুস্তাবিতা একটি শাস্ত নিয়মের বশবর্তী যার ফলে ইতিহাসে বিভিন্ন যুগে কতকগুলি বাহু-শক্তির প্রতিক্রিয়াজনিত অবস্থা রূপান্তরের ফলে তৎপরবর্তী যুগের সমাজের কাঠামোর প্রকৃতি নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই নিয়মগুলির তাৎপর্যকে ভিত্তি করে মার্ক্স ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, “In every historic epoch the prevailing mode of economic production and exchange and the social organisation necessarily following from it, form the basis upon which is built up and from which alone can be explained the political and intellectual history of that epoch.” (Communist Manifesto—Preface to the French edition, 1888). তাই সমাজ ব্যবস্থার সকল বাঁধন অর্থনৈতিক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল ; অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থারও

পরিবর্তন অনিবার্ধ এবং বিভিন্ন যুগের নামকরণ করা হয় উৎপাদন ও বন্টন পদ্ধতির মাপকাঠিতে। মার্ক্স কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর মতে সমাজের সকল বিষয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় বিবেকবোধ, নীতিবোধ, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সব কিছুই অর্থনীতির নিয়মচালিত ও তৎপ্রভাবে বিশিষ্ট আকারপ্রাপ্ত। এক কথায় সমাজের উপরিতল (Superstructure) সূদূর অর্থ নৈতিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয়তঃ, ইতিহাসের এই অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যার দ্বারা তিনি অতীত ঘটনাবলীর দ্বন্দ্বিক বিশ্লেষণ (Dialectical Analysis) করেছেন। সকল ঘটনার আলোকে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ইতিহাস আর কিছুই নয়, কেবল শ্রেণী-সংগ্রামের কাহিনী মাত্র; এই সংগ্রামের অবসানে আমরা দেখতে পাই ঘটনাবলীর বিকাশ ও পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে একটি নতুন যুগের সূচনা। সকল সময়ই যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অল্পভূত হয় তা নয়, কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রত্যক্ষ—কিন্তু একথা সত্য যে অবিরাম শ্রেণী সংগ্রামই সমাজ বিবর্তনের প্রধান কারণ। দুটি শ্রেণীকে কেন্দ্র করে সংগ্রামের সূচনা—একদল শোষক যাদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যন্ত অর্পিত; আর একদল শোষিত, যাদের বাঁচবার অর্থ নৈতিক অধিকার ছাড়া আর কিছুই নেই। এ হেন শোষিতদের অবস্থা যখন চরমে ওঠে, তখন তারা সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা পুরাণো সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন সমাজের সূত্রপাত করে। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্গামী বন্টনপদ্ধতি ঐ ব্যবস্থার সর্বনাশের মূল কারণ। পূঁজিবাদী শ্রেণীর বিপুল অর্থসঞ্চয়ের ফলে সমাজে আর্থিক বৈষম্য দেখা দিতে বাধ্য; তখন সারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও ছোট ব্যবসাদাররা পর্যন্ত পূঁজিবাদীদের এই আর্থিক শোষণের ফলে অবস্থা বিপর্যয়ে অমিক-মজুরশ্রেণীর সমপর্যায়ে আসে। সমাজে তখন দুটি শ্রেণী সৃষ্টি হয়, এবং বাহ্যিক অবস্থার আনুকূল্যে মধ্যবিত্ত ও অমিক শ্রেণীর মিলিত সশস্ত্র বিদ্রোহ সাফল্য লাভ করে।

চতুর্থতঃ, শোষক-শোষিতের সম্পর্ক নির্ধারণে মার্ক্স উদ্ভূত মূল্যবাদের (Theory of Surplus Value) আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এই মতের দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, অমিক বা মজুর যত সময় যত পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যমূল্যের সবটাই তাকে দেওয়া হয় না, সামান্য কিছু মজুরী হিসাবে তার জীবন ধারণের জগ্ন দেওয়া হয়, এবং বাকী সবটা শোষক শ্রেণী আত্মসাৎ করে। তাঁর মতে সভ্যতার আদি হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মজুরী দেওয়ার এই বৈষম্যই শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্ব তীব্রতর করে রেখেছে। সংক্ষেপে এই হল মার্ক্সবাদের প্রধান দিকগুলির ব্যাখ্যা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদ প্রয়োগ কতখানি সম্ভব এবং দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সবাদ কি মানুষের মুক্তির পথনির্দেশক? প্রথমটি সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করে বেশ ভাল ভাবেই বলা যায় মার্ক্সবাদ মূলতঃ যাই থাকুক না কেন, সমাজতন্ত্রবাদী দেশে প্রয়োগের ফলে তার বাস্তব বিকৃতি ঘটেছে। এই বিকৃতির জগ্ন মার্ক্সবাদ অনেকখানি দায়ী। স্বয়ং লেনিন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে মার্ক্স বিপ্লবোত্তর

সমাজে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেন নি। ধনতন্ত্রের অন্তর্গামী উৎপাদন পদ্ধতি পরিণামে সমাজতন্ত্রের পথ আপনিই প্রশস্ত করবে, এটাই মাক্সের অর্থনৈতিক ইতিহাস ব্যাখ্যার মূল অভিপ্রায় ছিল। ভাবী সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন ব্যবস্থা কি রকম হবে সে প্রশ্নকে মাক্স রঙীন কল্পনা প্রসূত ফাঁকা আদর্শের মত মনে করতেন।

ভাবী সমাজের রাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্বন্ধেও মাক্স কোন পছন্দ নির্দেশ করেন নি। তিনি সর্বস্বত্বের একনায়কত্বের প্রভাব স্বীকার করেছেন সত্য, কিন্তু হতশক্তি বৃজ্জোয়াদের প্রতিরোধ দমন কল্পেই তার প্রতিষ্ঠা—এইটুকুই বলেছেন মাত্র। তৎপরবর্তী সমাজ ব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র কি আকারে গঠিত হবে সে সম্বন্ধে তিনি নীরব। মানুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক কি রকম হবে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন করবে এবং প্রত্যেকে প্রয়োজনানুসারে উৎপাদনের ফল ভোগ করবে। এর বাস্তব রূপায়ণ স্বভাবতঃই পরিণামে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর এই মতবাদকে পরিবর্তন করে ষ্ট্যালিন বলেছেন, প্রত্যেকে নিজের ক্ষমতা অনুসারে উৎপাদন করবে এবং প্রত্যেকে নিজের কর্মের গুণানুসারে তার ফল ভোগ করবে। তখনও ঠিক নিশ্চিত হতে পারা যায় না, কারণ কর্মের গুণ বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্রের হাতে যুক্তিবাদী মানুষের হাতে নয়, রাষ্ট্র বা বলবে তাই মেনে নিতে হবে। এ অবস্থায় একনায়কত্বকে সমাজতন্ত্রী দেশে উদ্দেশ্য (End) হিসাবে দেখা হয়েছে, উপায় (means) হিসাবে নয়। এ সুযোগে ক্ষমতা দখলই ঐ রাষ্ট্রে সব চেয়ে বড় কথা, জনসাধারণের স্বাধীনতার মূল্য সেখানে খুবই কম; এবং ব্যাপক বলপ্রয়োগের দ্বারা সেখানে মানুষের মনে অবিশ্বাস ও আশংকা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, মাক্স অর্থনৈতিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে সমাজ ব্যবস্থার যান্ত্রিক রূপান্তরের যে শাস্ত্র নিয়মটি আবিষ্কার করেছেন তাকে তিনি মানুষের থেকে বেশী মূল্য আরোপ করেছেন। “The socialist society was not to be created by man; it was to result automatically and inevitably from the operation of the forces of production; it was to be a necessary product of historical development.” (M. N. Roy—New Humanism) সমাজ বিবর্তনের পথে মানুষের সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রতি কোনরূপ মূল্য আরোপ না করার ফলে তাঁর মতবাদেরও মূল্য স্বভাবতঃই অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

তৃতীয়তঃ, মাক্সের মতে অর্থনৈতিক শক্তিই পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজ বিবর্তনের একমাত্র কারণ। কতখানি সাহসের ওপর ভর করে মাক্স এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন জানি না, তবে একথাও সত্য যে সমাজ বিবর্তনের পথে জাতিগত বৈশিষ্ট্য, ধর্মীয় সংস্কার, দেশপ্রেম, অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের প্রবল ক্ষমতা, ঐতিহ্য, আচার-রীতি-নীতি সবকিছুই মানব ইতিহাসের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

চতুর্থতঃ, মাক্স বলেছেন যে শ্রেণীসংগ্রামের অবসানে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রবর্তনের ফলে

আর্থিক অসাম্য দূর হবে ও পরিশেষে রাষ্ট্রের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। পরবর্তীকালে লেনিন এই মতবাদের পরিবর্তন করে বলেছিলেন রাষ্ট্রের অল্পপস্থিতি ব্যক্তি স্বাধীনতার চরম প্রকাশই ইঙ্গিত করে যার অকাল পরিণাম ঘটে বিশ্বজ্বলার মধ্যে। স্বতরাং রাষ্ট্রকে পরিচালনা করার জন্ত একটি শাসক-সংস্থা থাকবে; অনেকটা এর দ্বারা শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব পরোক্ষে স্বীকার করা হয়েছে।

মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ যে তিনি উদ্ভূত মূল্যের আত্মসাৎ করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার ফলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাতীয়করণ অবশ্যস্বাভাবী এবং শিল্প ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অটুট থাকবে। কিন্তু উদ্ভূত মূল্য না থাকার জন্ত সমাজবাদী দেশে পর্যন্ত শিল্পোন্নতি সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়তঃ, সকল ক্ষমতাই যখন রাষ্ট্রের হাতে তখন যে কোন মুহূর্তে রাষ্ট্র পূঁজিবাদের রূপ গ্রহণ করতে পারে—যে অবস্থাকে মানবেন্দ্র নাথ রায় বলেছেন, “State Capitalism.”

এইবার মার্ক্সের বিপ্লব সম্বন্ধে মতবাদ আলোচনা করে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করব। সমাজ বিবর্তনের কারণ হিসাবে মার্ক্স অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদকে (Economic Determinism) স্বাগত জানিয়েছেন আবার একথাও বলেছেন, সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা যখন চরমে পৌঁছে তখন সর্বহারাশ্রেণী সশস্ত্র বিপ্লবে প্রবৃত্ত হয় ও ক্ষমতা দখল করে; তাঁর মতবাদের মধ্যে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কোন গুরুত্ব দেন নি; বরং এ কথাই বলেছেন রাষ্ট্রের মত কালক্রমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিলুপ্ত হবে। কেমন করে তা সম্ভব? অর্থনৈতিক দিক ছাড়াও মানুষের স্বকোমল চিন্তাবৃত্তি উন্নয়নের আর একটি দিক আমরা দেখতে পাই—তা সাংস্কৃতিক। “সমাজতন্ত্র” মতবাদটি মধ্যবিত্ত কৃষ্টিশীল ব্যক্তিদেরই সৃষ্টি এবং সংস্কৃতির দিক থেকে অল্পমত সর্বহারাদের তারাই নিজ মতবাদ দ্বারা পরিচালিত করে; এক কথায় বিপ্লবের সাংস্কৃতিক হাতিয়ার তারাই সৃষ্টি করে। মার্ক্সের এই অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় লেনিন কর্তৃক বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ পুনর্গঠনের সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রবল গুরুত্ব দানের মধ্যে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্স বলেছেন যে মন বা আদর্শেরও রূপান্তর হয় দ্বন্দ্বিক ভাবে; অর্থাৎ সমাজ যখন স্থিতিশীল নয়, সকল জড়বস্তুই গতিশীল, তখন পরিবর্তনের মুখে পুরাতন আদর্শের সঙ্গে নতুন আদর্শের সংঘাত হয় এবং পুরাতনের পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তখন প্রবলতর নতুন শক্তির সঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু পুরাতনের এক সমন্বয় (Synthesis) ঘটে। এই মতবাদের মধ্যে আদর্শের বা ধারণার দ্বন্দ্বিক ভাবে রূপান্তর না হয়ে গতিশীলতার পথেই যে এর পরিণতি (not dialectics, but dynamics of ideas), সে কথা মার্ক্স স্বীকার করেন নি। তারপর Determinism দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে মানুষের কল্পিত সাম্রাজ্য একটি ফাঁকা বুলিমাত্র। এখানে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিপ্লব সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের ধারণা এই যে, মানুষ যুক্তিবাদী এবং যুক্তির বিকাশ হয় তখনই যখন মানুষ

তার পক্ষে “যেটা প্রয়োজনীয় এবং সেই হেতু সম্ভব” এইটুকু অল্পভব করে থাকে। বাস্তবিক বস্তুকে লাভ করার প্রচেষ্টা—এই মতকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ভাববাদ বা কল্পনা (Romanticism); ভাববাদের সঙ্গে যুক্তির সামঞ্জস্য থাকলে এবং তা যদি সর্বজনগ্রাহ্য হয়, তবেই সমাজে বিপ্লব দেখা দেয়। তাই মানবেন্দ্রনাথের মতে, “Romanticism tempered with reason, and rationalism enlivened by the romantic spirit of adventure, pave the road to successful revolutions.” (M. N. Roy—Reason, Romanticism & Revolution, Volume I)

তিন

মানুষ যুক্তিবাদী বলে সমাজে তার ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বাগ্রে স্বীকার্য; কারণ স্বাধীনতা ব্যতীত সে আপনার যুক্তিবাদী ক্ষমতাকে উপযুক্তরূপে বিকশিত করতে পারে না, এবং যুক্তি ছাড়া তার জ্ঞানার্জনের পরিধিও সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। নতুন মানবতার দার্শনিক ভিত্তি এই যুক্তিবাদী নীতিবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির জগৎ থেকেই মানুষের উৎপত্তি এবং তার বর্তমান রূপ ও আকার প্রাগীতাত্ত্বিক বিবর্তনের দীর্ঘ ধারার প্রতি ইঙ্গিত করে। তার মন, আবেগ, ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রভৃতি নিয়মচালিত প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত, স্তত্রাং ঐগুলির বিকাশও বৈজ্ঞানিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের যুক্তিবোধ তার অন্তর্লীন বা সহজাত নীতিবোধকে সংরক্ষিত ও শানিত করে তখন সমাজের মঙ্গল বিধানের নৈতিক কর্তব্য পালনেই দেখা দেয় যুক্তির সার্থকতা। আর মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সকল সূত্রগুলি মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। একশ বছর আগে জীবজগৎ সম্বন্ধে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করেছিল, আজ তার থেকে নিশ্চয়ই সে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, কারণ মানুষের জীবন এবং পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানার্বেষণ তার বহুবিধ সমস্তা সমাধান করেছে। বিংশ শতাব্দীর একনায়কত্বে (যা যুক্তিবাদী নয়) তার বিশ্বাস নেই,—তাই তার স্বাধীনতাকামী মন এক নতুন গণতন্ত্রের সন্ধানে খোঁজে যেখানে যুক্তিশীল সংগঠন ব্যবস্থার আড়ালে রয়েছে এক অভূতপূর্ব নৈতিক আবেদন। তার কারণ এই অন্তর্লীন নীতিবোধই মানুষকে মানুষের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত করে—“Morality emanates from the rational desire for harmonious and mutually beneficial social relations.” (M. N. Roy—New Humanism)

দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বমানবতার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার অখণ্ড বিকাশের মূল মন্ত্র নিহিত আছে। নতুন মানবতাবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার যে স্বযোগ দেওয়া হবে, তার ফলে মানুষ তার বিকাশের পথে আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপরের অভিজ্ঞতা একত্রে সমন্বিত করবে। তখন তার জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা জাতি বা শ্রেণীর স্বার্থে নিয়োজিত হবে না;

পরিণামে এই অখণ্ড জ্ঞানের প্রাচুর্য তাকে মুক্তির পথ দেখাবে। বিশ্বমানবতা তাই জাতি ও শ্রেণী নিরপেক্ষ—সেখানে মানুষ, তার স্বাধীনতা ও তার বিকাশই সব চেয়ে বড় কথা। “New Humanism is always cosmopolitan. A cosmopolitan commonwealth of spiritually free men will not be limited by the boundaries of national states,—capitalist, fascist, socialist, communist, or of any other Kind,—which will gradually disappear under the impact of the twentieth century Renaissance of Man.” (M. N. Roy—Reason, Romanticism and Revolution—Volume II)

চার

বার্টাণ্ড রাসেলের মতে (Philosophy and Politics দ্রষ্টব্য) রাষ্ট্রের শাসনতাত্ত্বিক কাঠামোর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একটি বিশিষ্ট মতবাদকে কেন্দ্র করে। নতুন গণতন্ত্র তেমনি নতুন মানবতাবাদকে আশ্রয় করে গড়ে উঠবে। নতুন গণতন্ত্রের বাস্তব রূপায়ন কেমন করে সম্ভব তার দিক নির্দেশ করা আবশ্যিক; এই শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি ও তার স্বাধীন সত্তার যথোপযুক্ত বিকাশই মূল লক্ষ্য। দেশের জনগণই—স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন দল নয়—শাসনযন্ত্রকে পরিচালিত করবে। প্রত্যেক নির্বাচনমণ্ডলীস্থিত জনসংস্থার (People's Committee) দ্বারা রাষ্ট্রের কুণ্ট মর্ষাদাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে তারা নির্বাচিত করবে; এবং জনসংস্থার নির্বাচিত সদস্যরা আবার অত্র সদস্যদের নির্বাচন করার অধিকার লাভ করবে। এই জনসংস্থাই হবে জনগণের শাসনতন্ত্রের একমাত্র রাজনৈতিক শিক্ষার মূল উৎস। এবং কুণ্টশীল লোকেরা রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা লাভ করবেন। বলা বাহুল্য প্লেটোর Republic-এ বর্ণিত “Government of the wise and best”—এই মতের যুক্তিযুক্ত পরিণতি লাভ করেছে নতুন মানবতাবাদের শাসনতাত্ত্বিক পরিচালন ব্যাপারে। এখানে কুণ্টশীল, স্বাধীন যুক্তিবাদী লোকেরা যে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্ণধার হবে এই মত মেনে নেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের শাসন কার্যের প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করবে উচ্চ শিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সম্বায়ে গঠিত একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State)। জনসাধারণের হিতসাধন ও তাদের স্বাধীনতার পথে কোন বাধা সৃষ্টি না হয়, সেইদিকে তাঁদের লক্ষ্য থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে নতুন সমাজে শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণের সম্বন্ধ শোষণ-শোষিত বা শাসক-শাষিতের ভিত্তিতে গঠিত হবে না, হবে সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ সহযোগিতার ভিত্তিতে।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা রচনা করা হবে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রজ্ঞাদীপ্ত দার্শনিক হেল্ভেগাসের মত মানবেন্দ্রনাথও মনে করতেন শিক্ষাই যুক্তিবাদী মানুষকে সংপথে পরিচালিত করে ও সাফল্যের সন্ধান দেয়। মানুষের প্রগতি ও উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। নাগরিক ও রাজনৈতিক শিক্ষাদানের মূলকেন্দ্রে

থাকবে জন-সংস্থা, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ রাষ্ট্রের সকল গঠনমূলক ব্যাপারে সহযোগিতা করবে।

তৃতীয়তঃ, নতুন সমাজ ব্যবস্থায় কি ভাবে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সমস্যার সমাধান করা যায়, তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুনাফার জঘ্ন উৎপাদন ব্যবস্থা রহিত করা ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা—এ দুয়েরই বিরুদ্ধে নতুন অর্থনীতির প্রয়োগ করতে হবে। নতুন অর্থনীতির ভিত্তি রচিত হবে ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, সমবায় পদ্ধতির (co-operative system) মাধ্যমে। উৎপাদক ও ভোগকারীর সম্পর্ক, সমবায় সংগঠন সৃষ্টির মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। এইরূপ সমবায় অর্থনীতিতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রসমূহের সদ্যবহারে শিল্পের উন্নতি সম্ভব হবে এবং যাতে ধন বণ্টনের অসাম্য না হয়, তার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হবে।

চতুর্থতঃ নতুন মানবতাবাদের সাংস্কৃতিক ভিত্তি গঠিত হবে সকল দার্শনিক মতবাদকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানের আলোকে বিচার করার মাধ্যমে ও সকল সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ব্যাপারে। বিজ্ঞানই মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করে ও তার প্রগতির পথ প্রশস্ত করে। শিক্ষিত জনসাধারণ অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের মধ্যে মানবতাবাদের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা করে তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, যৌক্তিক ধর্মের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করে তুলবে—এইভাবে জাতি নিরপেক্ষ মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। কেন না অযৌক্তিকতা ও ধর্মোত্তমতা প্রকাশ পায় গৌড়া জাতীয়তাবাদী স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে; যুক্তিবাদী মানুষ সকল ব্যক্তির স্বাধীন সত্তা বিকাশে বিশ্বাসী, সেইজন্যই সে ব্যক্তি বা মানুষকে আপন অভিজ্ঞতার দ্বারা আত্মস্থ করতে চায়। মানবতাবাদ মানুষকে সেইরূপ স্বযোগ দান করবে।

পাঁচ

“নতুন মানবতাবাদ” ছাড়াও আমরা হয়ত পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের নজীর তুলে ঐ রূপ শাসনতন্ত্রের সার্থকতা দেখাতে পারি। তথাপি এ কথা স্বীকার্য যে পার্লামেন্টারী শাসনতন্ত্র মানুষকে পূর্ণ বিকাশের কোন স্বযোগ দেয় নি। ত্রায়াণ্ডায় বিচারহীন জননেতার দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্র বা ব্যক্তি স্বাধীনতারক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অবলম্বন করে না। জনগণ-প্রেরিত প্রতিনিধি পার্লামেন্টে সকল সময়ই তার স্বার্থরক্ষার উপযুক্ত মুখপাত্র হবে, তারই বা নিশ্চয়তা কি? অনেক সময় দেখা যায় যে পার্লামেন্টে প্রেরিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। আবার এ রকমও দেখা যায় সংখ্যা গরিষ্ঠ দল ক্ষমতা দখল করে শ্রেণীস্বার্থে জনসাধারণের সকল স্বযোগ স্ববিধা লাভ করার পথ বন্ধ করে রেখেছে। এক নায়কত্ব বা পার্লামেন্টারী শাসন কোনটাই মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারছে না। তাই নতুন গণতন্ত্র মানুষের মনে আশা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। অবশ্য এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কতকগুলি সমস্যা দেখা দেয় :

(১) বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এ ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয় ; পৃথিবীর সর্বত্রই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শ্রেণীর হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য জাতীয়তাবাদী গণজাগরণ দেখা দিয়েছে। সমাজ বিবর্তনের দীর্ঘ ধারার পথে এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

(২) নতুন সমাজব্যবস্থার রাষ্ট্র কাঠামো প্রায় সবটা সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন সর্বাগ্রে ; আবার শিক্ষাবিস্তার সময় সাপেক্ষ। সুতরাং এর প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে।

(৩) ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের ফলে নতুন সমাজে জনসাধারণের মানসিক উন্নতিতে সংস্কৃতি বোধের মান নির্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার ; তথাপি এ কথা ঠিক যে মানুষের দীর্ঘদিনব্যাপী সভ্যতার চিরন্তন মূল্যবোধই সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম মূল্য দান করবে।

(৪) মানবতাবাদের সহজ দিকগুলি জনসাধারণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তোলা আর এক সমস্যা ; কিন্তু শিক্ষাবিস্তার ও মানুষের অন্তর্লীন সৃষ্টি ক্ষমতায় আস্থা—এ দুটি উপায়ই তার প্রকৃত সমাধান।

আশাবাদী মানুষ নতুন সমাজগঠনের স্বপ্ন দেখে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনন্তকাল ধরে সে স্বাধীনতা লাভ করার জন্য সংগ্রাম করে এসেছে ; এক কথায় তার যুগব্যাপী জীবন সংগ্রাম প্রত্যক্ষ স্বাধীনতা লাভ করার জন্যই। কিন্তু কি ফিউডাল, কি ধনতন্ত্র, কি সমাজতন্ত্র—প্রত্যেক সমাজেই তাকে স্বাধীনতার চরম মূল্য দিতে হয়েছে স্বাধীনতার বিসর্জন দিয়ে। কোন সমাজ ব্যবস্থাই যখন চরম বা স্থিতিশীল নয়, তখন তাকে একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে ধরার কোন অর্থ হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজের লোকেরা সাম্যবাদের উৎপত্তি হতে পারে এ কথা ভেবে দেখে নি, কিন্তু ধনতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ সংঘাত আর এক নতুন সমাজের সূচনা করেছে, আবার স্বাধীনতা বিধবংসী একনায়কত্ব স্বাধীন মানুষকে নতুন সমাজ গঠনের আশা দেয়। এই মানবতাবাদী সমাজব্যবস্থাও হয়ত বিবর্তনের পথে অল্প এক সমাজের রূপ লাভ করতে পারে। তবে নতুন সমাজের যুক্তিযুক্ত দিকগুলি আলোচনা করলে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থাই স্বাধীনতাকামী মানুষের আশা ভরসার উৎসস্থল হিসাবে মনে হতে পারে।

বিতাস্তই সন্ধ্যার গল্প

(অনুবাদ গল্প)

অরণ্যাত দাশগুপ্ত—পঞ্চম বর্ষ, কলা

অজস্র গাছপালার সংমিশ্রণে একটি ঝোপ, পার্কের রেলিং তাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। তার সামনেই একটা বেঞ্চে নর্মান গোর্টস্‌বি বসে পড়ল। অনতিদূরে অপ্রশস্ত রাস্তা, বিভিন্ন যানের সমারোহ। তারই ফাঁকে রাস্তার টুকরো টুকরো যেসব ছবি দেখা যেত, অন্ধকার তা মুছে দিয়েছে।

সময়টা মার্চ মাসের সন্ধ্যা। অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমেছে। আকাশে অস্পষ্ট চাঁদ, অদূরে অসংখ্য ল্যাম্পপোস্টের শীর্ষে আলো জ্বলছে, নইলে হয়ত আরো নিবিড় মনে হত। রাস্তাঘাটে লোকচলাচল স্বল্পতর; অথচ, কী আশ্চর্য, এখনও এই পার্কে বহুজন ঘোরাফেরা করছে, নয়ত বসে আছে নিভৃত, অন্ধকারে শুধু তাদের অস্তিত্বই টের পাওয়া যায়।

দৃশ্যটা নর্মান গোর্টস্‌বির ভালোলাগল। তার মনের সঙ্গে এর এক আশ্চর্য সঙ্গতি ছিল। জীবনযুদ্ধে যারা হেরে যায় অন্ধকারই তাদের আশ্রয়। দিনের আলোয় তারা পা ঢাকা দিয়ে থাকে, সন্ধ্যা হলেই নির্জন আন্তানা খোঁজে। অন্ধকার ওদের পরাজিত রূপটিকে আড়াল করে দেয়।

পেছনে রেলিং পার হলেই অগ্ন এক জগৎ—আলো-আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মেলা। হৈ-হল্লা ভেসে আসছে, আলো জ্বলছে নানা রঙের। ওরা চলতে ফিরতে সংগ্রাম করে, হেরে যায় না, হার স্বীকার করে না। নর্মান গোর্টস্‌বির মনে অনেক ভাবনা ভিড় করে এল। টাকা-পয়সার অভাব তার নেই, ইচ্ছে করলেই ওই আলোর জগতে সে স্ফূর্তি লুটতে পারত অন্যায়সে। তবু নিজেকে তার পরাজিত মনে হচ্ছিল। সত্যিই তার পরাজয় ঘটেছে, ঘটেছে অগ্নতর ক্ষেত্রে। মুহূর্তের জগ্গে তার মনে হচ্ছিল তার স্বপ্ন বুঝি ফুরিয়ে গেছে। সন্ধ্যায় নিভৃত পার্কে ওই সব ব্যর্থ মানুষের মিছিল দেখতে তার কেমন এক নিঃশ্বর ভৃষ্টি হচ্ছিল।

তার ঠিক পাশেই বসে ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। ওই মুখের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ থাকে না তাঁর বঁচে থাকার অর্থ আজ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে, প্রতিপক্ষের তুলনায় আজ তিনি একান্তই নিঃশ্ব। পরণের পোষাক খুব খেলো নয়, অন্তত আধো-অন্ধকারে তাতে কাজ চলে যায়। কিন্তু মুখের দিকে তাকাও। মনে হবে ওই মুখের প্রতি সমবেদনায় কারো চোখের জল ঝরে নি, কোনো মনে এতটুকু ক্ষোভ জাগে নি। একা, সম্পূর্ণ একা। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, বোধ হয় বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। সেখানে হয়ত তাঁকে প্রতি মুহূর্তে

অপমান সহিতে হয় ; হয়ত তাঁর বাড়িতে দ্বিতীয় কেউ নেই, শুধু সপ্তাহান্তে একবার পাওনা শোধ করে দিলেই তাঁর সম্পর্ক চূকে যায় পৃথিবীর সঙ্গে। গোর্টস্‌বি নিজের মনে ভাবতে লাগল ; রাতের অন্ধকারে মূর্তিটা মিলিয়ে গেছে ততক্ষণে।

মিনিটখানেকও বোধ হয় কাটে নি, একজন উদ্ভ্রান্ত যুবক এসে বসল তাঁর আসনে। বসল বলা যায় না, নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দিল। সাজসজ্জায় চমক আছে, কিন্তু মুখের দিকে তাকাতেই আগের ভ্রলোকটির কথা মনে পড়ল গোর্টস্‌বির। জিজ্ঞেস করলে, ‘আপনাকে খুব খুশী দেখাচ্ছে না তো, ব্যাপার কী?’

যুবকটি এমন প্রশ্নই আশা করছিল। গোর্টস্‌বির দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, ‘এরকম বিপদে পড়লে আপনিও খুশী হতেন মনে হয় না। মূর্খের মত কাজ করলে যা হয়।’ কণ্ঠে তার স্ফোভের আভাস।

‘অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে’, গোর্টস্‌বি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললে।

‘আজ বিকেলেই এখানে এসেছি। যে হোটেলে বরাবর থাকি, গিয়ে দেখি তার চিহ্নমাত্র নেই, বদলে একটা সিনেমাহাউস শোভা পাচ্ছে। ট্যান্ড্রাইভারের কথামত আর একটা হোটেলে উঠলাম। দু’একজনের কাছে চিঠিও লিখলাম হোটেলের ঠিকানা দিয়ে, তারপর বাইরে বেরোলাম কিছু সাবান কিনবার মানসে। আনতে ভুলে গিয়েছিলাম, হোটেলের সাবান ব্যবহারে আমার আবার ঘেমা লাগে। সাবান কিনে একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়লাম, ‘বার’-এ ঢুকে গলা ভিজিয়ে নিলাম। ফিরতে যাব খেয়াল হল হোটেলটার নাম এমন কী রাস্তাটার নামও মনে করতে পারছি। লগুনে আমার বন্ধুবান্ধব নেই, ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি। আপনি বলবেন, যাদের চিঠি লিখেছি তাদের কাছে ‘তার’ করে দিলেই হয়। কিন্তু চিঠি তো আগামীকালের আগে তাদের কাছে পৌঁছচ্ছে না। এদিকে মাত্র এক শিলিং নিয়ে বেরিয়েছিলাম, সাবান কিনতে আর গলা ভেজাতে তার সবটাই প্রায় উড়ে গেছে। দু’পেন্স মাত্র অবশিষ্ট আছে, ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথায় রাত কাটাতে হুঁস পাচ্ছি নে।’

যুবকটি থামল। দীর্ঘ বক্তৃতার পর একটুখানি বিশ্রাম। গোর্টস্‌বির মুখেও কথা নেই। তা লক্ষ্য করে যুবকটি হতাশ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, ‘বানিয়ে বলছি ভাবছেন তো?’

‘মোটাই তা নয়,’ গোর্টস্‌বি একটু ভেবে বলল, ‘এরকম বিপাকে আমিও পড়েছিলাম মনে পড়ে। বিদেশে। আমার সঙ্গে একটি বন্ধুও ছিল, হোটেলটার নাম একই সঙ্গে ভুলে গেল। শেষে আবছা আবছা মনে পড়ল হোটেলটা কোন হ্রদের দক্ষিণ দিকে। সৌভাগ্যক্রমে হ্রদের নামটাও মনে এল। তারপর সূত্র ধরে ধরে হোটেলটাকে খুঁজে বার করলাম।’

ছেলেটির চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, আধো-অন্ধকারেও গোর্টস্‌বির চোখ এড়াল না। খুশির সঙ্গে বললে, ‘বিদেশ হলে ভাবতুম না। ব্রিটিশ কন্সালের সঙ্গে দেখা করলেই সমস্ত

মিটে যেত। নিজের দেশেই যত বায়েলা। যদি কোন ভদ্রলোক বিশ্বাস করে সামান্য ধার দিতে রাজী হন, তা হলে হয়ত লণ্ডনের রাস্তায় রাত কাটাতে হবে না। আপনি আমার গল্প অবিশ্বাস করেন নি, সেজগে ধন্যবাদ।’

ইঙ্গিতটা গোর্টস্‌বি ধরতে পারল। আশ্বে বলল, ‘ঠিক আছে। কিন্তু কেনা সাবানটা দেখাতে পারছেন না—আপনার গল্পের বহুনিতে এইটুকুই গোলমালে ঠেকছে।’

সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি সামনে ঝুঁকে পড়ল, ছুঁপকেট হাতড়াল অনেকক্ষণ, তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, ‘নিশ্চয়ই হারিয়ে গেছে।’

গোর্টস্‌বি ঈষৎ হাসল, ‘হোটেল হারালো, সাবানও হারালো—এবং একই সন্ধ্যায়। মনে হচ্ছে ইচ্ছে করেই হারিয়েছেন।’ মন্তব্যের শেষটুকু আর শুনল না, ছেলেটি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আগাগোড়া মুখটি নীচু করে।

গোর্টস্‌বি আপনমনে বলল, ‘সাবানটা দেখাতে পারলেই আর কিছু বলার থাকত না। একটু বুদ্ধির ভুলে ছেলেটি কিছু প্রাপ্তির স্বযোগ থেকে বঞ্চিত হল। খেয়াল করে যদি একটিও সাবান সঙ্গে রাখত, তা হলে ওকে জিনিয়স বলতে বাধত না। In this particular line genius certainly consists of an infinite capacity for taking precautions.

উঠতে যাবে, বাধা পড়ল। নীচের দিকে তাকাতেই গোর্টস্‌বির চলার শক্তি হারিয়ে গেল। অলক্ষ্যে বেঞ্চের নীচে প্যাকেটের মত কী একটা পড়ে আছে। নতুন কেনা একখানি সাবান রঙীন কাগজে মোড়া। খুব সম্ভব বাপু করে বসবার সময় ছেলেটির পকেট থেকে ওটা পড়ে গিয়েছিল। গোর্টস্‌বি সেটা নিজহাতে তুলে নিল। যেতে যেতে চোখ রাখল চারিদিকে, যদি সন্ধান মেলে। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে গোর্টস্‌বি বাড়ি ফিরতে যাবে, এমন সময় তার নজরে পড়ল অদূরে রাস্তার মোড়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কোনদিকে যাবে ইতস্ততঃ করছে। গোর্টস্‌বিকে আসতে দেখে ওর চোখে যুদ্ধ ঘনিয়ে এল।

সাবানের মোড়কটা এগিয়ে দিয়ে গোর্টস্‌বি অল্পতপ্ত কণ্ঠে বলল, ‘সিটের নীচেই পড়ে ছিল, আপনি চলে যাবার পর খুঁজে পাই। আমার সন্দেহ মিটে গেছে। অবিশ্বাস করেছিলাম, মাপ করবেন; যদিও অবিশ্বাস না করে তখন উপায় ছিল না। যা হোক, সাবানটা যখন পাওয়া গেছে, এইটুকু ভদ্রতা করবার স্বযোগ দিন। এই নিন, আশা করি এক পাউণ্ডেই আপনার কাজ চলে যাবে।’ তারপর একটি কার্ড ওর হাতে দিয়ে বললে, ‘আমার ঠিকানা। স্ববিধেমনে একদিন ফেরত দিয়ে আসবেন। এই ধরুন আপনার সাবান, আর যেন হারাবেন না, ওটা আপনার সত্যিকারের বন্ধু।’

‘আমার সৌভাগ্য এটা পাওয়া গেছে’ সক্রতপ্ত কণ্ঠে বলল ছেলেটি, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে নাইটস্‌ট্রিজের পথ ধরল।

‘বেচারি, একটুর জন্তে বেঁচে গেল।’ গোর্টস্‌বি ভাবল, বিচার না করে একটা কিছু ভেবে নেওয়া অসঙ্গত। আমার ভুল হয়েছিল।

গোর্টস্‌বি বাড়ির দিকে ফিরল। আবার সেই পার্ক, একটু আগে যেখানে ছোট্ট একটা নাটকের অভিনয় হয়ে গেল। কে একজন সেই বেঞ্চটার চারিদিক চেষ্টা বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখল, সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

‘কিছু হারালো না কী আপনার?’ গোর্টস্‌বি প্রশ্ন করল।

—‘হ্যাঁ, একখানি সাবান।’*

কলেজ স্ট্রীট

শিশিরকুমার দাশ—প্রাক্তন ছাত্র

এ পথে আমি যে গেছি বারবার। তবু এই চেনাপথে কখনও কখনও একটা অনির্বাচ্য ভয় ঘিরে আসে। এই ট্রামবাসের ভিড়ে, লোকজনের চলফেরার আড়ালে সেই ভয়ের সাড়া পাই। কয়েকটা নিম্ন দেবদারুর ডালপাতার অন্ধকারে সেই অনেক চেনা বিশ্বয় আর ভয়ের অস্থির পদচারণা। মাঝে মাঝে কোন এক অবসন্ন বিকেলের দুর্বল মুহূর্তে একা একা এই পথে চলতে গিয়ে ভীষণ যন্ত্রণায় নিরুদ্ভব্যথায় গুমরে মরি। ইতিহাসের ক্লাস্ত পথিকেরা যখন হেঁটে যায় তখন সামনে ভীড় করে দাঁড়ায় ইতিহাসের জিজ্ঞাসা। তাই এ পথে হাঁটতে ভয়। তবু হাঁটি।

কলেজ স্ট্রিটে ঢুকব সেদিন। পথে রাধাকান্ত দেবের লাঠিয়ালরা লাঠি উচিয়ে ধরল: মাত্ যাও। কেন যাবোনা। ছি ছি, হিন্দুর ছেলে মড়া কাটবে, জাতধর্ম সব ভাসিয়ে, সেখানে কেন যাবে। কলেজ স্ট্রিটে ঢোকায় পথে প্রথম নিবেধ। তবুও আজকের রোদচকিত ছুপ্ত-বেলায় বারবার চমকে উঠি। আর মেডিক্যাল কলেজের লাল ইঁটে ইতিহাসের প্রথম মূক্তির যন্ত্রণায় সেই নিবেধ কোথায় ভেঙে ভেসে যায়। তার সামনে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়াই। বাইরের দরজায় ফেরিওয়ালার হাঁক ডাক হঠাৎ শুরু হয়ে যায়, তার মাঝখান দিয়ে ঢোকে জুড়িগাড়ি, দামী মসলিনে দরজায় পর্দা, কোচম্যান হাঁকছে, সামনেওয়ালার খবরদার। তার পরেই আসে একটা পালকী, পেছনে পেছনে ক্লাস্ত তিনটে ছেলে ছুটতে ছুটতে আসছে, আর তোতা পাখির মত ঢেঁচিয়ে চলছে, Have pity on me.

আর করুণার বর্ণাধারা ক্ষরিত হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের ক্লাস্ত পথিক আমি ওখানে যেতে পারিনি। পাশের লোকটি যে সম্মুখে বলে দিয়েছে ‘ত’ গেলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ, আর

* ‘সাকি’ লিখিত ‘Dusk’ গল্পটির ঐষণ্য পরিবর্তিত ও পরিবর্তিত বঙ্গানুবাদ।

এই যে ডেভিড হেয়ার। সংকোচ হয় ভীষণ, ডেভিড হেয়ার হয়ত সম্মেহে ধমক দেবেন। আর প্রিন্স। ভাবতেও ভয়।

কিন্তু ছুটে যাবো কোথায়। কেন, গোলদিঘির মাঠে। ওখানে কারা জটলা পাকাচ্ছে। যাওয়াই যাক ওদের কাছে। পরণে ওদের চোগাচাপকান। এক জনের নিখুঁত বিলিতি স্মার্ট আর একজনের ধুতি পাঞ্জাবি। তুমুল তর্ক হচ্ছে বোধ হয়। কান পেতে শোনাই যাক না। ধুতি চাদর পরিহিত বাঙালি বাবু বলছেন : মধু, তুমি রিচার্ডসনের সিলেকশান পড়লে ?

উল্লসিত হয়ে উঠল ছেলেটা : I wish I had been the author of it. আবার একটু খেমেই আর একজনের দিকে চেয়ে, How should I like to see you write my life, if I happen to be a great poet, which, I am almost sure, I shall be if I can go to England. রাজনারায়ণ, এত চূপচাপ কেন ?

সভয়ে দাঁড়াই একপাশে। রাজনারায়ণ, গৌরদাস, ভূদেব আর মধুসূদন। কাছে গেলেই মধুসূদন একবার হাতের বইগুলির দিকে চোখ বোলাবেন। তার পরই বলবেন হয়ত : কী পড়ছ আজকাল। পড়েছো হোমার ভার্জিল টাসো মিল্টন বায়রন ? একটাও পড়েছি বলতে ভয় হয়, পড়িনি বলতে আরো ভয়। মধুসূদন ধমকে উঠবেন : ইডিঅট। Have you read Bharat Chandra, that old fool of 'Krishnanagar' ? বলতে যাচ্ছিলাম : অশ্লীল তাই। কিন্তু চট করে নিজের হাতের বইটার দিকে চোখ পড়তেই কথাটা আটকে গেল। ভূদেব বলে উঠলেন : মধু, আমি উঠি, তোমাদের ত' আবার। মধুসূদন হেসে বললেন : বুঝ লোক যে জানো সন্ধান। ছিপি খোলার শব্দ হয়।

স্কুল কলেজে শেখা একটা কথা প্রয়োগ করলাম মনে মনে : উচ্ছৃঙ্খল, মাতৃভাবায় কথা বলতেও লজ্জা পায়। সাঙ্ঘনা মেলে যেন মনে মনে : বাংলাই জানত না। মুহূর্তে চকিত হয়ে উঠি, আমি আজো পৃথিবী বানানটা ভুল লিখি।

মধুসূদন ধমকাচ্ছেন : রুত্তিবাস পড়নি। হাউ স্ট্রেঞ্জ। আজকাল কি তোমার মত কুলিরা সাহিত্য পড়ছে। প্লিজ রিটার্নার। গের্ট আউট।

ব্যর্থ হয়ে দাঁড়াই সংস্কৃত কলেজের সামনে। পাইচারী করছেন চাট পায়ে সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। সম্ভ্রম করার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিনি কোনদিন, আজো নয়। উঠে যাচ্ছিলাম সিঁড়ি দিয়ে। হঠাৎ বজ্রকণ্ঠ : কোথায় যাচ্ছ ? থমকে দাঁড়িলাম। লোকটার মুখ আমার প্রথম ভাগের ওপর জাঁক। সেই কালো লোকটির মুখের মত। প্রথমে বিষ্ময়, পরে হৃৎকম্প, পরিশেষে এক মিশ্র অনুভূতিতে প্রণামই করে বসলাম।

কি চাই ? বললাম : চাইনা কিছুই, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। কিন্তু এখন সময় নেই আমার। গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এতক্ষণ পরিশ্রমে ক্লান্ত আছি।

সাংখ্য বেদান্ত না পড়িয়ে যাতে মিল পড়ানো হয় সে কথাই বলছিলাম ওঁদের। তা—
কিছু চাই?

অপরাধীর মত মুখ করে বললাম : দেখুন আপনার বিধবা বিবাহ আন্দোলনের কী
সার্থকতা আছে, আইন করে কি আর কিছু...

বিভাগাগর গর্জন করে উঠলেন : আইনের মধ্য দিয়েই সামাজিক বোধকে প্রতিষ্ঠা দিতে
হবে। এটুকু বোঝো না। ইতিহাসের ওপার থেকে কথা বলছ, ওপারের সবই ত বনরেখায়
ঝাপসা। বিচার বুদ্ধি হয়নি এতটুকু। কথাটা ঘোরাবার জ্ঞান বললাম : আপনি নাকি
নাস্তিক ?

হেসে উঠলেন বিভাগাগর। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন : পৃথিবীতে এত
মানুষ, এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ আর তাদের ভালোবেসে এত আনন্দ। তখন ঐ সকাল সন্ধ্যার
পূজাহুকটা মিথ্যে মনে হয়, ঘটা করে ঘটা নাড়ায় সাড়া দিতে পারি না। আর এত বিস্তৃত
জীবনের প্রান্তরে হাঁটতে হাঁটতে এত বিচিত্র সংগীত সেখানে ভগবান নিয়ে কখনও ভাবিনি।

হঠাৎ বিভাগাগরের কথা খেমে গেল। যুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে ছুটে
আসছে পালকী। বিভাগাগর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন : ওকে চিনিস? তোদের প্রথম
গ্র্যাজুয়েট। ওর বই পড়েছিস?

পড়েছি—কিন্তু ভীষণ সেকেলে, রিয়ালিস্টিক নয়, বিশেষ করে—তাই চূপ করে
রইলাম। খড়গনাসা, চাপা ঠোঁট স্থিরচোখ স্মদর্শন পুরুষটিকে আগেও কয়েকবার দেখেছি এই
রাস্তায়। এখন পেছনে একটি লোক আসছে। পালকী থেকে নামলেন সেই তীক্ষ্ণ পুরুষ।
পেছনের আদালী ছাতা খুলে ধরল। ক্লাশ পর্যন্ত সে চলল! ক্লাশে চুকলেন, ছাতা বন্ধ হল।
ক্লাশ থেকে বেরোলেন আবার ছাতা খুলল আদালী।

স্মদর্শন পুরুষটি কি ক্লাশে কখনও কোন নীরস বক্তৃতার অবকাশে ভাবেননি : ইতিহাসের
কোন নির্জন প্রান্তরে একটি রাজপুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে, বিহ্ব্যং বজ্রে বিদীর্ণ আকাশের
তলা দিয়ে, কোন এক অনির্দেশ্য মন্দিরের দিকে। সেই বাড় বৃষ্টির মধ্যে সেই রাজপুরুষটি কি
একবারও মন্দির দ্বারে আঘাত করেনি। নিশ্চয়ই করেছিল। অন্ধকারে কেউ দেখিনি।
মন্দির দরোজা পেরোলেই অবগুষ্ঠিতা দুর্গেশনন্দিনী।

কোন দিন কি সামনের মাঠে চারজন বন্ধুর সঙ্গে ওরা গল্প করেন নি। কেউ বলেন নি
কি আমি লিখব মহাকাব্য, স্বর্গজয়ী বৃত্ত নিয়ে। ঠাকুর বাড়ির স্মদর্শন ছেলেটি কি বলেনি
দর্শনের তুরূহতম তত্ত্বের 'পর প্রকাশিত নূতনতম বইর কথা। আর সেই খড়গনাসা স্বপাতুর
যুবক, বহু বিনিদ্ররাত্রির স্তূতির ব্যথায়, দেশ-জাতির যন্ত্রণায় বন্ধুদের কি একবারও জিজ্ঞাস
করেনি : এ জীবন লইয়া কি করিব—কি করিতে হয়।

‘এ জীবন লইয়া কি করিব! কি করিতে হয়’।

জানিনা। তার ক্ষমা আছে। কিন্তু আমি যে জানতে চাই না। এই পাথরে বাঁধা কলকাতার পথে পথে হাঁটি, নিঅন আলোয় স্বপ্ন বুনি। কখনও উচ্চও কোলাহলে, কখনও ফেনোজ্জল প্রমত্ততায়, কখনও যন্ত্রণার নখরের দিন কাটাই, মুহূর্ত কাটাই। তার আড়ালে জীবনকে রেখে দিয়েছি। তার কোন আরম্ভ নেই, পরিশেষ নেই, পরিণাম নেই! উদ্দেশ্যহীন জীবনকে নিয়ে দুহাতে ছুঁড়ে ফেলে দিই জনতার ভীড়ে। মানুষ হয়ে জন্মাই, মানুষ না হয়ে জন্মাবার কামনা নিয়ে মরি। এমন শতাব্দীর ক্লাস্ত রাজপথে হেঁটে বেড়াই। তাই ভয়। ভয়ই বা কিসের।

এই ত' বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। ওরা ক্লাশ করুক। প্রেসিডেন্সি কলেজের সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে ভয়টাকে কাটাবার চেষ্টা করি। সামনের একটা টেবিলে জুতোশুদ্ধ পা-টা তুলে দিই। তারও উপায় নেই।

: পানামাও। ওখানে আমি রাত্রে ঘুমোই যে।

: ঘুমোবার আর জায়গা পেলেন না। মুখের দিকে না তাকিয়েই বললাম।

: দুই স্ত্রী কিনা। একটু হাসলেন যেন। ঘুরে দাঁড়ালাম। কাল রাত্রে এখানেই শুয়ে শুয়ে একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম। কেশববাবুর সঙ্গে আর থাকা হলনা বোধ হয়।

শিবনাথ শাস্ত্রী। চেষ্টা করে চিনতে পারলাম। ধর্ম নিয়ে কি ভাবছ তোমরা? কিছুই ভাবিনা। একেবারেই না? আজ্ঞে না। আচ্ছা এস।

মাঠে বেরিয়ে দেখি সেই তিনটে ছেলে ঘাদের দেখেছি মেডিক্যাল কলেজের সামনে পান্ধীর পেছনে পেছনে দৌড়োতে—বল খেলছে—আর যেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় পঞ্চগোরার একজন নাচতে নাচতে বলছেন : ইয়েস, ইয়েস, কাম টু মি।

ভালো করে দেখলাম। না সেই পুরোনো স্ট্যাচু। শুকনো মালা। ফুল নেই। স্মৃতিটা আছে।

'এ-জীবন লইয়া কি করিব। কি করিতে হয়।'

রেখে দাও বাজে প্রশ্ন। এসো কফি হোসে। কিন্তু দেখো, চেয়ে দেখো ওরা, কারা আসছে—প্রত্যেকের চোখে কেমন জলন্ত জিজ্ঞাসা। দেখো, একটা ইতিহাস যেন হেঁটে আসছে। ওর সঙ্গে সঙ্গে বলছেন জবাব দাও : সতীদাহ এখনও কেন বন্ধ হয়নি—ঘরে, রান্নাঘরে এখনও ঘোঁষায়, চোখের জলে, এখনও আত্মহত্যা কেন হয়। ঐ যে সামনে বিদ্যাসাগর আসছেন। চাক্রি ছেড়ে দিয়েছেন। রসময় দত্ত ঠাট্টা করে বলছেন : বিদ্যাসাগর খাবে কি? উত্তর পাচ্ছে, আলু পটল বেচে। একটু হেসে বলছেন, ভারতবর্ষের এমন কোন রাজা নেই যার নাকের ওপর এই চটি জুতো মারতে না পারি—সেই বিদ্যাসাগর বলছেন : জবাব দাও, এখনও কেন তোমাদের ঘরে নারীর মূল্য নেই, ঘরে ঘরে এখনও কেন বিষ খায়। আর মেয়েরা একশব্দের ধরে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে এখনও স্বাধীন চিন্তা করেনা, ভাবেনা, লেখে না।

বিপর্যস্ত হয়েও একটা স্বযোগ পেলাম। বললাম : এ প্রশ্নটা তাঁরাই জবাব দেবেন তাঁদের কর্মে চিন্তায়।

হাতে আমার একটা ছোট্ট বই—সত্ত প্রকাশিত। মনে হয় মাইকেল এসে ধমকাবেন : Translate the passage into your own English, আর আমার সাঁইত্রিশটা ভুল বেরোবে। ছবি সম্বন্ধে একটা লেখা বন্ধুকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেই। ভয় হয় বন্ধিম বুঝি দেখতে পাবেন আর বলবেন : যাহা বুঝিবেন না তাহা লিখিবেন না—একথাটা আমি একবার নব্য লেখকদের বলেছিলাম, আর একবার একটা প্রবন্ধে বলেছিলাম : গ্রন্থ কি জ্ঞান? পরোপকারের জ্ঞান।

মনে মনে বলি : nonsense কথা।

মাইকেল হুংকার দিয়ে ওঠেন সত্তপ্রকাশিত বাংলা বই দেখতে দেখতে : Bring new air. কি লিখছ nonsense সমস্ত। why don't you read classics ?

জবাব দাও।

বজ্রকর্মে টেঁচিয়ে ওঠে গেকুয়া গায়ে পাগড়ী মাথায় লোকটা : you are the son of bliss. আমি বললাম : ঠিক তার উল্টো। আপনার ঈশ্বরে, ধর্মে, জীবনের মূল্যবোধে একটুও বিশ্বাস করি না।

: Damn it. One who does not believe in God is called an Atheist. But I call him an atheist who does not believe in himself. নিজেকে বিশ্বাস কর না তুমি। তুমি অমৃতের পুত্র।

: না, না, আমি শুধু শরীরী, সাধারণ, বিশ্বাসহীন, ব্যাথা হতাশার প্রতিমূর্তি।

ছুটে পালাই সিনেট হলের দিকে। কেউ নেই। শাস্ত নির্জন। বিকেলের রেডিয়োতে করুণ পুরবীতে গান বাজছে। গুনগুন করে সেই স্বর গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে মনে। হঠাৎ দেখি সারা শতাব্দী জ্বলছে এক সূর্যপ্রভ জ্যোতিষ্মানের চোখে। অস্তসূর্যের করুণ আলোর অঞ্জলি নয়, মধ্যাহ্নের মরীচিকাই সমস্ত দেহে। ফাল্গুন সমুদ্রে যেন সহসা চঞ্চলিত।

: ফিরিয়ে দাও আমার গান। বিশ্বাসহীন।

: ক্ষমা করুন। বিশ্বাসহীনতাই যে যুগধর্ম।

: কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানোকে আমি পাপ বলে মনে করি। আমার গানের সম্পদ তোমার জীবনে ব্যর্থ। আমি চেয়েছি তোমাদের কাছে মহৎ পরাজয়। কিন্তু কোন মানির পক্ষে আমি কলঙ্কিত হলাম। আমার সহস্রধারা স্বরধুনীকে লক্ষ লক্ষ বন্ধনে বেঁধেছ তোমরা। কোথায় সেই অনন্ত আকাশ, যেখানে হৃদয় প্রকাশ হবে।

: কোথায় সেই অনন্ত আকাশ ?

তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা শায়ক এসে বেঁধে। আর ইতিহাসের লক্ষকণ্ঠের প্রেমের মধ্য দিয়ে ছুটে
বেয়িয়ে যাই।

এ পথে আমি যে গেছি বারবার। তবু এই চেনা পথে কখনও কখনও একটা অনির্বাচ্য
ভয় ঘিরে আসে। আর মনে হয় এ পথে আর হাঁটবো না।

অন্যতর মূল্যায়নে

(বনলতা সেন, শ্যামলী, সুরঞ্জনা, স্মৃচেতনা)

প্রদ্যুম্ন মিত্র—পঞ্চম বর্ষ, কলা।

যে আলোচনার জন্ম ভক্তিতে প্রায়ই তা স্তব্ধিতে এলিয়ে পড়ে এমন একটা অল্পমানের
প্রবণতা হয়তো এদেশীয় সমালোচনার অনেকগুলি থেকেই আমরা পেয়েছি। যদিও এমন
বাঁক্য কিছুটা দুঃসাহসী, তবু বলবো সশ্রদ্ধ হয়েও বর্তমান রচনাটি সমালোচনার বৃত্তি
হারাবেনা। লোকান্তরিত কবিকে লোকান্তর প্রতিভাময় প্রমাণ করার মতো বিচলিত আমি
এখনো হয়নি একখাটি বলতে পেরে আমি সানন্দ। জীবনানন্দকে শ্রদ্ধার জন্ম, আমার ক্ষেত্রে,
তঁার বিমোহনী কাব্যকৃতির চেয়ে তঁার কাব্যের দার্শনিক বক্তব্য থেকেই প্রধানতঃ। আংগিকের
অভিনবদে আর বক্তব্যের বিধেয় যে তির্যক ব্যঞ্জনা তার সার্থক অধিকার আর সার্থকতার
ব্যবহারে সমসাময়িককালে তিনি অতীব দুর্বোধ্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেছেন নাকি ; কিন্তু
তবু তঁার শৈলী একধরণের অনির্বাধ্য আকর্ষণে মনোহারী এসব কথাও শোনা গেছে।
অগ্নিদ্বন্দ্বভাবে সত্য তঁার আংগিকের মনোহারী আকর্ষণের ক্ষমতার কথা। তবু এসব জিজ্ঞাসা
বিতর্ক থেকে দূরে আমি শুধু বলবার চেষ্টা করবো সহৃদয় সতর্কতার সংগে পাঠে তঁার
কবিতার অর্থ সবসময়ে স্পৃশ্য, প্রায়ই বোধ্য প্রাঞ্জল না হলেও। এবং আমি মনে করি
নিরঃস্বপ্ন প্রাঞ্জলতা একটা মধ্যযুগীয় গুণ। দুর্বোধ্যতার প্রসংগে যে কোনো আলোচনায়
আমরা আধুনিক কবিতার সাধারণ সমস্যায় এসে পড়বো এটা স্মৃশ্চিত বলেই ও-সবকিছু
এড়িয়েই আমি জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে একধরণের ব্যাখ্যা দিতে চাই
এখানে। এ আলোচনার সবকটি কবিতাই সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন-এর কবিতাবলী,
যেগুলির রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬, থেকে নেওয়া। বনলতা সেন, শ্যামলী, স্মৃচেতনা,
সুরঞ্জনা ইত্যাদি কয়েকটি কবিতার দিকে দৃষ্টি দিতে বলি, লক্ষণীয়, সব কবিতাগুলিই
কোন নারীর প্রতি উদ্দিষ্ট। নিছক প্রেমের কবিতা হিসেবে ধরার বাধা এই-সব

নামগুলির অপ্রচলন আর অর্থগ্রহণের প্রায়-অস্ববিধা। আমার মনে হয় এইসব কবিতার নামকরণ খুবই উদ্দেশ্যময়, অর্থবহু এবং ইংগিতগভীর। ‘স্মৃচৈতন্য’ বলতে যদি ‘স্মৃ-চৈতন্য’ বুঝি কি ‘স্মরণনা’ শব্দটির বাগর্থের সংগে সংগতি রেখে যদি বলা যায় ‘হৃদয় রাঙালো ঘন’ যে নারী বা সাধারণীকরণে নারীনামের আড়ালে প্রেমই এখানে উদ্দিষ্ট তাহলে অর্থবোধে অনেকখানি স্বচ্ছতাই যে আমাদের সহায় তা আমরা দেখবো। ‘শ্রামলী’কে আমি ‘শ্রামলতা’ তথা ‘যৌবনে’র প্রতীক হিসেবে ধরি। নামকবিতাটি সযত্নেও বলা গেলো। বনলতা সেনে কবির দৃষ্টি মূলত প্রকৃতিকেন্দ্রিক যেমন ‘সাতটি তারার তিমিরে’ যত ভিন্ন এবং হতাশভাবেই হোক মানবসমাজ সম্পর্কে কবি অবহিত। সময়ের কোলাহল আর ইতিহাসের রণরক্তক্ষয় থেকে যে নির্জন হৃদয় আশ্রয় খুঁজলো তার কুটির যে প্রকৃতিতে, তাই হৃদয়ের শাস্তি নিয়ে যে অপেক্ষা করে সে বন-লতা। এখানে প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত নারী মুখে। প্রকৃতি (বনলতা), স্মৃ-চৈতন্য (স্মৃচৈতন্য), শ্রামলতা (শ্রামলী), প্রেম (স্মরণনা) ইত্যাদিকে নারীরূপে ব্যঞ্জিত করার অর্থটিও গূঢ়গভীর। যে প্রকৃতি দিলো প্রশান্তি, যে স্মৃচৈতন্য আজ স্মৃদূর, যে সে কালের যৌবনের প্রতিচ্ছবি আজকের এক মেয়ের মুখে, যে প্রেম পৃথিবীর সমবয়সী তারা একধরণের অনিবার্য আকর্ষণ, মানুষের কাছে যেমন মানুষী। এইসব মূল্যবোধগুলি, যদিও শতাব্দীতে শতাব্দীতে এদের অনেকগুলি হারিয়ে গেলো আর ফিরে এলো, চিরকালই আমাদের কাম্য, নিরন্তরকালের কামনার বস্তু যেমন নারী। আবার সার্বজনীন আকর্ষণের কথা বাদ দিয়েও বলা যায় এইসব বিমূর্তবোধগুলি একান্ত ব্যক্তিগত, সেই অর্থে সত্য এবং সৎ। আমরা দেখবো অন্তত দুজায়গায় নামকরণ নিতান্তই আবশ্যক ছিলো এবং সংকবির হাতে সেই আবশ্যকের অনিবার্যতা কি রকম অতিক্রান্ত হয়ে পরম কাব্য হয়ে উঠলো।

যেমন বনলতা সেনে। পাঠককে কবিতাটি দ্বিতীয়বার পড়তে বলি, মূল্যায়নে তা সহায়ক হবে। বনলতা সেনকে আমরা প্রকৃতির প্রতীক বলেছি এবং তা হলে নামকরণ কী আশ্চর্য সৃষ্টি! প্রকৃতি কথাটিই দ্বৈত অর্থ বহন করে : নারী আর নিসর্গ। মার্গসাহিত্যে আমরা এই নিসর্গের যে রূপটি পাই তা নারীর। আমাদের কাব্যসাহিত্যেও বনদেবীর চিত্রটি অজস্র। তাই জীবনানন্দ এখানে গভীরভাবে ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিলেন আর দিলেন এক নতুন গৌরব। প্রকৃতির অপরায়ে প্রশান্তির কথা আমাদের কবিরা এমন স্পষ্ট করে এর আগে বলেন নি, বোধ হয় বোবোনিও। তাই প্রকৃতি নারী ছাড়া অল্পক্ষেপে কল্পনা অসম্ভব এবং অশোভনও বটে। যাইহোক, এ কবিতার প্রথমস্তবকের শেষ দু’পংক্তিতে বনলতা সেনের উল্লেখ, তার আগে এক অধ্বজার্জর প্রাণের কথা। লক্ষ্য করবার বিষয় এ যাত্রা হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে। জীবনানন্দের অগ্রাঙ্ক কবিতার মত এখানেও অধ্বজা কেবলি প্রাগ্রসর সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় সেই কাম্য প্রশান্তির কারণে। এক আচ্ছন্ন ইতিহাসবুদ্ধির বিস্মৃতি কবির চৈতন্যে—প্রথম চারপংক্তির বর্ণনায় তার আভাস। মোটামুটি বলতে পারা যায় এ স্তবকের বক্তব্য এই যে মানুষের সমস্ত সভ্যতার আড়ালে

রয়েছে এক প্রশান্তির স্নিগ্ধ, মহিমময় প্রত্যাশা, অনেক নতুনতর ইতিহাসে (সিংহল, মালয়, অশোকের জগত আর বিদর্ভ) সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়ায় যে অক্ষয় সন্ধান, যে অবিরত অধেষা প্রাণ তাতে ক্লাস্ত হয়ে এসেছে প্রকৃতির আশ্রয়ে—জীবনের সফেন সমুদ্রের আড়ালে সেখানেই দুদণ্ডের শান্তি। “আমি ক্লাস্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন”—দুটি বিপরীত-ধর্মের, দুটি বিরোধী চিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্ভার অবস্থানে পংক্তিটি অনবচ্ছিন্ন তার আকর্ষণে। একদিকে এক নির্জন ক্লাস্তি, অগ্রধারে তরংগিত চাক্ষুণ্য; একপাশে একাকী এক ক্ষুদ্র মানুষ, অগ্রদিকে বহুচেউ বিশাল এক প্রাকৃত-শক্তি। আর এদ্বয়ের মাঝখানে পাছ-পালানদীমাটির সত্তারে নিশ্চিত এক প্রশান্ত আশ্রয়। আমরা এখানেই ইংগিত পাচ্ছি সেই বনলতার অনিবার্য প্রেমের। আগামীস্ববকে কবিকে পাওয়া যাবে মগ্ন-প্রেম, সেখানে নিসর্গ হয়ে উঠলো নারী, এক প্রকৃতি (নিসর্গ পৃথিবী) অগ্রতর, আর এক প্রকৃতিতে (নারী) ভবসাদৃশ্য পেলো। সেখানে

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;

বিদিশা শ্রাবস্তীর ইতিহাসময় পরিমণ্ডল আনা উদ্দেশ্যময়। যে ইতিহাস মৃত তা কি স্বাভাবিক নিয়মেই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়, ইতিহাসের সেইসব প্রাসাদপ্রাচীর আর ভগ্ন তোরণ? তাই প্রকৃতিপ্রতীক বনলতা সেনের চিত্রায়নে বিদিশার বিলুপ্ত অধ্যায়ের অন্ধকার ভাবসাদৃশ্য পেলো চুলে আর শ্রাবস্তীর বিগ্নত সৌন্দর্যের বিচিত্র আভাস তার মুখের কারুকার্যময়। এরপরেই যে চিত্রকল্পটি তা এক দিশেহারা নাবিকের নৌকোর হাল যার ভাঙলো। মানুষের সভ্যতার মর্মের ক্লাস্তির কথা আগের স্তবকে, এবার পেলাম দিশেহারা নাবিকের চিত্রের আড়ালে আরো এক নিগূঢ় ব্যঞ্জনা। বিচিত্র আর সার্থকতর সভ্যতা পথ দেখাতে পারেনি, ইতিহাসের সংঘর্ষেও অন্তর্হীন শূণ্যতা; সময়ের সমুদ্রের নাবিক আমরা মানুষ ভগ্নতরী দিশাহারা, কল্লোলের সংগ্রাম পেরিয়ে যে তীরে আশ্রয় নিলাম সে সেই প্রকৃতি-পৃথিবীর শান্ত কোল; অন্ধকার দারুচিনি দ্বীপের ভেতর দুর্লভ ঘাসের দেশের মতো আমরা চিনেছি বনলতা সেনকে। অন্ধকারে কেননা হাজার বছরের পথহাঁটা, মালয় থেকে মগধ বিদর্ভের নব নব সভ্যতায় আমরা দিশারী আলোর দেখা পাইনি। তাই দীন ভগ্নতরী এ সাঙ্ক্যং যেন কিছুটা আকস্মিক, অন্ধকারে। এ আবিষ্কার বুদ্ধিগত নয়, সভ্যতার অর্জনের সাহায্যে নয়, এ আবিষ্কার নিছক প্রকৃতির বশে বাঁচবার প্রেরণায়। শেষ স্তবকে আরও কয়েকটি সার্থক এবং সূন্দর আর কিছুটা ইঞ্জিয়গ্রাহ্য চিত্রের সাহায্যে যে পরিবেশটি সূচিত তা দিন থেকে রাতের, সূর্যালোক থেকে অন্ধকার পরিবর্তনের। এমন একটি বিশিষ্ট মুহূর্ত বেছে নেওয়ার কারণটি বোধহয় প্রকৃতির অব্যর্থ আর নিশ্চিত আশ্রয় আর সংশয়হীন সান্ত্বনার দিকটি ফুটিয়ে তোলা, রৌদ্রের গন্ধ স্নান হয়ে এখন শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা এলো।—“পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;” রঙনেভা পৃথিবীর বিরাট পটের

এখন যে লেখা, যে নব গল্পের আয়োজন তাতে আসবে জোনাকির অক্ষর এবং তার পরেও অত্যন্ত অল্পধাবনের সংগে বলা হোল :

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায়—এ জীবনের সব লেনদেন ;

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

জীবনের সবকিছু আয়োজন আনন্দের অনিবার্য অবসানের পরেও যে অন্ধকার সেখানে বনলতা সেন আছে, প্রকৃতি—পৃথিবীর প্রশান্ত আশ্রয়। দ্রষ্টব্য এই যে স্বাভাবিকভাবেই দুঃখের শাস্তির উপহারের প্রসংগে পেরিয়ে বনলতা সেনকে অবশেষে তিনি দেখলেন অস্বস্তি প্রশান্তির মধ্যে, সবকিছু লেনদেনের পরেও রইলো অশেষ অন্ধকার অবকাশ রৌদ্রের গন্ধেরও পরে জোনাকির রঙের গলে। তিনটি স্তবকেই আমরা অন্ধকার কথাটির ব্যবহার পাই, আমার কাছে এই ব্যবহার তিনটি পৃথক পরিমণ্ডলের সূচনা করেছে। কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক পরিপূরক, শেষ স্তবকটি সিদ্ধান্তের মতো। প্রথম দুটিতে একটি অঘোষার কথা, শেষটি এলো তারি গভীর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে। তাই অন্ধকার শব্দটির ব্যবহার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবকে সংযোজক। “সিংহলসমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মাগয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি”—এখানে একটি যাত্রার ছবি। কিন্তু কেন এ যাত্রা বিশেষভাবেই নিশীথের অন্ধকারে। এখানে শব্দটি অঘোষার অনিশ্চয় সার্থকতা আর সংশয়বিধার প্রতি ইংগিত করে। “...দারুচিনি দ্বীপের ভিতর, তেমনি দেখছি তারে অন্ধকারে ;” এ চিত্রের পেছনে রয়েছে সভ্যতার নব নব উত্তরণের নিষ্ফলতার সেই পটভূমি, আলো সে দিলো না, শান্তি সে দেয়নি। আর এই সহস্র শতকের ইতিহাসের ব্যর্থতার পটে বনলতা সেনকে আবিষ্কার আরও তীক্ষ্ণ এবং গূঢ় হয়ে উঠেছে। শেষ ব্যবহারে (থাকে শুধু অন্ধকার) অন্ধকার কথাটির সংগে যে ভাবমণ্ডল এলো তা নির্জনতার ; বিচ্ছিন্নতার। এখানে প্রকৃতির যে বিশিষ্ট মুহূর্তের কথা এবং বর্ণনার যে ভংগী তা থেকেই এই একাকী আবহাওয়াটি পরিস্ফুট। এই অন্ধকারকে যদি নির্জনতা বা বিচ্ছিন্নতার স্তোত্র বলি তাহলে শুধুমাত্র ব্যংগর্থক এক ব্যাখ্যা করা হোলো। আমার মতে এ অন্ধকার বর্জনের নয় অর্জনের একটি অবস্থা। এ হচ্ছে চৈতন্যের গভীরতম বিস্তারিত অবস্থাটি। ‘অন্ধকার’ কবিতায় বলা হয়েছে এই অবস্থার বিচ্যুতি কি ভয়াবহ শূন্য পৃথিবীর দরজা খুলে দেয় চোখের সামনে।

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল ছল শব্দে জেগে উঠলাম

(অন্ধকার : বনলতা সেন)

নদীর ছলছল শব্দের আঘাতে জেগে ওঠা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন ঘাপন করা এ অন্ধকার-বিচ্যুতিরই অবস্থা।

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে :

আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

(নয় নির্জন হাত : বনলতা সেন)

এ কবিতাতেও অন্ধকারকে দেখা হোলো পরম এক সত্যরূপে। পর্যবেক্ষণগুলি লক্ষ্য করা যাক। এ অন্ধকার আলোর মতো আর এ অন্ধকার রহস্যময়ী। রহস্যময়ী, কেননা এ অন্ধকার সেই মিষ্টিক উপলব্ধির জনক যার ফলে নব নব রিভিলেশনে চৈতন্য প্রসারিত হোলো আর সেই কারণে এ অন্ধকার আলোকিত এক অর্জন।

দ্বিতীয় আলোচ্য ‘শ্রামলী’ সম্বন্ধেও এই ধরণের অর্থবোধে আমরা সফলকাম। শ্রামলী নামটি যদিও সাধারণ প্রচলনের অপেক্ষা রাখে, তবু যখনি কবি বলেন “শ্রামলী তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন” তখনি আমি এখানে সেই প্রতীকশ্রয়ী ব্যঞ্জনার সন্ধান পাই। মধ্যযুগীয় বীরত্ব ও শক্তির বিমূর্তন হিসেবে শ্রামলীকে সম্বোধন, কারণ শ্রামলতার সংগে সজীবতা ও যৌবনের এক অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে। এ কবিতার গড়নও বনলতা সেনের মতো, যদিও এখানে পংক্তিগুলি স্বল্পদৈর্ঘ্য।

প্রথম দুটি স্তবকে একটি বক্তব্য পূর্বাংগ হয়ে উঠেছে। কাব্যকৃতির আলোচনা ছাড়া আমরা কবিতার মধ্যে পারস্পরিক সংযোজন এবং অর্থবিস্তৃতির সন্ধান করবো। প্রথম স্তবকে আমরা পেলাম মধ্যযুগীয় বিরামহীন অঘেষ্য চিত্ররূপ, শ্রামলীর মুখে সেই আদিম ব্যাকুল সন্ধানের প্রতিভাস। একটি মুখের চার পাশে উভয় স্তবকেই যে বিচিত্র অতীত ইতিহাসের পরিমণ্ডল আনা হয়েছে তা আশ্চর্য সমঞ্জস, আমার মতে, বক্তব্য ও চিত্রায়নের পরিপূরক সংগতিতে। প্রথমে সেই মুখের, যেখানে সেকালের শক্তির প্রতিরূপ, আশে-পাশে যে আবহাওয়া গড়ে তোলা হোলো সে সেই উপনিবেশ গঠনের, সমুদ্রপাড়ি আর আবিষ্কারের অনুপ্রেরণার। স্বদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে তখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল সেকালের রুচি রৌদ্রে অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিত, ঘরোয়াজড়ানো অবসর আনন্দের আকর্ষণ উপেক্ষা করে। দ্বিতীয় স্তবকে সেই মুখ আরো এক ভাবমণ্ডলের অভিজ্ঞান! উদ্দাম যৌবন সমুদ্র পাড়ি আর নয়, উপনিবেশ আবিষ্কারের সেই বর্ষময় পরিবেশ নয় এবারে : শ্রামলীর মুখের দিকে তাকিয়ে পাওয়া গেলো এক ব্যথিত শূন্যতার আভাস, দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা সেখানে। এই ছবিটির আড়ালে যে ছন্নছাড়া শূন্য বন্দরের আবহাওয়া তা আশ্চর্য প্রচ্ছন্নতায় আরো এক ইংগিতবহ। বন্দরের সব জাহাজ হারিয়ে গেছে কোথায় অকূলে, সামনে সমুদ্রের অগাধ অমেয় নীলিমা, এখানে শূন্য শহরের আশে পাশে সূর্য এলিয়ে বিকেলের আবছায়ায় ক্লাস্ত চিলের মধুর চংক্রমণ, তারও পরে নক্ষত্র, রাত্রি অন্ধকার এইসব বিচিত্রতর অল্পভবের সস্তারে আনলো সেই মুখ। যুবাদের ক্রন্দন সব—আরও এক করুণ ভাবনার ব্যঞ্জনা বহন করেছে। এখানে ক্রন্দনের ব্যবহার সাধারণ অর্থে নয়। আমার মনে হয়, অঘেষ্য আর্তির কথাই বলা হয়েছে আলোচ্য ছবিটিতে। কারণ আগামী স্তবকে এই অস্থির ত্রিকাল-বিসারী সন্ধানের, যাত্রার অনিবার্ণ আকর্ষণের কথাটিই বলা হয়েছে :

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল

মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবেনা সময়।

এই দুই স্তবকের সাহায্যে আমাদের সেইসব ঔপনিবেশিক অঘোষার বৈতরূপটি ভুলে ধরা হয়েছে—শক্তির দিকটিই শুধু নয়, তার অপর পিঠে যে বেদনা ও আততীর প্রচ্ছন্নতা সোঁটো আভাসিত। সকালের রুঢ় রৌদ্র থেকে রাত্রির জল আর নক্ষত্র নিয়ে একটা বন্দরের সমস্ত দিনরাতের পরিবেশটি ব্যঞ্জিত—জনঘন এক পোতাশ্রয়ের সকালের যাত্রী কোলাহল থেকে ছপরের অলস শূণ্যতা ক্রমশ রাত্রির অন্ধকারে মিশে গিয়ে এক লুকানো আঁতীর সন্ধান দিয়েছে। এই দুই স্তবকের কবিত্বও অপূর্ব এবং শেষেরটি থেকে কিছুটা ভিন্ন। এখানে বক্তব্য তা যে যতই গভীর এবং বেদনাবহ হোক না কেন, কাব্যরূপটি আশ্চর্য কারুণ্য, চিত্রকল্পের বিচিত্র উত্তরণ আর পরিবর্তনে বক্তব্য আশ্বস্ত। ‘শ্রামলী তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন’—এমন সহজ স্পষ্ট পংক্তির অপূর্ব কবিত্ব আর অনিবার্য আকর্ষণের কথা বাদ দিয়েও আমরা পাই

মহিলারি প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল

দ্রাক্ষা দুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে

কিন্মা ‘যুবাদের ক্রন্দন সব’এর মতো প্রতীকী ইংগিতময় বাক্যাবলী। মহিলারি প্রতিভায়—মহিলামুখের প্রতিভা বা জ্যোতিতে স্বর্ণের উজ্জ্বল্য এবং গৌরবের দিকে ইংগিতের সংগে সংগেই আলোচ্য ধাতুটির ব্যবসায়ী অমূল্যতার, যা প্রধানত মহিলাদের অলংকারপ্রিয়তার কারণে, দিকেও প্রচ্ছন্ন নির্দেশ রয়েছে। দ্রাক্ষাদুধ ময়ূর শয্যার কথা ভুলে বলার সংগে পংক্তিটি দ্বৈত গৌরবে সমৃদ্ধ আমরা বুঝতে পারি। একদিকে যুবাদের উদ্যম গৃহত্যাগী আরামউপেক্ষী অঘোষা, অপরদিকে মধ্যযুগীয় ঐশ্বর্য আড়ম্বরের কথাও বলা হলো। আরও হৃন্দর সার্থক চিত্রায়ণের কথা আমরা আগেই বলেছি যেখানে ব্যঞ্জনা গভীরতম না হলেও চিত্রগুলি মনোহারী এবং উপভোগ্য—বিকেলের বন্দরে সেইসব ক্লাস্তচিলের ময়ূর প্রত্যাগমন কিন্মা যুবাদের সপ্রতিভ ব্যস্ততা ‘জাহাজে চড়ে’ শব্দ দুটিতে অথবা সকালের রুঢ় রৌদ্র কি ছপরের শূণ্য সব বন্দরের ব্যথার মতো ছবি।

তৃতীয় স্তবকে বক্তব্য কিছুটা স্বপ্রকাশ, চিত্রায়নের প্রচেষ্টা স্বল্প। গভীর মন্তব্যের মতো এই স্তবকটির নিগূঢ় যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতাটি নিজেই আকর্ষণে নিশ্চিত, তাই বক্তব্যকে মনোহারী করার চেষ্টা নেই। যে সমস্ত যুগসভ্যতা অমেয়মত্ত তারাও হারালো আর অনন্ত বিলয়ের বৃকে কেবলি মানবের ক্লাস্তিহীন অস্থির সন্ধান। সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী—‘কিছু’ শব্দটির পেছনে রয়েছে এক ধরণের অনিশ্চয়তা। নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য নয়, শুধু প্রবৃত্তিগত উদ্যম অঘোষা এবং তার ফলে এত রক্ত নদী, হানাহানি, রণরক্তক্ষয়। দুঃসাগরের শব্দ তাই অন্ধকার প্রেরণা—অস্পষ্ট লক্ষ্যের পেছনে অনিবার্য আস্থানে মালুষ ছুটেছে শুধু একবার নয় বারবার, শতকে শতকে—শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে সেই অনির্দিষ্ট আস্থান। অতীতে একদিন তারই জন্মে অঘোষার আঁতি আর অনিবার্য আততি পেয়েছে মালুষ, সময়ের হাতে মালুষ যখন কেবলি অস্থির শাস্বত সময়ের পরেও এই অঘোষার কামনা থাকবে কি এই জিজ্ঞাসায় কবিতার শেষ।

স্বরঞ্জনা কে আমরা প্রেমের প্রতীক হিসেবে ধরেছি। এই কবিতাটিতে স্তবকান্তরে অর্থাগ্রগতি এত স্পষ্ট এবং স্ববোধ্য যে আশ্চর্য হতে হয়। প্রথম স্তবকে স্বরঞ্জনা কে সম্বোধন করে জানানো হোল প্রেম পৃথিবীর সমবয়সী, আদিম প্রাণের ইতিহাস তার সঙ্গে জড়িত। কালোচোখ মেলে ঐ নিলীমা দেখে সে—আকাশ হয়তো অতীত ইতিহাস সভ্যতারও ধরা যেতে পারে। গ্রীক হিন্দু আর ফিনিশিয়, কত অপরিচিত কি বিচিত্র সভ্যতা নিয়মের রূঢ় আয়োগ্রনে কতোনা অস্পষ্ট সার্থকতা খুঁজেছে, অবশেষে হারিয়ে গেছে। সামাজিক আইন কালনের রুক্ষ রূঢ় হাতে হয়তো কালে কালে প্রেমের প্রগতিতে বিঘ্ন ঘটেছে, সেই সভ্য শৃঙ্খলারীতি আজ বিলুপ্ত, কিন্তু প্রেম প্রোজ্জ্বল এমন একটি অর্থইংগিতও আমরা পাচ্ছি। তিলোত্তমা-নগরীর কথাটির অর্থগৌরব বিচিত্র ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে : তিলে তিলে উত্তম যে শহর তথা রাজধানীই কি এখানে লক্ষ্য? তা যদি হয় তবে আধুনিক সভ্যতার রাজধানীপুণ্ড শাসনব্যবস্থা ভারি স্বন্দর ফুটেছে। দ্বিতীয় স্তবকে, প্রথম চার পংক্তিতে বিচিত্র সব ছবির মাধ্যমে প্রেমের অমৃতজীবনটি লক্ষিত।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের

ঈশ্ব নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো

দুটি ছবি, দুটি ভিন্ন উপায়ে একটি বক্তব্যকে ফোটানো হোলো। বলার কথা এখানে পৃথিবীর ক্রমপ্রাচীনত্ব, দিনে দিনে সে আরও পরিচিত, আরও পুরোধো হচ্ছে। প্রথম পংক্তিতে নরনারীদের বয়স সম্ভবত সমস্ত মানবজাতি ও সভ্যতার বয়সের কথা বলছে, দ্বিতীয় পংক্তিতে সূর্য নক্ষত্রের আপাত অক্ষয় আলোর আড়ালে ক্রমক্ষীয়মানতার বৈজ্ঞানিক সত্য। ইংগিতটি একই, বলার ভংগী শুধু নাস্তিক। এসব ঘটে যাওয়ার পরেও সমুদ্রের নীলিমা এখনো পূর্বদৃশ্য, পাখির গান তেমনি আবেদনময়, ঝিহুক তার বর্ণসস্তার হারায়নি। এসব বলার উদ্দেশ্য নরনারীদের কাছে প্রকৃতি, পৃথিবীর আকর্ষণ এখনো অমর, হৃদয় মরেনি, প্রেম আর প্রেমিক দৃষ্টিপাত চারিদিকে পরিব্যাপ্ত। পরের দু'লাইনে আধ্যাত্মিক সাধনায় মানুষ সন্তোষ পায়নি আরও এক অন্যতর মানবিক সাধনায় সে মগ্নপ্রাণ, সে তপস্বী হৃদয়ের, সে কাম্য কাউকে পাওয়া এই অর্থটি আমরা পাই।

মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল

ঈশ্বরের পরিবর্তে অল্প কোন সাধনার ফল।

নিহত উজ্জ্বল ঈশ্বর বলতে খ্রীষ্টের কথা স্মরণ হতে পারে। মানুষের হাতে একদিন তিনি নিহত হয়েছিলেন, পরে তাদের শ্রদ্ধায় উজ্জ্বল আসন পেয়েছেন। কিন্তু এ সব ধার্মিক সাধনার পরিবর্তে সে অল্প কিছু চেয়েছে, কাউকে চেয়েছে। সে সাধনা মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয় পাওয়ার এই ইংগিতটি পরের স্তবকে আরও সম্পূর্ণ এবং স্পষ্ট। সেখানে বলা হোলো ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনার অন্তর্গূঢ় সত্যটি। মহেন্দ্র সজ্জমিত্রার সে সমুদ্রপাড়ির

পেছনে আর কিছু ছিলোনা, ছিলো এই অমেয় অমর প্রেমের প্রেরণাটি। মানুষকে নতুন ধর্মবোধে সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা নয়, ধর্মের আড়ালে শক্তি বিস্তার আর সাম্রাজ্য জয়ের কামনাও নয়, এমনকি নিছক প্রজ্ঞার হৃদয় হারানো নীরস বার্বক্য নয় কি পরিকল্পিত কর্মীদের বিগত আবেগ বিশুদ্ধ প্রয়াসও নয় : সে যাত্রার আড়ালে ছিলো দ্বৈত হৃদয়ের এই নবালোক প্রাপ্তির আনন্দটি যার ফলে নতুনতর অভিজ্ঞতা আর অনুভবে তারা ছুটেছে বৃহত্তর পৃথিবীর পরিচয়ের প্রত্যাশায়, প্রেম যে হৃদয়কে উদার করে নব নব আলিঙ্গনে, চৈতন্য বিস্তৃত হয় হৃদয়বৃত্তির সেই প্রসারে। ‘কর্মীদের স্বধীদের বিবর্ণতা নয়’ বাক্যটির প্রয়োগদক্ষতা, অর্থস্বাদি আকর্ষণীয়। এর পেছনে রয়েছে অনুভূতিলেশ হৃদয়হীন জ্ঞান আর কর্মের প্রকট নীরসতার প্রতি ইংগিত। আবেগহীন কর্মজ্ঞানে তাদের হৃদয় বিবর্ণ হয়নি, প্রেমের উদ্দীপনা এবং সজীবতার প্রতি প্রচ্ছন্ন এক নির্দেশ প্রস্তুত এখানে। শেষ ও চতুর্থ স্তবকের প্রথম চার লাইনে সভ্যতা থেকে নব সভ্যতায় উত্তরণের সেই পরিচিত চিত্রকল্পটি। একটি সার্থক স্পষ্ট উপমায় এই ইতিহাস পরিবর্তনের মূল স্বরূপটি ব্যঞ্জিত। চিত্রটি সমুদ্রনাবিকের শ্রান্ত প্রত্য্যগমনের : এষণাক্লাস্ত সেই সব হতোত্তম নাবিকের মতো আমরা মানুষও ফিরেছি সভ্যতাস্তরে, নব সভ্যতার জয়ের কারণটি গত সভ্যতার অপূর্ণতা, প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি বলেই মানুষ ফিরেছে নব নব সন্ধানে এবং ক্রান্তিকালের হানাহানি, দুই সভ্যতার সংঘর্ষে সে ক্লাস্ত। মক্ষিকার গুঞ্জে যে বিরানহীনতা ও মন্থরতার সন্ধান পাই মানুষের পরিবর্তনের ইতিহাসটিও তেমনি অবিশ্রান্ত, এবং সভ্যতার মর্মের ক্লাস্তি মন্থরতাই নতুন সভ্যতাকে টেনে আনে। বিহ্বল বাতাসের প্রয়োগে এই অঘেবার চারপাশের আবহাওয়াটি সূচিত, লক্ষ্য অনির্দেশ্য, বিহ্বলতা তাই স্বাভাবিক। কিন্তু এইসব ঠোপড়ার ক্লাস্তি, অনিশ্চয় বিহ্বলতা, সভ্যতার অমেয় পরিবর্তনের সমবয়সী আমাদের এই আদিম অপরিবর্তনীয় মূল্যবোধটি, সেই মানবিক সাধনা, অমোঘ হৃদয়বৃত্তি। অনন্ত যৌবন, চিরনবীন, স্প্রাচীন মেয়ে ইত্যাদি বিশেষণে আমরা তাকে ভূষিত করতে পারি। কারণ, শতকে শতকে তার আসনটি অনড়, প্রভাবটি অনিবার্য, আকর্ষণ অমোঘ। বিগত ইতিহাসের অন্ধকার রাত্রি থেকে নতুন প্রত্নাঘের প্রেরণা হয়ে সে অজর। দেহ দিয়ে ভালো বেসে কথাটির অর্থগ্রহণে একটু অস্থবিধে আছে। সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল সে ভালোবেসেছিলো এই অর্থে যে বিলুপ্ত মানুষগুলিও প্রেমে পড়েছিলো। বক্তব্যটি ঘুরিয়ে বলা হয়েছে—তাদের ভালোবাসায় ‘প্রেম’ পড়েছিলো, কারণ এখানে প্রেমকে নারীরূপকে তথা স্বরঞ্জনা নামে অংকন সযোজন করা হয়েছে। প্রেম তাদের প্রেমে পড়েছিলো। অর্থাৎ তারা প্রেমে পড়েছিলো। অর্থ অভিন্ন, একটি মেয়েকে প্রেমপ্রতীক ধরার কারণে প্রয়োগটি বক্র। এই কবিতায় প্রেমের যে মূল্যায়ন ঘটেছে তা অদ্ভুত সং এবং মহৎ। কবি চৈতন্যে নরনারীর এই অবোধ্য হৃদয়বৃত্তির এমন আশ্চর্য সমর্থন এবং শ্রদ্ধা আমরা সাহিত্যে খুব কম পেয়ে থাকি। অনুভবের আসন বুদ্ধির অনেক ওপরে, হৃদয়াবেগই প্রধান এবং প্রথম, অগ্র কিছু নয়, সজ্ব কি শক্তি, প্রজ্ঞা বা পরিশ্রম। ‘মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়’—এমন পরিচ্ছন্ন সত্যটি

সমস্ত সভ্যতার বিবর্তন, স্থির, ইতিহাসের গতিতে প্রচ্ছন্ন। এই কবিতার ছত্রে ছত্রে রহিতালংকারের কারুণ্যতা, সহজ অথচ বিমোহনী কাব্যরূপ

স্বরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছে।

পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন—

এই অনবত্ত পংক্তির সম্ভারে সমস্ত কবিতার শরীরে একটি স্বরের অখণ্ডতা অনগত।
ব্যাপ্ত, গভীর।

স্মৃচেনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ

বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;

স্মৃচেনা কবিতায় স্মৃচৈতন্য সম্বোধিত। প্রথম স্তবকেই আমরা মানুষের হৃদয় থেকে স্মৃচৈতন্যের নির্বাসন ঘটেছে এই স্বীকৃতি পাই। সে আজ দূরতর, নক্ষত্রলোকের কাছাকাছি কোনো স্মৃদূর দ্বীপের মতো মানুষের নাগালের আড়ালে, তবু সেইখানে স্মৃচৈতন্যের ছায়ায় ফিরতে পারলেই হৃদয় নির্জনতা পাবে এইসব সাময়িক রণরক্তক্ষয়বিলয়ের থেকে। কিন্তু যদিও এখন এইসব যুদ্ধ হত্যা, সাফল্য কি পরাজয় তারা সাময়িকভাবে সত্য, শেষ সত্য হচ্ছে তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়—স্মৃচৈতন্যে উত্তরণ, হৃদয়ে আবার তাকে ফিরে পাওয়া ; পরিবর্তনের অমোঘ আবর্তনে হয়তো কোলকাতা একদিন নতুনরূপ নেবে, তিলোত্তমা নগরীর সাজে, যেখানে বিশ্বন্ধি, বিমলা ; তা হোক কি না হোক স্মৃচৈতন্যের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হৃদয়ের দানে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে পৃথিবীর বর্তমান রূপটি। আজকে পৃথিবীর গভীর অস্থখ, তাই ভালোবাসা দিতে গিয়ে মানুষ দেখে নিজের নৃশংস প্রকাশ ; মানুষের হাতে মানুষ নিহত, আত্মীয়তা বিস্মৃত, আরণ্যপৃথিবীর মাংস্ৰাণ্যের শাসনে মানুষের চৈতন্য আচ্ছন্ন, হৃদয় বিকৃত। মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীর কাছে—শুধু ধাত্রী বলে নয়, এই পার্থিব হানাহানি বহুতাই তো পরমাঙ্গতি বয়ে আনছে, নির্বাণে কি প্রজ্ঞানে।

কেবলি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে

দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;

সেই শস্ত অগণন মানুষের সব,

শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিশ্বয়...

এই স্তবকে অপূর্ব রূপকে বাণিজ্যিক সভ্যতার নগ্ন লোভীমূর্তিটি চিত্রিত। বন্দরের রোদে জাহাজের পর জাহাজ আসছে শস্তসম্ভার নিয়ে ; কিন্তু সেই শস্তসম্ভারের পেছনের ইতিহাসটি তিল তিল মরনের। সে শস্ত তো অসংখ্য মানুষের শবের আর এক রূপ, কারণ কতো মানুষের অন্নহরণের বৃত্তান্ত লুকিয়ে আছে সেখানে। সেই শস্ত তথা শব উৎসারিত করবে স্বর্ণের ভাণ্ডার, তারি লোভে মগ্নমন মানুষ। পার্থিব সমৃদ্ধির এই কলংকিত রূপটি বিস্মিত বাক্যহীন করেছে যুগধার্মিকদের, আমাদেরো প্রাণ সে মুক করে, হৃদয়ের ভাষাকে

হত্যা। এই রক্তময় ক্রান্তিকর সভ্যকর্মের আস্থান তবু অবিচল, তার ডাক ক্ষীণ হয় না, মুক হয় না।

তৃতীয় স্তবকে একধরনের আশ্বস্তিবোধ আছে। কবি জেনেছেন অমোঘ বিবর্তনের নিয়মে এই পথেই ক্রমশ সেই কাম্য মুক্তি আমরা পেয়ে যাবো, যদিও সে অনেক শতাব্দীর পরে; প্রজ্ঞা আর মনীষার সার্থক অধিকারে সে উত্তরণ একদিন ঘটবে। মুক্তস্বচ্ছ রৌদ্রময় বাতাসের মতো বিশ্বক সমাজ সেদিন গড়া হবে এইসব মাহুষেরই হাতে। সভ্যতার নির্মমতায় আর নিষ্ফলতায় তারা শ্রান্ত বটে তবু ক্রান্তিহীন অেষষায় আজো প্রাগ্রসর সেই দূর ইতিহাসের দিকে। হয়তো সে প্রত্যাশই মাহুষের সভ্যতায় শেষযোজনায়, ইতিহাসের পবিত্র এবং সমাপ্ত অধ্যায়। শেষ স্তবকে আমরা পাই এই সব অনিবার্যতা আর সম্ভাবনার কথা মেনে নিয়ে এক ধরনের চূড়ান্ত বক্তব্য। সেটি এই: 'মাটির পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি'—লক্ষণীয় এই যে, প্রাণের অবিদ্যমান অস্তিত্বের কথা এখানে বলা হয়েছে। মানবজন্ম যেন একটি কুটির (অনন্তসময়ের পথে?) এবং ভ্রাম্যমান হৃদয় সেখানে এসেছে পৃথিবীর টানে। এসে গভীরতর লাভ হয়েছে যদিও না আসার বোধটি প্রবল ছিলো। নব নব বিচিত্র অভিজ্ঞতার উপাদানে প্রাণ লাভবান হয়েছে, সময়ের অনিবার্যতা এবং মাহুষের সীমাবদ্ধতার কথা তিনি জেনেছেন। সবকিছু কাম্য হলেও প্রাপ্য নয়, আমরাও তাই পরিপূর্ণ নই। অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য যে ঘটনাপ্রবাহ তারই কবলে পড়ে মাহুষ চলেছে। মুক্তির প্রয়াস রয়েছে, কিন্তু সূচৈতন্য জানে সভ্যতা থেকে নব সভ্যতায় উত্তরণ, ইতিহাসের বিচিত্র পরিবর্তন শুধু রাত্রির বৃকে সূর্যোদয়ের মতো; কেননা আবার রাত্রি আসবে এবং আবার উদয় হবে। তাই আমাদের উত্তম সাফল্য অর্জন আয়োজন সকলই শাস্ত রাত্রির বৃকে অনন্ত সূর্যোদয়। পরিপূর্ণতা নয় পৃথিবীতে শুধু পরিবর্তন, প্রশান্তি আসবে না কোনদিন কেননা প্রগতিই পরম।

'প্যাশন-প্লে'

নবনীতা দেব—প্রাক্তন ছাত্রী (১৯৫৪-৫৬)

হাসনেটের দেশ আর ভ্যানগগের দেশ, উত্তরমেরুর নিশীথসূর্য, রাইনল্যান্ডের সবুজ শোভা, সুইজারল্যান্ডের পুষ্পসমারোহ, দক্ষিণ ফ্রান্সের আঁদুর ক্ষেত আর ইতালীর উজ্জল রোদ একে একে পার হ'তে হ'তে এসে পৌঁছেছি অষ্ট্রিয়ার পাহাড়ঘেরা সহর ইন্সব্রুকের আকস্মিক শীতের রাজ্যে। এখান থেকে মোটরকোচ ধরতে হবে "ওবারামারগাও"এর। দক্ষিণ জার্মানীর সেই গল্লে-শোনা গ্রাম।

শুনে অবধি ভালো লেগেছিলো। তিনশো বছর আগেকার গল্প। মাহুষের ঈশ্বর-বিশ্বাস বিজ্ঞানের দীপ্তিতে এত নিম্প্রভ হয়ে পড়েনি তখন। মহামারীর মৃত্যুবহ আক্রমণে

নিষ্পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো ছোট গ্রামটি। অসহায় গ্রামবাসীর দল গির্জায় গিয়ে সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করলো—‘হে ঈশ্বরের পুত্র! আমাদের বিপন্নুক্ত কর, প্রভু। এই গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষ আমাদের সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাবো পবিত্র দেহমন নিয়ে তোমার মঙ্গলময় জীবননাট্য মঞ্চস্থ করে।’ মারী বিদায় নেয়। কৃতজ্ঞ গ্রামবাসীরা গির্জাপ্রাঙ্গণে সশ্রদ্ধ গুচিভায় অভিনয় করলেন প্রতিশ্রুত মহাজীবনের মহানাট্য। সেই ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পর থেকে এই পুণ্যব্রত প্রতি দশবছর অন্তর নিয়মিত উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে সে গ্রামে। আরো আশ্চর্য এই দীর্ঘ তিনশে বছরের মধ্যে গ্রামটিতে একবারও মহামারীর প্রকোপ পড়েনি।

এই পবিত্র ব্রতের গল্প ক্রমশঃ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সারা পৃথিবীর ধর্মপ্রাণ খৃষ্টান এবং নাট্যরসপিপাসু মানুষ হাজার হাজার মাইল দূর থেকে ছুটে আসেন এই বিচিত্র অভিনয় দর্শনের আশা নিয়ে। এমনিই এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সম্ভবতঃ ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। অভিনয় চলবার সময়ে কবির প্রতি চোখ পড়তে গ্রাম্য দর্শকদের মধ্যে কলরব উঠেছিল ‘ঔ থাইস্ট! ঔ থাইস্ট’।

যুদ্ধের জন্ম অভিনয় বন্ধ ছিল মাঝে সতেরো বছর। ১৯৫০ সালে আবার অল্পাঙ্কিত হচ্ছে। বিশ্বের দর্শক এসে জড়ো হয়েছে। প্রতিটি আসন প্রত্যেক দিনের জন্ম ছ’মাস আগে থেকে সংরক্ষিত। তবুও জার্মান বান্ধবী ফ্রাউলিন আইরিগ কোলবেনারের আশ্বাসে অল্পপ্রাণিত হয়ে নিতান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছি আমরা বিনা-টিকিটেই। শোনা আছে, অনেক টিকিট শেষ মুহূর্তে ফেরত আসে—সেই মাত্র ভরসা। দুঃসাহস, সন্দেহ নেই। ছোটো গ্রাম, হোটেল নেই তেমন। প্রাইভেট আশ্রয়গুলিও ভরে উঠেছে। হয়তো থাকবার জায়গাই পাওয়া যাবে না। শুধু তো সতেরো বছর পরে ‘প্যাশন-প্লে’ অল্পাঙ্কিতের উত্তেজনাই নয়, তার ওপরে এবছর “হোলি ইয়ার” পড়েছে পঁচিশ বছর পরে। পৃথিবীর রোমান ক্যাথলিক রোমে একত্র হয়েছে পোপের দুর্লভ দর্শন লাভের আশায়। অস্বাভাবিক ভীড় এ’বছর কন্টিনেন্টে। এই সময়েই আবার সাল্‌জবুর্গে অল্পাঙ্কিত হচ্ছে বিখ্যাত কন্টিনেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল; একের আকর্ষণে এসে অগুটিও দেখে যাবার চেষ্টা আছে সবারই। ‘ওবারামারগাও’তেও ভীড় হয়েছে তাই আশাতিরিক্ত। আমাদের কথাই ধরা যাক—রোমের বিপুল হোলি-ইয়ার-উৎসবের মধ্যে পোপকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিলো, কিন্তু সাল্‌জবুর্গে গিয়েও ফেস্টিভ্যালের টিকিট পেলুম না। তাই বিশ্ববন্দিত নাট্য “প্যাশন প্লে” দেখবার স্মরণে অবহেলা করতে পারিনি কিছুতেই।

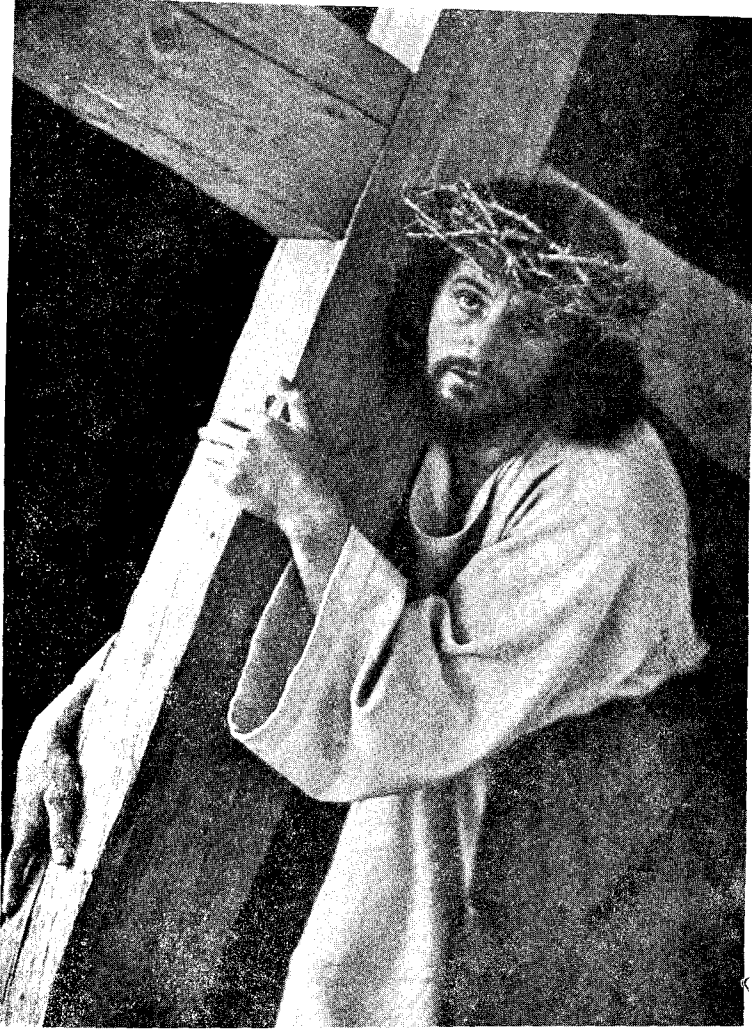
রাশি রাশি লাল আপেল আর হলুদ পীচফলের ভারে নশ্র গাছের সারি দু’ধারে নিয়ে পরদিন আমরা বেরিয়ে পড়লুম আল্লসের সবুজ অরণ্যপথে। মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো দুধ-সাদা ঝর্ণা উচ্ছল-গতিতে কোচের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে, আবার হঠাৎ অবাক করে দিয়ে মিলিয়ে যায়। অগষ্ট মাসের রোদ পান্না-রঙে ধুয়ে স্বচ্ছ করে তুলেছে আকাশকে।

মাঝে বাস থামলো। ভিসা-পাসপোর্ট-কার্টম্‌স্‌এর বামেলা। এমনি তিনবার—ফ্রঁই বর্ডারে, অস্ট্রিয়ান বর্ডারে আর জার্মান বর্ডারে। সন্ধ্যায় বাস পৌঁছলো ‘ওবারামারগাও’ এনেমেই অবাক। এ কি জার্মানির কোনো গ্রাম? না প্যাালেস্তাইনেরই? পোর্টার থেকে ফু করে গৃহস্বামী পর্যন্ত, পথে ঘাটে যত লোক দেখা গেল, দাড়ি গৌফ বাবরি-চুলে পুরোধর ছ’হাজার বছর আগেকার বাইবেলে-পড়া দেশের মানুষ। মেয়েদের লম্বা সোণালী চুল, পরণে সাধারণ যুরোপীয় পোষাকের পরিবর্তে ঢিলেঢালা প্রাচীন য়িহুদী ঢঙের জামা কাঠের বাড়ীগুলিতে বিচিত্র কারুকার্য—কিছু খোদাই, কিছু সাদা রঙের আলপনা। বাড়ী ক্ষেত বাগান মানুষজন সব মিলিয়ে গ্রামটি এত বেশি চিত্রকল্প, যে বাস্তবকেই বিখান করা অসম্ভিকর। পাহাড়ের আড়ালে-ঢাকা গ্রামটিতে আধুনিকতার কোনো ছাপ পড়েনি। গাড়ী নেই। মালপত্র বয়ে নিজেরা ফ্রাউলিন কোলবেনারের সঙ্গে যে বাড়ীটিতে গিয়ে পৌঁছলুম, তার নাম “Landhans”—বাড়ীর সামনে ছুটি আপেল গাছ রাঙা টুকটুক করছে শুধু বাইরেই নয়, ভিতরেও নতুনস্ব। অর্থাৎ পুরণো ধরণ। সিলিং ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক লম্বা কাঠের বাস্ক। এ বাড়ীতে একমাত্র হীটার শুনলুম এটি। কাঠে জ্বলে ইলেক্ট্রীক হীটারের চলন হয়নি এখনো, গ্যাস তো নয়ই। সন্ধ্যা না হতেই আঙন পোহানোর আসর জমেছে তাই খাবার ঘরে। সেই আড্ডাতেই এখানকার সঙ্কারহয় উদঘাটিত হ’লো।

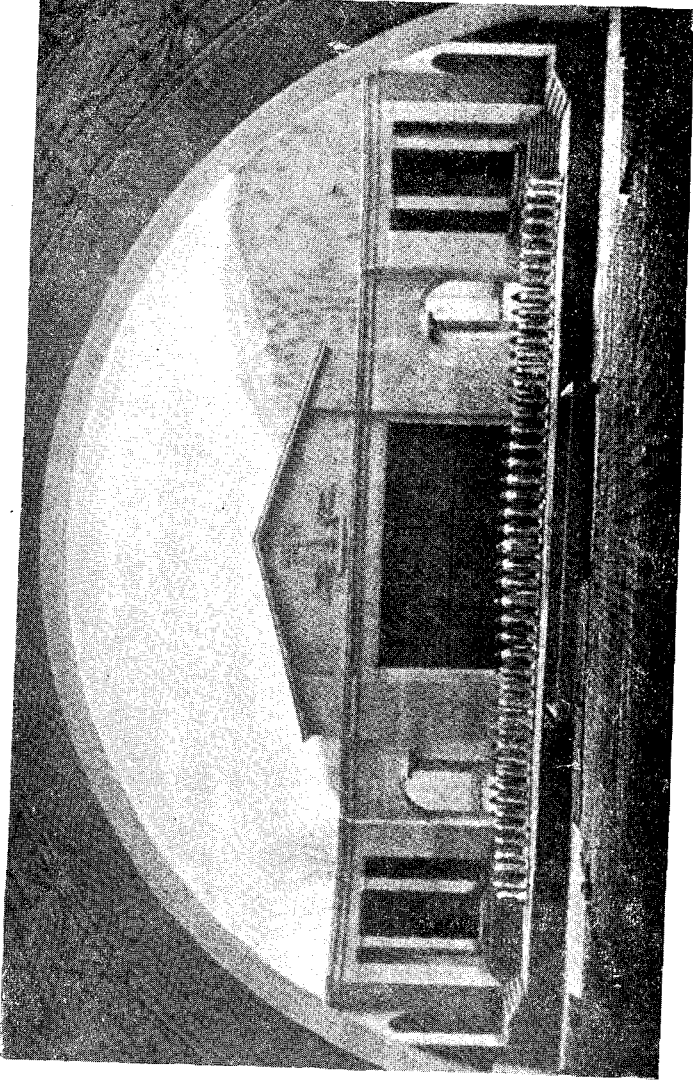
‘প্যাশন-প্লে’ শুধু দশ বছর অন্তর তিনশো বছর পূর্বের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা নয়, এ ব্রতের আরো নিয়ম-আচার আছে। এক বছর আগে ভূমিকা নির্বাচন করা হয় অভিনেতার ব্যক্তিগত চরিত্র অনুযায়ী। এবারে বীশুখুঁঠে সেজেছেন একজন শিল্প-শিক্ষক আধা-সন্ন্যাসী মানুষ। কাইফাসের ভূমিকায় আছেন এক মাংসবিক্রেতা কসাই। জুড়া হয়েছেন গ্রামের কুখ্যাত রূপণ লোকটি। ভূমিকা নির্বাচনের পরে দাড়ি গৌফ চুল রাখতে আরম্ভ করেন এরা, ‘প্যাশন-প্লে’তে পরচুলা ইত্যাদি সকল মেক্ আপ নিষিদ্ধ। এখন থেকেই ব্রত শুরু। মদ মাংস মিথ্যাভাষণ এমন কি ধূমপান পর্যন্ত পরিত্যাগ করে, এক বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেন সবাই চিত্তশুদ্ধির অভিপ্রায়ে।

গ্রামীন্ মানুষগুলির বিষয়কর সারল্য তাদের কথা অবিশ্বাস করার পক্ষে বাধা হ’ে দাড়িয়েছিল। শিল্পপ্রধান গ্রাম ‘ওবারামারগাও’। অধিকাংশ বাসিন্দাই খোদাই করে মূর্তি গড়ে বা ছবি এঁকে জীবিকা অর্জন করেন। অল্প ক’দিনেই এই সত্যটি উজ্জ্বল হ’ে উঠেছিলো যে, অত্যন্ত নিকটবর্তী সহর ম্যানিক পর্যন্ত যুদ্ধ পৌঁছলেও এই গ্রাম আঙ্গ উপায়ে অক্ষত রয়ে গিয়েছে শুধু দেখে নয়, মনেও। যুদ্ধের বিষ এ-গ্রামের মনকে কলুষিত করতে পারেনি।

ভাগ্য স্মপ্রসন্ন। টিকিট মিলে গেল পরের দিনই। অভিনয় স্ক্র সন্ধ্যা সাড়ে আটটায়, শেষ সন্ধ্যা ছটায়। মাঝে ছ’ঘন্টা বিশ্রাম। গ্রামশুদ্ধ প্রত্যেকেই অভিনয়



ঈশবাহী ষীশদ



ডুবানামারগাউ রংগমণ্ড

অংশ গ্রহণ করেন, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক। প্রত্যেক অভিনয়-দিনের ভোরে ছ’টায় তাঁরা সবাই গির্জায় মিলিত হয়ে উপাসনা করেন। নাটক আরম্ভ হয়েছে ২১শে মে রবিবার, শেষ হবে ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার। সপ্তাহে দু’দিন হ’বে। শুনেছি, এ নাটক অনুষ্ঠানের ব্যয় প্রায় দশ লক্ষ মার্ক। আর দর্শকরা ফিরিয়ে দেন তার দ্বিগুণ। অভিনেতার সংখ্যা বারোশো হ’লে, দর্শকের সংখ্যা সহজেই অল্পমেয়। বিরাট এ্যাম্ফিথিয়েটার। তৈরী হয়েছে ১২০০ খুণ্ডাঙ্গে। তার আগে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনেই এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হ’তো। এখন দর্শকদের মাথার উপর আচ্ছাদন থাকলেও, নাট্যপীঠ কিন্তু আকাশের নীচে। ঝড়বৃষ্টি এসে পড়লেও অভিনয় বন্ধ হয়না। পাঁচ হাজার দু’শো আসন সংযুক্ত প্রেক্ষাগারটির বিশালতা বোঝা শক্ত নয়। কিন্তু নাট্যপীঠের বিরাটত্ব সঠিক অনুমান করতে পারিনি প্রথমে। পরে যখন সাত আটশো মাহুঘের বিপুল ক্ষিপ্ত জনতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে অসংখ্য ঘোড়সওয়ার সৈন্য এসে উপস্থিত হয় একটি দৃশ্যে তখন মঞ্চের মঞ্চত্বই অবাস্তব মনে হয়েছিলো। মঞ্চটির পিঠ ঘেঁষে খাড়া হয়ে উঠেছে তুষার মৌলী আল্‌স্—পটভূমিতেই এক আশ্চর্য স্বাভাবিকতা। ‘প্যাশন-প্লে’র সবচেয়ে বড়ো আবেদন এর সাবলীল স্বাভাবিকতায়। প্রকাণ্ড ক্রুশের ভাৱে অবদমিত যীশুকে একবারও অভিনেতা বলে মনে হয়নি, বিখাসহস্তা জুড়াসের কাতর অহুশোচনা অবাধে হৃদয় স্পর্শ করেছিল। যে দৃশ্যে গাধার পিঠে চড়ে যীশু জেরুসালেমে প্রবেশ করলেন, সেই মন্দির প্রাঙ্গণে বে-আইনী ব্যবসাদারী বন্ধ করবার বিরাট দৃশ্যটিকে অগুস্তি এক বাঁক পায়রা, আর কতগুলি কুকুর বিড়াল এক বিষয়কর স্বাভাবিকতা এনে দেয়। অপেশাদার গ্রাম্য মাহুঘদের অভিনয়মানের উচ্চতা সহরে সমালোচকের চোথকে হার মানাতে পারে অনায়াসে। এদের অভিনয় পদ্ধতির ক্লাসিক রূপটি যথাসম্ভব বজায় রেখেছে, নাটকের প্রার্থনাগুলির প্রাচীন স্মরণভঙ্গী, পঞ্চাশজন গায়কগায়িকার বিশাল ‘কোরাস’—ও প্রোলোগ এপিলোগ ইত্যাদি অংশ। যীশুখুষ্টের জেরুসালেমে প্রবেশ থেকে তাঁর পুনরত্থান পর্যন্ত, তিনখণ্ডে সমাপ্ত নাটকটি আয়তনে বিরাট। মোট পনেরোটি অঙ্ক, ষোলটি গর্ভাঙ্ক ও ছেষটি দৃশ্যে বিভক্ত। মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো কুড়িটি ট্যাবলো আছে। আমাকে সব চেয়ে অভিভূত করেছিলো যীশুর বিচার ও ক্রুসিফিক্সনে অবিশ্বাস্ত মাত্রায় বাস্তব দৃশ্যগুলি। অথচ, এখানে রঙ্গমঞ্চে পশ্চাৎপট ইত্যাদি অবাঞ্ছিত বাহ্যিক ব্যবস্থায় সত্যের মোহহৃষ্টির প্রচলন নেই।

এক অলৌকিক করুণার স্মৃতি এই বিচিত্র অভিনয়োৎসব। যীশুখুষ্টের রক্তাক্ত তপস্বী মানবতার কল্যাণ আলায়ে মাহুঘের মনকে পথ দেখিয়েছিলো। সেই মহান ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই নাটক আমাদের অধুনালুপ্ত আন্তিক্য বোধকে আৱেকববার জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ব্যর্থতা, অনিশ্চয়তা, সন্দেহ, শঙ্কায় ভরা এ যুগের মানসজগৎ। শূন্যতাবোধের অন্ধকার চরম সত্য বলে প্রতিভাত হয়ে উঠছে অধিকাংশ মাহুঘের মনে। এই কঠোর

নাস্তিবাদী বিংশ শতাব্দিক-মানসিকতাকে কিছুক্ষণের জগৎ বিশ্বাসবোধে আলোকিত :
তোলে, এই সহস্রাব্দিক গ্রাম্য মানুষের একবৎসরের আন্তরিক সাধনা।

“Hallelujah ! To Thee Who hast risen !

Thou hast purchased our salvation with Thy blessed blood !

After death—Eternal Life !

Hallelujah !”

এমিয়েলের জার্নাল ও ত্ববীক্বনাথ

উজ্জ্বল মজুমদার—ষষ্ঠ বর্ষ, কলা

॥ ১ ॥

এমিয়েলের জার্নাল সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এমিয়েলের ব্যক্তিজীবন সম্বন্ধে ছুঁএর কথা বলা দরকার। এমিয়েলের জন্ম জেনেভায় ১৮২১ সালে। অল্প বয়সেই তিনি পিতা মাতাকে হারিয়ে কেমন এক ধরণের স্বপ্নালু বিমর্ষতায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। বয়োরে ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়। পড়াশোনার ব্যাপকতাও ছিল আশ্চর্য। তাই তাঁর দৃষ্টি ছিল ধূসর-প্রবীণ।

এমিয়েলের Journal Intime প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে। এই জার্নাল জীবনে বিভিন্ন সময়ে লেখা। জীবনের অভিজ্ঞতা, নানা রকমের মনন চিন্তন, বই পড়ার রিক্লেঞ্চ ধর্মবিশ্বাস, জীবনদর্শন, অতীতের ও সমসাময়িক কালের ধর্মগুরুদের প্রচারিত জীবনদর্শনের সারা তাঁর নিজের আদর্শের সঙ্গতি ও পার্থক্য—এই সমস্ত মিলে এমিয়েলের জার্নাল গড়ে উঠেছে। এ জার্নাল সাধারণ ডায়েরীর মতো দিনলিপির নিরপেক্ষ বিবরণ নয়। এতে আছে লেখনে আত্মার স্পর্শ। ফরাসী সাহিত্যের (জার্নালটি ফরাসী ভাষায় লেখা) লঘুচপল বুদ্ধিদীপ্ত ভঙ্গি এখানে পাওয়া যাবে না। এমিয়েলের জার্নাল ফরাসী সাহিত্যের এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

জার্নাল পড়তে পড়তে মনে হয় যেন কোনও ভারতীয় ঋষি পরিপূর্ণ মানসিক শক্তি নি নিজের ধ্যান-ধারণা আত্মবিচারণাকে বিশেষ একটি দার্শনিকতার সঙ্গে বর্ণনা করছেন। তার তাঁর স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্যেয। উপলব্ধি তাঁর অতলাস্ত। জ্ঞানের বিস্তৃতি তাঁর উদয়াচল খে অস্তাচল পর্যন্ত প্রসারিত।

অসার বস্তু নিয়ে এমিয়েল কথার প্যাঁচ কয়েন নি। জীবনের নানা সমস্যা জটিল হ তাঁর কাছে দেখা দিয়েছে। কিন্তু স্বসত্তার দীপ্তিকে তিনি অমান রেখেছেন। দৃষ্টতে ধ রেখেছেন অটল শৈল-শাস্তি। তারপর বিশ্লেষণে উত্তোগী হয়েছেন। জার্নাল প্রকাশি হবার পর পরিচয়দান প্রসঙ্গে একস্থানে লেখা হয়েছিল :

'The publication of this volume is the fulfilment of his desire.—The reader will find in it, not a volume of memoirs, but the confidence of a solitary thinker, the meditations of a philosopher for whom the things of the soul were the sovereign realities of existence.'

মনে হয়, দুটি কারণে এমিয়েলের জার্নাল চিরকালের পাঠককে মুগ্ধ করবে। প্রথমতঃ এর মধ্যে হৃদয়-বেদনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ জার্নালে লেখকের বিশিষ্ট ভঙ্গিময় আধুনিক মননের ছাপ পড়েছে।

প্রথম গুণটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। জার্নালে লেখকের ব্যক্তিমনটি পরিপূর্ণ ব্যক্ত। আসলে তিনি রসভিখারী। তাঁর মনটি যেন যা-পাই তাতেই ধগ্ন! তাই আনন্দে নেচে উঠে বলেন—

'A lovely autumn effect. Everything was veiled in gloom this morning, and a grey mist of rain floated between us and the whole circle of mountains. Now the strip of blue sky which made its appearance at first behind the distant peaks has grown longer, has mounted to the zenith, and the dome of heaven, swept almost clear of cloud, sends streaming down upon us, the pale rays of a convalescent sun. The day now promises kindly and all is well that ends well.

Thus after a season of tears, a sober and softened joy may return to us.'

জার্নালের মধ্যে মুগ্ধ—আত্মমুগ্ধ এমিয়েলকে এমন অনেকবার পেয়েছি। প্রকৃতির রঙ-বাহার দেখে এমিয়েলের কবিমন বারে বারেই বলেছে 'এইত'! আর মুগ্ধ কবি মগ্ন হয়েছেন সেই মোহবন্দনা রচনায়। জার্নালে প্রায় সর্বত্রই এই নির্জন ভাবুককে পেয়েছি যার ফলে আধ্যাত্মিক মনন-চিন্তনের প্রকাশেও এক মিষ্টি-মধুর সাহিত্যিক রসের আমেজ পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয় গুণটি তাঁকে এমার্সন, কার্লাইল ইত্যাদি মনীষীদের থেকে পৃথক করেছে। জার্নালে তাঁর উক্তিগুলিতে যে সন্দেহ, ভয়, হতাশা, দুর্বলতার পরিচয় আছে তাতে তিনি সত্যই আধুনিক সন্দ্বিগ্ন মনের প্রতিনিধি। এমার্সন বা কার্লাইলের প্রবন্ধ পড়লে মনে হয় তাঁরা যেন সাধারণ পাঠকের নীরক্ক অন্ধকার জ্ঞানসমুদ্রের এক-একটি আলোকসুস্ত। পাঠকের দিশাহারা মনে তাঁদের উক্তিগুলো যেন বেদবাক্য।

এমিয়েলের জার্নাল পড়লে এমন বেদবাক্য শুনতে হয় না। বস্তুজগতের অনেক জিনিসই

তিনি বুঝতে পারেন না। কোথায় তাঁর বুদ্ধির দৌড় চলে না, কোথায় তাঁর অবিশ্বাস, কোথা তাঁর রহস্যসন্ধানী মন রহস্য নির্ণয়ে অপরাগ—এসব তিনি স্পষ্ট করে খুলে বলেন। তাঁর একা উক্তি উদ্ধার করছি—

‘I have too much imagination, conscience and penetration, and not enough character. The life of thought also seems to me to have enough elasticity and immensity, to be free enough for the irreparable, practical life makes me afraid.’

এমিয়েলের মধ্যে উপলব্ধ সত্যপ্রচারের কোন রকম স্পর্ধা নেই। এমার্গন দি কার্লাইলের রচনাপাঠে লেখক ও পাঠকের মধ্যে অনেকটা ভগবান-ভক্তের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে এমিয়েলের জার্নাল পাঠে লেখক ও পাঠকের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। পূর্বের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ব্যবধানটুকু আছে, পরেরটিতে তাও নেই। এযুগে প্রচারকদের আধিপত্য চলে যাচ্ছে জীবনসমস্তা নিয়ে আলোচনায় panacea বাতলে দেবার যুগ কেটে গেল। জ্ঞানের পরিষ্কার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানা গূঢ়া (complex) দেখা দিয়েছে। তারই ছাপ পড়ে এমিয়েলের জার্নালে।

॥ ২ ॥

নতুন চিন্তা ও ভাবনার খোরাক সংগ্রহের উৎসাহ রবীন্দ্রনাথের ছিল। নইলে তাঁর এ অজস্র সৃষ্টিসম্ভারে এত অভাবনীয় আকর্ষণ থাকতো না। জার্নাল-সাহিত্য এইজগতই তাঁর ভালো লেগেছে। এমিয়েল ছাড়াও তিনি জুবায়ার পড়েছিলেন। ফরাসীদের চিন্তা মৌলিকতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

যাই হোক, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চের একটি চিঠিতে (ছিন্নপত্রের অন্তর্ভুক্ত) তিনি এমিয়েলের জার্নাল পড়বার প্রথম খবর দিলেন। চিঠির অংশটি দীর্ঘ হলেও তা উদ্ধার করতেই হবে।

‘আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লোকেনের ওখান থেকে তার একখান Amiel’s Journal ধার করে এনেছি, যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি ঠিক মনে হয়, তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কছি, এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এই বইটি আমার মনের মতো। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়। কোনোটা ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানারকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই—সেইরকম মানসিক অবস্থায় এমিয়েলের যেখানেই খুলি সেইখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা

ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু এমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সশব্দে এক জায়গায় লিখেছে ; ব-র লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি।’

এমিয়েলের জার্নাল পড়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য যে কোনও পাঠক তার নিজস্ব মত বলে মনে করবে। যাই হোক শুধু পড়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হন নি। জীবনে ও সাহিত্যে এমিয়েলের চিন্তার কিছু কিছু স্ফুলিঙ্গ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণও করেছেন। ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৫) উপন্যাসে নিখিলেশ বলছে :

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেল্ফের দিকে যেতে যেতে বললুম, Amiel's Journal বইখানা নিতে এসেছি।’

কিছু পরে আর এক জায়গায় নিখিলেশ বলছে : ‘Amiel's Journal’ পড়ে আজ আমার কোন ফল হোত না—কিন্তু পঞ্চর এই এক কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখ-দুঃখ হারিয়ে এ পৃথিবী অনেকদূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি-কান্নার পরিমাপ করি।

এতো কেবল Amiels Journal-এর উল্লেখ হোল। রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গারচেতনা যেমন উপনিষদ, বৈষ্ণবকাব্য, মধ্যযুগের মরমিয়া সাহিত্য, প্লেটোর রচনা ইত্যাদির দ্বারা পুষ্ট হয়েছে, এমিয়েলের জার্নালের প্রভাবেও তেমনি। নিখিলেশের আত্মবিলোপী প্রেমের সম্যাস—বিমলার জগ্ন যেমন, দেশের জগ্ন তেমনি—এই ভালোবাসা যে ঈর্ষার পরিধিকে অতিক্রম করে—রবীন্দ্রনাথের এই ভাবটি এমিয়েলের ভালোবাসা ও ঈর্ষার তুলনামূলক মন্তব্যের সঙ্গে হুবহু মেলে :’

‘Love is the forgetfulness of self ; jealousy is the most passionate form of egotism, the glorification of a despotic, exacting and vain ego.’

এছাড়াও এমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ঐক্য দুর্লভ নয়। এমিয়েলের একটা বিশেষ গুণ হোল তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নিরপেক্ষ সমালোচক। পশুপ্রীতি সম্পর্কে এমিয়েলের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে স্মরণীয় :

‘The animal renders a service of utility ; man in return owes it a need of protection and of kindness. In a word the animal has claims on man, and the man has duties to the animal. Buddhism, no doubt, exaggerates this truth, but the Westerners leave it out of count altogether.’

১ রবীন্দ্রনাথের শৃঙ্গারচেতনা : হরপ্রসাদ মিত্র : সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি (২য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য ।

এই নিরপেক্ষ মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের মতো নিরপেক্ষ সমালোচকের ভালো লেগেছিল বলেই তিনি বলেন্দ্রনাথের 'পশুপীতি' প্রবন্ধে গুটুকু হয়তো নোট বসিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও এমিয়েলের দৃষ্টির আশ্চর্য মিল আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জীবনধারার পার্থক্য আলোচনা প্রসঙ্গে এমিয়েল বলেছেন:—

The East prefers immobility as the form of the infinite: the West, movement. It is because the West is infected by the passion for details, and sets proud store by individual worth. Like a child upon whom a hundred thousand francs have been bestowed, she thinks she is multiplying her fortune by counting it out in pieces of twenty sous, or five centimes. Her passion for progress is in great part the product of an infatuation, which consists in forgetting the goal to be aimed at, and absorbing, herself in the pride and delight of each tiny step, one after the other. Child that she is, she is even capable of confounding change with improvement—beginning over again, with growth in perfectness.

উত্তরকালে 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই দৃষ্টিতেই ছ-দেশের তুলনা করেছেন:

'সমুদ্রের লোকেরা ভগবানের ব্যাপ্তির দিকটাকেই একেবারে একান্ত সত্য করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহারা সমাপ্তিকে কোনমতেই মানিবে না, এই তাহাদের পন। এইজন্ম বাহিরের দিকে তাহারা যেমন কেবলই আহরণ করিতেছে অথচ সন্তোষ নাই বলিয়া কিছুকেই লাভ করিতেছে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের দিকেও তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে সত্যের মধ্যে গম্যস্থান বলিয়া কোন পদার্থ নাই, আছে কেবল গমন। কেবলই হইয়া উঠা, কিন্তু কী যে হইয়া উঠা তাহার কোনো ঠিকানা কোনোখানেই নাই।...এইজন্মই দেখিতেছি, যাহারা চরমকে না মানিয়া কেবল বিকাশকেই মানিতেছে তাহারা উন্নত হইয়া উঠিয়া অপঘাতমুহুর অভিমুখে ছুটিতেছে...। 'জলস্থল'।

রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের তুলনায় প্রাচ্যের স্থিতি আর প্রতীচ্যের গতি—এই দুয়ের সম্বন্ধে যে নতুন প্রগতিবাদী জীবনাদর্শের কথা বলেছেন, এমিয়েল তেমন কোন ইঙ্গিত দেন নি। তা না দিলেও উভয় দেশের জীবনধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যটুকু রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এমিয়েলের মধ্যেও পাচ্ছি।

ভগবৎ-ধারণা বা পূর্ণতা-ধারণা সম্পর্কে এমিয়েলের মন্তব্য অনেকটা প্রাচ্যমুখী। তার কারণ তিনি ভারতীয় দর্শনে দীক্ষিত। আর রবীন্দ্রনাথ তো ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের উত্তর সাধক। কাজেই এমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতা সম্পর্কে প্রায় একই রকম ধারণা পোষণ করেন। অনন্তের পিপাসা দুজনেরই সমান। এমিয়েল বলছেন:

'The thirst for the infinite is never appeared. God is wanting.'

আর রবীন্দ্রনাথের কাছেও :

'The finite represents to us the tension of the self to become the the infinite. The universe is the struggle of the finite to reach the infinite. It is a play of hide and seek between the two—God and man.'^২

পাশ্চাত্য Theistsদের মতো এমিয়েল সীমিত ভগবানকে বিশ্বাস করেন না। লী বিনিংস কিংবা মিলের মতো তিনি ভগবানকে খণ্ডতার মধ্যে না দেখে তাঁকে অসীমরূপে দেখেছেন। Theistsএর মত হোল—'God is the virtue of the virtuous, and there is another opposing Him, the wickedness of the wicked.' কিন্তু এ ভগবান তো Absolute নয়। Absoluteএর একটা দিকমাত্র। ভগবানকে Absolute বলা মানেই তার পূর্বভূমিকাস্বরূপ সত্যমিথ্যার দ্বন্দ্বকে মেনে নেওয়া যার নির্বন্দ পরিণতি ওই অসীমতায়। এমিয়েল ও রবীন্দ্রনাথের ভগবান হোলেন Absolute। আর মানুষ হোল finite-infinite। এই হোল বাট্টাও রাসেলের 'Freeman's worship'।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যতখানি 'Freeman' এমিয়েল ততখানি নন। রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে দেখেছেন বিশ্বমানবরূপে। এই বিশ্বমানব নিজের মধ্যে একটা সক্রিয় শক্তি। তিনি নিজের মধ্যে নিরন্তর সমন্বয় ঘটানছেন অন্তহীন ব্যক্তিবৈচিত্র্যের। তিনি মন, প্রাণ ও তহু থেকে রচনা করে চলেছেন বিবর্তনশীল সৃষ্টিপরম্পরা। এমিয়েল এতদূর এগোন নি। এমিয়েল তাঁর Absoluteকে এতটা নিকট ক'রে তুলতে পারেননি।

Absoluteকে জীবনে জীবিত করতে গেলে বার বার ব্যর্থ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাতে হতাশ হননি। কারণ তিনি জীবনকে করেছেন অমৃতস্বের পাথেয়। মৃত্যুকে করেছেন অনন্ত জীবনের উৎসধারা। কিন্তু ব্যর্থতার হতাশাই এমিয়েলকে বড় করণ ক'রে বাজে। তাই আদর্শ অহুবর্তনের যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েও সমস্ত চিন্তার ওজ্জ্বল্যকে এমিয়েল বিষণ্ণতায় ধূসর করে তোলেন। ঠিক pessimist (অনেকের মতে) বললে তাঁকে বোঝানো হয় না। তাঁর মানসিকতা optimism-pessimismএর আশ্চর্য অদ্ভুত সমন্বয়। তাই রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতাকে বরণ করেছেন। এমিয়েল সীমার বেদনায় নিরাশ হয়ে অসীমকে স্বীকার করেছেন— অসীমের প্রতি উনুথ হয়েছেন।

কাজেই রবীন্দ্রনাথ এমিয়েল পড়ে মুগ্ধ হলেও যেটুকুতে তাঁর উপলব্ধি সায় দেয় কেবল সেটুকু গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের দর্শন যে তাঁর মন ও আত্মার পরিণতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা! বারগঁসি কি ফ্লোয়েবেলের প্রভাবের মতো এক্ষেত্রেও বলা চলে, কোন কোন বিষয়ে সহমর্মী একজন ব্যক্তির প্রভাবে তিনি তাঁর নিজের চিন্তাগুলিকে খুঁজে পেয়েছিলেন।

২ The Philosophy of Rabindranath Tagore—S. Radha Krishnan

চেষ্টরটন ও ইংরেজী সাহিত্যের এক অধ্যায়

পল্লব সেনগুপ্ত—দ্বিতীয় বর্ষ, কলা

গিলবার্ট কীথ্ চেষ্টরটন ; ছোট করে জি, কে, সি—মাত্র তিনটি অক্ষর। ইংরেজী ভাষার ইতিহাসে এর জুড়িদার নাম বোধ হয় আর একটিই আছে। সেটি হোল—জি, বি, এন্—জর্জ বার্ণাড শ। আরো মজার ব্যাপার এই যে, এঁরা দু'জনে সমসাময়িক আর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েও পরস্পরের বিরোধিতায় ছিলেন পঞ্চমুখ।* সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যের আসর জাগিয়ে রেখেছিলেন এঁরা আর এঁদের সংগেই ছিলেন গলসওয়ার্ডী, ওয়েলস আর হিলায়ার বেলক। এ ছাড়াও ছিলেন সমরসেট মম আর মরিস ব্যোরিং ; তবে মম্ এবং ব্যোরিং এঁদের সমসাময়িক হলেও, চিন্তাধারার দিকে এঁদের সংগে তাঁদের কোনই মিল ছিল না। সমকালীন সাহিত্যে লেখনীর মাধ্যমে ইংলণ্ডের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে যে তুমুল আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন শ, চেষ্টরটন প্রভৃতির—মম এবং ব্যোরিং তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

তখন ইংলণ্ডের সাহিত্য চেতনার স্বরূপ হয়েছিল নব জাগরণ—প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ওপর তীব্র কশাঘাত হানছেন শ, ওয়েলস আর গলসওয়ার্ডী। জি, বি, এন্, তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে তীক্ষ্ণ বিক্রপ করছেন রক্ষণশীল ভিক্টোরিয়ান যুগের আচার সংস্কারকে। গলসওয়ার্ডীর লেখার মধ্যে পাওয়া যায় ক্ষয়িষ্ণু সেইসব সংস্কারের শেষ অধ্যায়ের পরিচয়।

এক দিকে এঁরা আর এক দিকে ছিলেন ওয়েলস্। শ এবং গলসওয়ার্ডী যখন তীব্র শ্লেষের অস্ত্রে প্রাচীন সংস্কারকে আঘাত করছিলেন, ওয়েলস্ তখন স্বপ্ন দেখছিলেন নোতুন পৃথিবীর। সমকালীন সমাজ-সমস্কার সমাধান তিনি দেখছিলেন বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার মধ্যে। তাঁর লেখার মধ্যে আমরা দেখি নোতুন পৃথিবীর আশাময়ী কল্যাণী রূপ, সে পৃথিবীতে আজকের রক্ষণশীল সমাজের ঠাই নেই, আজকের অগ্রায় শাসন শোষণ নেই, বিজ্ঞান-সাধনার পথে সেই সমাজ পরম অগ্রগতিশীল।

ঠিক এই যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভাব হোল চেষ্টরটনের, তিনি প্রচলিত সমাজবিধির পক্ষে দাঁড়িয়ে অভিযুক্ত করলেন যন্ত্রবিজ্ঞান-প্রভাবিত আধুনিক সমাজের ব্যবস্থাপনাকে। আগত প্রায় সেই যুগকে তিনি প্রতিপন্ন করতে চাইলেন মাহুঘে শুভ প্রগতির চরম প্রতিবন্ধক রূপে। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই ঘোষণা করলেন তিনি, যে মাহুঘের কল্যাণ হবে তখনই, যখন মাহুঘ পারস্পরিক সহানুভূতি ও শুভবুদ্ধির আশ্রয় নেবে। এই সহানুভূতিপূর্ণ শুভবুদ্ধির সংগেই তিনি শ্রদ্ধা জানালেন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক গৌরবময়ী মধ্যযুগীয় সমাজ-বিধিকে।

ঠিক এই সময়ে চেষ্টরটন তাঁর এই চিন্তাধারার সমর্থক ও সহকর্মী হিসেবে পেলেন হিলায়ার বেলককে। দু'জনে ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু, দু'জনের চিন্তাধারাও একমুখী, কিন্তু ওঁরা আলাদা হয়ে পড়েছিলেন ভাব-পরিবেশনের ব্যাপারে। চেষ্টরটনের লেখায় গভীর কথার

* আজও 'টাইমস্' লিটেরারি সাল্লিমেণ্টের পাতায় দুই বন্ধুর বিবাদ স্মরণীয় হয়ে আছে।

ওপরে সরস মেজাজী ঠাট্টার প্রলেপ মাখানোর যে কৌশলটা দেখি, বেলকের লেখায় তার অভাব একান্ত ভাবেই। চেষ্টিংটন জীবনের সহজ উন্মেষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অভিজ্ঞতা আর প্রাচীন ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু রক্ষণশীল বেলক চেয়েছিলেন, পুরোনো দিনকেই সরাসরি আঁকড়ে ধরে রাখতে, আর তার উপায় হিসেবে তিনি নিয়েছিলেন আধুনিক যুগের সর্বাঙ্গিক প্রগতির বিরোধিতা করাকেই।

ইতিহাসের গতি কিন্তু চিরদিনই দুজ্জ্বল। চেষ্টিংটনের মৃত্যু এখনো খুব বেশীদিন হয় নি, এরই মধ্যে আমরা ভুলতে বসেছি তাঁর লেখাকে। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে তিনি তাঁর পাঠকদের হাতে যে সমাদর পেয়েছিলেন, সচরাচর কোন লেখক জীবদ্দশায় তা পান না। তাঁর মতের সংগে অনেকেরই হয়ত মত মেলেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন, ইংরেজী কৌতুক-সাহিত্যে অবিসম্বাদী এবং একচ্ছত্র সম্রাট—জিরোমের পরই একজন উপসম্রাট বিশেষ। বেপরোয়া হাসি হাসিয়ে তিনি শুনিয়েছেন গভীর বক্তব্য—খাঁরা তা বুঝলেন, তাঁরা বুঝলেন, খাঁরা বুঝলেন না—তাদেরও লাভ হল ঐ অনাবিল হাসিটুকু!

চেষ্টিংটনের লেখার এই মজলিসী ও মেজাজী ভাবটি অবশ্য তাঁর নিজের স্বভাবেরই প্রতিফলিত রূপ। তিনি নাকি এমনই আড্ডাবাজ আর গালগল্প প্রিয় ছিলেন যে, প্রকাশকদের তাগাদায় চেষ্টিংটন-গৃহিণী মাঝে মাঝে তালাবন্ধ ঘরে স্বামীকে আটকে রেখে, তবেই কলম চালাতে বাধ্য করতেন।

অজস্র গল্প কবিতা আর উপন্যাস লিখে গেছেন চেষ্টিংটন। প্রাণখোলা হাসির ফুলঝুরি ফুটিয়ে তিনি মাংস করে দিয়েছেন তাঁর পাঠকদের। শুধু লেখার ভঙ্গীই নয়, তাঁর প্লটও কি অদ্ভুত সব। একের পর এক তিনি লিখে গেছেন, নেপোলিয়ন অব নটিং হিল, কি ক্লাব অব কুইয়ার ট্রেডস, দি ম্যান হু ওয়াজ এ থার্ডে, সেন্ট ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি—এ ছাড়াও এর আগে পিছে মাঝে আছে আরও অনেক। লেখার অভিনবত্বে ইফিয়ে উঠেছিলেন তাঁর পাঠকেরা কিন্তু তবু তাঁরা চাইতেন আরও, আরও নোতুন!

কিন্তু খ্যাতির মতো খামখেয়ালী জিনিষ আর কিছু নেই, তাই চেষ্টিংটনের লেখার আদর আজকে ফুরিয়েছে। ট্রাজেডীর চেয়ে সরস সাহিত্য কমদিন টেকে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে এত তাজাতাড়ি চেষ্টিংটনের লেখা বিশ্ব্তির অন্ধকারে তলিয়ে যাবে এ অতিশয় দুঃখের। তাঁর রূপার্টগ্র্যান্ট আর কোনওদিন সাহিত্যের বৈঠকখানায় ঢুকে মারপিট বাধাবে না জানি, তবু তাঁর এবং তাঁর বন্ধুদের এত কালের কীর্তিকলাপ কি আমরা এত সহজেই ভুলে যাবো? সারলক হোমসের স্বযোগ্য প্রতিদ্বন্দী গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউনের বিচিত্র কাহিনীগুলি—অমূল্য বাজে জিনিষ ‘ট্রিমেণ্ডস ট্রাইফলসের’ সেই সমস্ত সরস প্রবন্ধ, কিংবা ভাষা ও ভঙ্গীর তীক্ষ্ণ সরসতায়, আর ছন্দের কসরতে যা কিপলিং-এর চেয়ে কম যায় না, ‘ব্যালাড অফ দি হোয়াইট হর্স সংগ্রহের’ সেই কবিতাগুলি...তাও কি ভুলে যাবার জিনিষ?

বয়সের মতামত। প্রকৃতির বিশ্লেষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানকেই অনুসরণ করেছেন।

দর্শনের ভেতর দিয়ে প্রকৃতিকে যেভাবে দেখা হয়েছে তার সংগে প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক-রূপের বিশেষ কোনও অন্তর্নিহিত পার্থক্য নেই। বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে দেখছেন বিভিন্ন পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে। বস্তুর বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব এসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকেও অন্তর্ভুক্ত করছে। কেননা আমরা আগেই দেখেছি যে বিভিন্ন ধর্মের মধ্য দিয়েই বস্তুর অস্তিত্ব পরিস্ফুট হচ্ছে এবং এই ধর্মগুলি বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার দ্বারাই বিশেষিত করা সম্ভব। যেমন, আলোকের বিসরণ (Diffraction) প্রমাণের জন্ম যে ধরণের পরীক্ষার দরকার তা নিশ্চয়ই আলোকের কণিকাদর্ম প্রমাণের জন্ম নির্ধারিত পরীক্ষা থেকে আলাদা হবে। সুতরাং, এ রকম কোনও একটি পরীক্ষা থেকে বস্তুর যে ধর্ম নির্ণীত হচ্ছে তা থেকে বস্তুর যে রূপ গড়ে তোলা হ'বে তা অসম্পূর্ণ হ'তে বাধ্য এবং এ রকম বিভিন্ন রূপস্বজন পরস্পরবিরোধী হওয়াও অসম্ভব নয়। এই ভাবেই আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তুর একটা দ্বৈতরূপ দেখা দিয়েছে, কোথাও বস্তু কণিকার মত ব্যবহার করছে কোথাও বা আবার তরংগধর্ম প্রকাশ করছে। সুতরাং, বস্তুর “আসল” রূপ কোনটা, এ রকম ধরণের একটা প্রশ্ন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে, বস্তুর রূপকল্পনাই একমাত্র সম্ভব, তার বাস্তবতা যাচাই করা সম্ভব নয়, কারণ বাস্তবতা বলতে আমরা যা বুঝি তার কোনটাই আরোপ করা সম্ভব নয়। ধরা যাক, আমরা একটা গতিশীল ইলেকট্রনের উপর পরীক্ষা চালাচ্ছি। গতির দরুন ইলেকট্রনটি তার চারিদিকে বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিক্রেণের সৃষ্টি করছে এবং এই বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরংগেরই বিভিন্ন গুণাবলী আমরা নির্ণয় করছি। এই বিভিন্ন গুণাবলী আমরা এমন একটা কণিকার উপর আরোপ করছি যার একটা নির্দিষ্ট ভর ও তড়িতাধান আছে, তাকেই আমরা ইলেকট্রন বলছি। এভাবেই প্রকৃতির বিভিন্ন আদিম কণিকাগুলির উদ্ভব হয়েছে।

মহাবিশ্বের গাণিতিক ও তত্ত্বগত রূপ নির্ণয় করবার জন্ম আধুনিক যুগে বহু বিজ্ঞানী ব্যাপ্ত আছেন। স্থিতিশীল বিশ্ব, ক্রমবর্ধমান বিশ্ব, সংকোচন-প্রসারণশীল বিশ্ব ইত্যাদি নানাবিধ রূপকল্পনা গাণিতিকমতে সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে আমরা দেখব যে, কোন মতবাদ পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের সংগে ভালভাবে মিলছে—একমাত্র সেই মতবাদটিকে আমরা বৈজ্ঞানিক বিচারে সঠিক ব'লে ধরে নেব। একমাত্র এই একটি উপায়েই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মতবাদের তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব এবং কোনটা “আসল” এবং কোনটা নয়, এ প্রশ্নটার একমাত্র এখানেই কিছুটা যৌক্তিকতা আছে। সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেই অধিকতর স্পষ্ট বলে মেনে নে'ব যা বিভিন্নমুখী ঘটনাধারাকে অধিকতর স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। প্রকৃতির সেই রূপকল্পনাই অধিকতর বাস্তব যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে অধিকতর সংলগ্ন (Coherent) এবং অন্তর্হীন দেশকালের মধ্যে বিস্তৃত প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থ ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক রূপারোপ কেবলমাত্র তখনই যুক্তিসংগতভাবে সম্ভব।

শেষ কথাটির শেষ বেই

অধ্যাপক ডাঃ শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

ঠাকুরদার আমলে শুনেছি আগে এই কোলকাতায় ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়ীর দারুণ কদর ছিল। এখন সে কথা ভাবলেও মজা লাগে—গল্পকথার সামিল। রকেটের যুগে দুর্দাম গতিবেগের মাঝে এ যেন নির্মম পরিহাস। কিন্তু কতটুকুইবা সময়ের এই ব্যবধান—এরই মধ্যে কি বিরাট পরিবর্তন। শুধু কি এই একটি বিষয়ে? তামাম ছুনিয়াটার চেহারা দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। আর ছুনিয়াদারিটা বিচিত্র হয়ে উঠছে। আরও অনেক অনেক বছর আগে, যখন মানুষ গিরি-গহ্বরে বাস করত তখন তার চাওয়া-পাওয়ার সীমানা ছিল নিতান্ত ক্ষুদ্র—নেহাত বেঁচে থাকবার গণ্ডীর মধ্যেই সবকিছু নিঃশেষিত হয়ে যেত। তখন শুধু প্রাণ রাখতেই প্রাণান্ত।

সেইরকম যদি আধা-আলো আধা-অন্ধকারের কোন আদি-মানুষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা যেত—ছুনিয়াটা চলছে কেমন?

* * * *

নিশ্চয় উত্তরটা খুব ঘোরাল হোতো না। প্রথম নম্বর ভদ্রলোকের কথা বলার পাঠ ছিল না। আর দ্বিতীয়তঃ বলবারও বিশেষ কিছু ছিল না। কোনরকমে খাচ্ছি দাচ্ছি পাথরের তলায় ভয়ভাবনায় বেঁচে আছি। এইটুকুই যথেষ্ট। তার বেশী খবর দেবারও নেই—নেবারও নয়।

* * * *

কিন্তু আজ? যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা যায়—সব খবর?

তার উত্তর আর যাই হোক, নিশ্চয়ই একটা নয়। কত ফ্রন্টের কত খবর। হোম-ফ্রন্ট, অফিস-ফ্রন্ট, বাজেট-ফ্রন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য, দেখা যায় এসব ফ্রন্ট থেকে আনা প্রায় সব খবরই কমবেশী বিজ্ঞান-সন্দেহ। কারণ এখন আমরা জেনে কিম্বা না-জেনে, বুঝে কিম্বা না-বুঝে, সবাই একএকজন ছোটবড় বিজ্ঞানী। এ বিজ্ঞানী হতে বিজ্ঞানের পাস দিতে হয় না। আজকের বিজ্ঞানসম্মত সমাজে থাকতে হলেই এ বিশেষ-জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। এ ছুনিয়ায় এমন পরিবর্তন বয়ে আনবার ভগীরথ হোলো বিজ্ঞান। ভাটভাড়া, ভবানীপুর ভিয়েনা তাতে ভাসে। অবশ্য কমবেশী।

* * * *

সাত সকালে এল্‌গামের চিংকারে ঘুম ভাঙে। ঘড়ির কাঁটার দিকে চাইবার জো নেই, যতক্ষণ না নাকের ডগায় চশমাটা বসান হচ্ছে। চোখের ভিতর জন্মে-পাওয়া যে লেন্স আছে তার রেটিনার উপর সোজাভাবে ছায়া ফেলতে পারে না। তাই এই বিজ্ঞানের দেওয়া কাঁচের

লেন্স দিয়ে সেটা স্খরে নেওয়া। অগত্যা বিছানা ছাড়া। কোথায় ছিল বর্মার বনে সেগুন গাছ—তারই অদ্ভুত রূপান্তর এখন এখানে খাটে—আসবাবে। ছিল তুলো—যাকে তুলে এনে একেবারে তুলনাহীন করে দেওয়া হোলো, এমন বিছানা করে এমন এমন চাদর করে। মাহুষের হাতে বিজ্ঞানের ফলে এমন সব দশা। এখন আর দাঁতন নয়—দাঁতনের গুণ-সম্মত মাজন। সাওয়ারের তলায় গঙ্গা না গিয়ে গঙ্গা-করা। গঙ্গার জল টালা ঘুরে দিব্যা টালিগঞ্জ চলে আসে। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার ফল। তারপর দার্জিলিং-এর মনোরম চায়ের কাপে চুমুক—তখন সব শান্তি। কোথায় পাহাড়ের পাদদেশে গঙ্গান চা-গাছের পাতা তুলে, তাকে সেকে প্যাক করে দেশবিদেশে পাঠান। প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গেকার নির্ভেজাল সঙ্গী হোলো পাট-না-ভাঙ্গা আনকোরা টাটকা খবরের কাগজ। বেঁচে থাক টেলিপ্রিন্টার ও রোটারী। তাদের সাহায্যে ছুনিয়ার খবর ঘরে ঘরে টেবিলে টেবিলে। ছুহাতের মাঝে তখন কামাক্ষা কামাস্কাটকা, ক্যালিকোরনিয়া আর কোলকাতা একেবারে একাকার। ওদিকে রেডিওতে ঈথারে ভেসে আসছে এত কথার হুড়োহুড়ি।

রাস্তায় নামলেও বিজ্ঞানের হাত থেকে রেহাই নেই—সেখানেও বিজ্ঞানের সজাগ পাহারা। ডানদিক নয়—বাঁ দিক ঘেঁষেই চলতে হবে। লাল হলদে-সবুজ আলোর লুকোচুরিতে রাস্তা খোলা-বন্ধ। রকমারি সব স্বয়ংগচ্ছয়ান। বিচিত্র ফরমাসে বিভিন্ন জিনিসের উমেদারী। শিল্পে যা সাফল্য, যন্ত্রের যে নৈপুণ্য তা তো সবটুকুই বিজ্ঞানের। দশটা হাতের কাজ এখন একটা যন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট।

* * * *

শুধু কেতাব দুঃসস্ত জ্ঞানই বিজ্ঞান নয়। ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ-জ্ঞান অর্থেও বিজ্ঞান। লোক খাওয়ানর জগ্রে পটলের দোরমা আর লোক মারবার জগ্রে হাইড্রোজেন বোমা। ছুটো জিনিস তৈরী করতেই চাই কেরামতী বুদ্ধি। একটা রান্নাঘরে অগ্নিটা ল্যাবোরেটোরীতে। ল্যাবোরেটোরিও কি কম কিছু রহস্যখানা! দোরমা তৈরী করতে সময় আর বুদ্ধির দরকার এতটুকুর। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার বেলায়? অনেক অনেক গুণ বেশী। এ শুধু বেছে বড় সাইঞ্জের পটল আনলেই চলে না। অনেক সাধ্য সাধনার পর তবে জানা গেছে হালকা ধরণের লিথিয়ামের উপর নিউট্রন-কণিকা বর্ষণ করলে হাইড্রোজেন ৩ ও হাইড্রোজেন ২ তৈরী হয়। যা আবার এই দুঃসস্ত হাইড্রোজেনে ফিউসান হয়ে প্রচুর শক্তির সঞ্চার হয়। এই দ্বিতীয় বিস্ফোরণের ফলে একখানি নিউট্রন কণিকার উৎপত্তি হয় যা অবিলম্বে ইউরেনিয়াম অ্যাটম ভাঙতে আরম্ভ করে এবং প্রভূত শক্তির সঞ্চার করে। এ গুরু বিজ্ঞানের ভারি কথা। কিন্তু সোজা জিনিসেও বিজ্ঞান থাকে—অগ্নবকম্ ভাবে। পান সাজতে ঠিকঠিক চূণ-খয়ের দেওয়ালে যৎসামান্য বিশেষ জ্ঞানের কৃতিত্ব আছে। যার তা নেই—তার হাতে গাল পোড়ে। তেমনি ঝাল লুন মিষ্টির হাত থাকার যে দক্ষতা সেটা রান্না-বিজ্ঞানের ভিতর পড়ে। এক একজন দ্রোপদী তাই অলিখিত বিজ্ঞান-শিল্পী।

* * * *

দই পাততে দহল কিষা বীজাণু মারতে ব্লিচিং পাউডার দেওয়ায় যতখানি, বড় মেশিন চালু রাখতে বল বেয়ারিংএ তেল দেওয়ায় কিষা স্টেথিস্কোপ বসিয়ে বুকের ভাষা বুঝার চেষ্টায় নানারকমের বিজ্ঞান আছে। চুলচেরা বিচার করলে দেখা যাবে কিসে না এখন বিজ্ঞান স্পর্শ করেনি। ঠাণ্ডায় গরমে, বার্কিক্য-যৌবনে সব কিছুতে বিজ্ঞান পিছু নিয়েছে। কনকনে ঠাণ্ডায় চাই দেদার গরম, আর ভ্যাড্ ভ্যাডে গরমে ঠিক তার উন্টোটা—শুধু ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা। বার্কিক্যে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন কে না হয়—পাক ধরলে কলপের খোঁজে কিষা দাঁত পড়লে নকল দাঁতের আশায় দোড়ন। বার্কিক্যে বিজ্ঞান যদি কোসাকুসির কাজ করে যৌবনে তাহলে পুষ্পধরুর। লাবণ্য-চর্চাটা সত্যি দেখলে বিজ্ঞানবিশী ছাড়া আর কিছু নয়। পুরুষের পক্ষে 'টেমটোসট্রোন' আর মেয়েদের পক্ষে 'এন্ড্রোজেন'—এই দুটি জৈব-রসায়ন ; এ সম্বন্ধে এখন আমাদের জ্ঞানগম্যি যে পরিমাণে বেড়েছে তাতে সৌকুমার্য তদারক করাটা অসম্ভব কিছু নয়। তেমনি নেহাৎ ছোটবেলায় দেখা গেছে ভিটামিন 'ডি' হাড় শক্ত হবার জন্তে একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনে ভিটামিন 'ডি' চিকিৎসা করে রিকট ভাল করা এখন তো নিতান্ত সাদাসিধে ব্যাপার। তিন কালের কোন কালেই বিজ্ঞানকে ফেলবার নয়।

* * * *

খুব ভালভাবে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে এন্টিসেপ্টিক পর্যন্ত, সবকিছুই বিজ্ঞানের সহায়ে গড়ে উঠেছে। পেনিসিলিয়াম নোটোটা মু থেকে পেনিসিলিন বার করা হয়েছে—বীজাণুধ্বংস করবার যম যেন। তেমনি কাগজ আবিষ্কার হয়ে জাতব্য জিনিস লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর। আগেকার লোকেরা ছিল ঋতিধর এখনকার তাঁরা লিপির। বক্তব্যকে পেশ করতে হয় ভাষার সাহায্যে—বাংলায় হোক, ইংরেজিতে কিষা ফ্রেঞ্চে। প্রত্যেক ভাষার যেটা বাঁধুনী সেটা নিয়ম। সেটা খাঁটা বিজ্ঞান— $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$ র নিয়মের মত অটল। ফাইলোলজি তাই আর্টস হলেও আগলে বিজ্ঞান। মাল্লের মনকে রসসাগরে ভাসাতে হলে চাই ভাষা-বিজ্ঞানের নিখুঁত নৌকা—তা না হলে সাহিত্যের হাটে সবকিছুর ভরা-ডুবি। তেমনি অনন্ত সুর-সাগরের মাঝে 'সারেগামাপাধানিসা' বিশুদ্ধতা বাঁচানর জন্তে ছোট ছোট দ্বীপ।

* * * *

এখন এমন উপায় বার হয়েছে যার ফলে না দেখেও দেখা সম্ভব। না-শুনেও শোনা। না থেকেও থাক। বিজ্ঞান অদ্ভুত সব উপায় বার করছে। জীবনে যে চুলোয় যাইনি যা জন্মে দেখিনি—সেই সব জায়গায় স্বচ্ছন্দ্যে চলে যাচ্ছি—ছবির পর্দায়, ক্যামেরার সাহায্যে। তা না হলে টেমসিং-হিলারির সঙ্গে আমরা কেউইতো যাইনি—তবু এতরেপ্ত অভিযানের সাক্ষী বিশ্বের প্রায় সব লোক। তেমনি যে কণ্ঠ কানে শুনিনি—রেকর্ডে তা হামাসা শুনছি। আর টেলিভিশনের দৌলতে ঘটনাস্থলে না থেকেও থাকছি সম্ভব এবং প্রত্যক্ষ করছি।

দিনকাল যেমন এসে পড়ছে তাতে আসলের সঙ্গে নকলের আর কোন প্রভেদ থাকছে না। নকল আসলকে জয় করে ফেলছে। নকল-পা, নকল-হাত, নকল চেলি এসব এখন তো খুব বেশী কথা নয়। কমলালেবুর বদলে ভিটামিন সি'। গুটি-রেশমের কাপড়ের বদলে নানান সিন্থেটিক ফাইবার (পালি-আমাইড)। প্লাস্টিক সার্জারিটা তো আসলে খোদার উপরে খোদকারি। ব্যাকা নাক সোজা হচ্ছে। তোবড়ান গাল নিটোল হচ্ছে। ক্ষতের দাগ সাফ হচ্ছে।

* * * *

এই ছুনিয়াদারিতে সবচেয়ে যা সেরা দুটো জিনিস তা হোলো প্রথমটি মগজ, দ্বিতীয়টি কাগজ। এই দুয়ে মিলে সভ্যতার এত সমারোহ এত কীর্তি। মগজ ভাবে আর কাগজ তা লেখে। একজনের মানসলোক আর একজনের কাছে এমন করে উন্মুক্ত হয়ে যায়। একজনের কি একটি ভাবনা? লক্ষকোটিজনের হাজার হাজার ভাবনা—কাজের আর অকাজের। রবীন্দ্রনাথের মগজের ভাবনা বিশ্বকে আলোকিত করল। গীতাঞ্জলি একবারই লেখা হোলো কিন্তু ছাপার কৌশলে কাগজের দৌলতে ঘরে ঘরে তা পৌঁছে গেল। মগজের মুসীমানা কি চারটিখানি কথা। ছোট বিলুকের বোতামটা থেকে আরম্ভ করে প্রকাণ্ড হাওড়া-ব্রীজটা পর্যন্ত মগজের মাতবরীর সাক্ষী। মাথা দ্রব্য-গুণ বোঝে। মাথা লেখককে লেখায়, শিল্পকে আঁকায়, পাঠককে পড়ায়—এক কথায় ছুনিয়াকে চালায়। দেখা গেছে রেডিয়াম-ইউরেনিয়াম পদার্থের মত মানুষের মগজ থেকে এক রকম অদৃশ্য বিকিরণ ঘটে। এই বিকিরণ অনেকটা আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মির মত। তার একটা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আছে। বিজ্ঞানীরা ডিগ্রি বারোমিট্রিক হিসাবে তার হিসেব নিকেশ করেন। অবিনশ্বর প্রতিভা—৭৮০ আর বুদ্ধিহীনের—১৮০; এর মাঝে নানান মানসিকতা সম্পন্ন লোকের মাথা থেকে যেমন ৬৪০, ৫০০, ৪৪০ প্রভৃতি নানা পর্যায়ের রশ্মি বার হয় দেখা গেছে। মনোবিজ্ঞেয়ণের এটা সূত্রপাত মাত্র।

* * * *

বিজ্ঞান এতদিন ধরে যত কিছু করেছে তত কিছুই যে সারল্যে ও মাধুর্যে ভরে দিয়েছে তা বলা চলে না। কিন্তু বিস্ময়কর জগতের আশ্বাদ যে আমাদের মনে এনে দিয়েছে সে কথা খাটি সত্যি। বিজ্ঞানের ভালও নেই, খারাপও নেই—এটা একটা হাতিয়ার মাত্র। কি কাজে, কেমন ভাবে, কে ব্যবহার করছে তার উপরই নির্ভর করে এর সফল কিম্বা কুফল। অথচ দেখা যাচ্ছে কুচক্রীরা বিজ্ঞানকে মানুষ-মারা কল হিসাবে নির্বিচারে ব্যবহার করতে উত্তত। বিজ্ঞান নিয়েই যত ভিন্নতা, যত ঘেষ, যত গৌড়ামি যত রেষারেষি। যত বিভীষিকা। বিজ্ঞান কত মুককে মুখর করেছে, কত প্রচ্ছন্নকে প্রকাশিত, কত নিহিতকে নিষ্কাশিত। কিন্তু মানুষের মনের কালি দূর করবার কোন দাওয়াই বার করেনি—কোনকালে করতে পারবে না তা অবশ্য বলছি না। বিজ্ঞানের দায়িত্ব অনেক। এখনও পৃথিবীর অর্ধেক লোক লিখতে পড়তে জানে না। সারা পৃথিবীর চারভাগের মাত্র একভাগের বেশী জায়গাতে ভাল

বৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর অর্ধেক লোক ভাল করে খেতে পায় না। এ সবের প্রতিকারের উপায় বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে বার করা অসম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান নিয়ে মাত্রাজ্ঞানের ঘণ্টা কেমন করে বিড়াল-তপস্বী রাজনীতিবিদদের গলায় বাঁধা পড়বে? কারণ প্রায় সবদেশে বিজ্ঞান-ব্যবহারের এখন মালিক বিজ্ঞানীরা নয়—রাজনীতিবিদরাই। তাদের হাতেই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

* * * *

গলায় শুভবুদ্ধির ঘণ্টা বাঁধা হবে কিনা যেমন ঠিক নেই, এ পৃথিবী সম্বন্ধেও তেমনি শেষ কথাটির শেষ নেই। ঘটনা উড়ে চলে আকস্মিকের রথে। কোথা থেকে কি হয়ে যায় তা কে বলতে পারে। জীবনটার সৃষ্টিও তেমনি অতর্কিতে—জেনেশুনে বলে তো কেউ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেনি। অদৃশ্য সব পরমাণুরা কাছে চলে এসেছিল; যার ফলে সৃষ্টি হোলো জীবন্ত অণুর। সেই এক জীবন্ত অণুর অনুসরণে কালক্রমে এত জীবের উদ্ভব—মানুষ পর্যন্ত। ঘটনার সংঘাতে সবকিছু আপনাআপনি বিবর্তিত হয়েছে। আর সব কিছুর সেরা হোলো এই মানুষ। এই বিপুল বিশাল মধুর ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবীটাই বা কতটুকু? ধূলিকণার সামিল। বড় বড় গ্রহউপগ্রহের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আর সেখানকার মানুষ—আবার একটা মানুষের সারাজীবনের ভিতর একটা সামান্য দিন। তাও কিন্তু উপেক্ষার নয়। কারণ সৌরজগতের মধ্যে পৃথিবী সামান্য একটা তৃতীয় শ্রেণীর গ্রহ হতে পারে কিন্তু সেখানকার মানুষ? প্রথম শ্রেণীর এক অসামান্য জীব। বুদ্ধির প্রার্থ্যে অনগ্র। শুধু নিজের ভাগ্য প্রতিষ্ঠাতা নয় নিজের ভবিষ্যতের সে সৃষ্টিকর্তা। কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতিতে চলেছে নিঃসীম শূন্যে অণুর উত্তরায়ণ আর মানুষের দেহের ভিতর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হয়েছে বুদ্ধির বৈজয়ন্তী। একজন মানুষ, তার কর্মের সাফল্য, তার চিন্তার উদারতা, তার ভাবের উল্লাস, সবকিছু নিঃশেষে ঢেলে দেয় বিশ্বসংসারের অনন্ততার দিকে ছুটে যাওয়ার পাথেয় হিসাবে। তার দাম সত্যই কি কিছু নয়? কিন্তু এমনি করে একের পর এক কত মানুষের মিছিল—সব মিলিয়ে তাদের অবদান স্বল্প নয়। এক একটা জীবন মহুগ্ধ উন্মোচনের জগ্রে আহুতি। এমন অনেক মানুষের সজ্ববন্ধ জ্ঞান দিয়ে ভাবিকালের মানুষের পক্ষে বৃহত্তর সিদ্ধির চরিতার্থতা খোঁজা। বিধে পাল্লা দিয়ে এই পৃথিবীতেই স্নন্দরের সোনার কাঠির স্পর্শে স্বপ্নসাধনার বাসনা। বিরাট পারমাণবিক শক্তি এখন মানুষের করায়ত্ত—তা দিয়ে মানুষ ইতিমধ্যে যতটুকু করেছে তার শত গুণ আরও করবার আশা রাখে। জলেস্থলেআকাশে সদা সর্বদা রয়েছে মানুষের দুর্জয় আত্মনা। কালের অবগুষ্ঠন সরিয়ে অদৃষ্টের মুখাদর্শনের জগ্রে ভবিষ্যতের মানুষ কি করতে পারবে সে কথা আজ এখন বলা চলে না। স্রষ্টার মনোভাব নিয়ে সে এখন সবকিছুকে স্পর্শ করতে চায়, শুধু এ গ্রহের জিনিসপত্তরকে নয়, অগ্রগ্রহেরও। তবে সারা পৃথিবীটাকে লাটু ঘোরানর মত আরও জোরসে ঘোরাতে পারবে কি না তা জানা নেই। ছুনিয়াটার উপর তার মাতব্বরী খবরদারি এখন রোজকার নিয়মে দাঁড়িয়েছে। অনাদিকালের পাশ্ব আমরা—চলেছি। এখানে

শেষ কথাটি বলবার জো নেই—তার আগেই নিজেই শেষ হয়ে যাই। কাল নিরবধি—ক্রমবিকাশ অনির্বাণ—সময়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে আরও বিরাট পরিণতির সম্ভাবনা স্থনিশ্চিত কিন্তু পরে যখন তা সত্যি হয়ে উঠবে তখন বলিহারি এ ছুনিয়াদারি বলতে আজকের আমরা কেউ আর থাকব না।

ভাস্কর ও জরাসন্ধ

অধ্যাপক সুরবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প :

১

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে সকল লেখক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন ভাস্কর তাঁহাদের অগ্রতম। প্রায় বিশবৎসর পূর্বে যখন তাঁহার লেখাগুলি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে তখনই পাঠকসমাজ তাঁহার রচনার নিজস্ব ভঙ্গীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই রচনাগুলি পরিচিত কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না বলিয়া ভাস্কর তাঁহার প্রথম সংগ্রহ-গ্রন্থের নাম দিয়াছিলেন 'লেখা'। ইদানীং ভাস্করের শ্রেষ্ঠরচনার সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার নামকরণ হইয়াছে—'ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প'। এই সংকলন ভাস্করের প্রতিভার বৈশিষ্ট্যানির্ধারণের সুযোগ দিয়াছে। ভাস্করের প্রথম রচনার কাল হইতে প্রায় বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। বিশ বৎসর সাহিত্যের ইতিহাসে খুব দীর্ঘকাল নহে, কিন্তু সাহিত্যিকের জীবনে এই ব্যবধান বড় কম কথা নহে। এতদিন পরেও দেখা যায় যে ভাস্করের রচনার নবীনত্ব স্নান হয় নাই; ইহার মধ্যে কালজয়ী প্রতিভার ছাপ আরও স্পষ্ট হইয়াছে।

ভাস্করের রচনাগ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছে 'ব্যঙ্গগল্প'। ভাস্কর ব্যঙ্গপ্রিয় সন্দেহ নাই এবং তিনি যে আধুনিকতার বিরোধী তাহাও অনেক রচনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু তবু তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনায় এমন একটা হালকা সুর ধ্বনিত হইয়াছে যে ইহাকে ব্যঙ্গরচনার পর্ষায়ে ফেলিলে গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম কৌশলের প্রতি অবিচার করা হয়। 'আমি যারে চাই' বা 'সাবিত্রী-দ্রৌপদী-সংবাদ' প্রভৃতিতে বিদ্রূপের আভাস খুবই স্পষ্ট। এই লেখাগুলিকে গল্প আখ্যা দিলেও উহাদের সূক্ষ্ম মাধুর্যের প্রতি স্মৃতিচার করা হইবে না। প্রত্যেক রচনার মধ্যেই আখ্যানের একটা কাঠামো আছে, কিন্তু তাহা কাঠামো মাত্র এবং ইহার রস ঠিক গল্পের রস নহে। কাহিনী-সাহিত্যের মধ্যে একটা স্থূলতা আছে যাহা 'বন্ধিমের মৃত্যু', 'শ্মশান' বা 'মর্ডার ফুলশয্যা' প্রভৃতিতে নাই। প্রত্যেক প্রতিভাবান সাহিত্যিকই একটা স্বকীয় রীতি বা ঠাইলের প্রবর্তন করেন; সাহিত্যের পরিচিত প্রভেদগুলি প্রতিভাবান সাহিত্যিকের হাতে

নূতন ত্রোতনায় মগ্ন হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে ভাস্করের অনগ্রতা খুব বেশী দেদীপ্যমান ; তাঁহার লেখাগুলিতে নক্ষা, গল্প, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনার আভাস আছে, কিন্তু ইহাদিগকে কোন একটি পর্যায়ে নিশ্চিত করিয়া ফেলা যায় না।

২

ভাস্করের প্রতিভার মূলস্থত্র বাহির করিতে হইলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়িবে তাঁহার স্তম্ভনিস্তিত বাস্তবতার উপর। তিনি ব্যঙ্গরসিক ; স্তম্ভনাং ব্যক্তির চরিত্রে বা সমাজজীবনে যেখানে তাঁহার দৃষ্টি গিয়াছে সেইখানেই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং চুলচেরা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কলিকাতায় কতরকম ফেরিওয়ালা ডাকিয়া যায়, অথবা দুইটি তরুণ-তরুণী কতভাবে পরস্পরের নিকটে আসিতে পারে, অথবা এক বন্ধু অপর এক বন্ধুকে কতরকম খাবার খাওয়াইতে পারে এবং না খাওয়াইলেও প্রলোভন দেখাইতে পারে তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় পাঠক শুধু অভিভূত হয়েন না, কঠিন বাস্তবজগতের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সংযোগ-সম্পর্কেও সঙ্গ অবহিত থাকেন। শুধু যে বস্তুর জগতের বর্ণনায়ই এই বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা' নয়, যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রেও এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় প্রত্যক্ষতার ছাপ স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রাচীনকালে গৌরীদানের ফলে বর ও বধু অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যাইত ; 'প্রেম কি, তারুণ্য কাহাকে বলে, পূর্বরাগ কিরূপ, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, প্রভৃতি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিবার, বুঝিবার এবং নিজজীবনে পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ যাহারা পাইল না, তাহাদের বিবাহের সার্থকতা কি ? বিবাহ কি, মন্ত্রের কোন মূল্য আছে কিনা, ইহা কি একটা চুক্তিমাত্র, না ইহার আর কোন গভীর অর্থ আছে ; বিবাহটা ব্যক্তিগত ব্যাপার না একটা সামাজিক ব্যাপার, প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিবার এবং এতৎসম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবার অবকাশ তাহারা পায় নাই। একই সময়ে দুইটি নারী বা দুইটি পুরুষকে ভালবাসা সম্ভব কিনা, সম্ভব হইলে কর্তব্য কিনা, কর্তব্য হইলে তাহা বাঞ্ছনীয় কিনা এবং বাঞ্ছনীয় হইলে তাহা নিরাপদ কিনা প্রভৃতি ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। বিবাহব্যাপারটা দৈহিক, বা মানসিক, বা আধ্যাত্মিক, বা কাল্পনিক বা সবই, বা কোনটিই নয়, তাহা জানিবার বা বুঝিবার জন্ম যেটুকু জ্ঞানলাভের আবশ্যক তাহার অবসর তাহারা পায় নাই.....।' আধুনিককালে বিবাহব্যাপারটিকে তর্ককণ্টকিত করিয়া যাহারা ইহার মাপুর্ষ অপহরণ করিয়াছেন, বিপরীত লক্ষণার সাহায্যে লেখক তাঁহাদের উপর তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন এবং মর্ডান ফুলশয্যার উদ্ভট ছবি আঁকিয়া এই ভূমিকাকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন।

৩

ভাস্কর কঠিন বাস্তব জগৎ হইতে কখনও বিচ্যুত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার কল্পনা অবাস্তব অলৌকিক রাজ্যে পক্ষ বিস্তার করিয়া চলিয়াছে। এই পরস্পরবিরোধী গুণের সমন্বয়েই

ভাস্করের রচনা স্বকীয়তা লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন নীতিবাদী এবং আধুনিকতার পন্নিপন্থী। তাই রোহিণীকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। আধুনিক রমণীরা প্রগতি-সম্পন্ন; তাহাদের প্রগতির স্বাক্ষর রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনায় দেদীপ্যমান। এই উৎকট প্রগতির প্রতি ভাস্কর বিদ্রূপ বর্ণন করিয়াছেন বঙ্কিমের মৃত্যুর এক অদ্ভুত চিত্র আঁকিয়া। বঙ্কিমের নশ্বর দেহ যেভাবেই বিলীন হউক না কেন তাঁহার আত্মিক মৃত্যু ঘটয়াছে আধুনিক রোহিণীদের হাতেই। এই সংক্ষিপ্ত রচনার প্রত্যেকটি ছত্রে সনাজের বাস্তব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, অথচ গ্রন্থকারের অবাধ ও উদ্ভট কল্পনা সমস্ত কাহিনীটির উপর অলৌকিকের মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। দ্রৌপদী ও সাবিত্রী পুরাণোক্ত মহীয়সী রমণী। লেখক তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্বিত করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদিগকে আধুনিক কলিকাতার আটপোরে পরিবেশের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া এক অতি অপরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন। ব্যয়সঙ্কোচ আমাদের গণময় জীবনের সবচেয়ে কঠোর সমস্যা, কিন্তু এই সমস্যার অদ্ভুত সমাধানের মধ্য দিয়াই অতহৃদেবতা পুষ্পণের অর্থ সন্ধান করিয়া বিনয় ও সূজাতাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়াছে। শ্মশানে আসিলে সবাই সমান হয়—এই অতিপরিচিত কঠিনতম সত্যকে ভাস্কর প্রকাশ করিয়াছেন এক অদ্ভুত কাহিনীর মধ্য দিয়া। এই লেখাটির বর্ণনা, গবেষণা ও কাহিনী—সব কিছুই উদ্ভট, অথচ সব কিছুই বাস্তবের ভিত্তিতে সূত্রিত। বাস্তব, পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনশক্তি, অতল ব্যঙ্গসবোধ ও অবাধ কল্পনাসমৃদ্ধি ভাস্করের ‘লেখা’কে অনগ্রতা দান করিয়াছে এবং এই জগৎ এই রচনাগুলিকে কোন পরিচিত শ্রেণীর মধ্যে ফেলা যায় না। অগ্রাঙ্গ ব্যঙ্গসিকের সঙ্গে ভাস্করের পার্থক্যও এইখানেই। তাঁহারা হয় কঠোর বাস্তবের সংস্পর্শ ত্যাগ করেন নাই, অথবা তাঁহাদের গগনবিহারী কল্পনা স্বপ্নরাজ্য পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে। তাঁহাদের রচনায় তীব্রতা ও বিস্তৃতির অভাব নাই, কিন্তু সেই লঘু ও হাল্কা সুরটি নাই যাহা ভাস্করের রচনাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

লৌহকপাট (দ্বিতীয় খণ্ড) :

১

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকখানি গ্রন্থ পাঠকসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে ‘লৌহকপাট’ তাহাদের অগ্রণী। শুধু যে ইহার রচনাকৌশলই বিস্ময়কর তাহা নহে, ইহার বিষয়বস্তুই অনগ্রসাধারণ। যাহারা আনালতে দণ্ডিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল, আমরা তাহাদিগকে সাধারণ মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি। তাহারা অ-মানুষ, স্তত্রাং অপাংক্লেয়। আজকাল অনেকেই মনে করেন, তাহাদেরও সহজভাবে বাঁচিয়া থাকার অধিকার আছে। স্তত্রাং কারাগারে নানা স্তত্রাংবিধার বন্দোবস্ত করা হইয়া থাকে। কিন্তু তবু তাহারা যে সাধারণ মানুষের সমশ্রেণীয় নহে, সেই বিষয়ে মতবৈধ নাই। যাহারা

ইহাদের কথা সমবেদনার সহিত চিন্তা করেন তাঁহারাও বলেন যে অপরাধপ্রবণতা একটা রোগবিশেষ এবং কারাগারের বন্দীদিগকে হাসপাতালের রোগীদের মত শুশ্রুষা করিয়া রোগ-মুক্ত করিতে হইবে। স্বদেশীর সময় যাহারা দুর্ধর্ষ কাজ করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের দেশবাসীরা তাঁহাদিগকে ভক্তি করিয়াছে, সাহায্য করিয়াছে, সম্মান করিয়াছে, কিন্তু তবু দূরে সরাইয়া রাখিয়াছে। জনসাধারণের এই মনোভাব সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থতার অগ্রতম কারণ।

‘লৌহ-কপাট’ রচয়িতা ‘জরাসন্ধ’—ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—দীর্ঘকাল লৌহকপাটের অন্তরালে রহিয়াছেন—বন্দী হিসাবে নহে, বন্দীদের রক্ষক অর্থাৎ জেলের কর্মচারী হিসাবে। ইহার দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গীর এই স্বাতন্ত্র্যই এই গ্রন্থকে অনগ্রতা দান করিয়াছে। যাহারা অপরাধ করিয়া কারাবরণ করিয়াছে তাহাদের জীবনে খানিকটা আকস্মিক অথবা খানিকটা রোমাঞ্চকর উপাদান থাকিবেই, কিন্তু তিনি দেখাইয়াছেন যে যাহা আকস্মিক, যাহা অনগ্রসাধারণ তাহার অন্তরালে সাধারণ অল্পভূতির ফল্গুধারা সহজভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। মল্লিকা ও মধুর জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটয়াছিল তাহা বাঙ্গালী মেয়ে বা ছেলের জীবনে সচরাচর ঘটে না তাহা বলাই বাহুল্য। এমন কি আফ্জাল শেখের দোসর আফগানিস্থানের মরু অঞ্চলেও খুব বেশি আছে বলিয়া মনে হয় না এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের মংখিয়ার কাহিনী দৈনন্দিন কাহিনী নয়। কিন্তু লেখক স্বচ্ছন্দ, সরস বর্ণনার দ্বারা ইহাই দেখাইয়াছেন যে যাহা কিছু আকস্মিক তাহা শুধু বহিরাবরণ, তাহার অন্তরালে রহিয়াছে সনাতন মানবপ্রবৃত্তির অপ্রতিরোধানীয় লীলা। কারাগারের বাহিরের লোকের যে দুই-একটি চিত্র আছে তাহার রস একটু অগ্রকমের। তাহারা সুস্থ সাধারণ মানুষ, কিন্তু তাহারা অসাধারণ লাভ করিয়াছে তাহাদের শ্রেণীগতরূপে নয়, স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে। ‘অ্যালুমিনিয়াম’ সাহেব জবরদস্ত জেলাশাসক, কিন্তু তিনি ঠিক ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ইস্পাতক্ষেত্রের টুকরা মাত্র নহেন; তিনি প্রথর ব্যক্তিত্বে দেদীপ্যমান। লেখকের কণ্ঠ মঞ্জুর চিত্র খুবই ছোট কিন্তু তাহার উদারতা অপ্রত্যাশিত না হইলেও অনগ্রসাধারণ। এই শেষোক্ত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার সঙ্গে তুলনীয়।

২

পাশ্চাত্য সাহিত্যে belle lettres নামক এক শ্রেণীর রচনা প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে ইহা খানিকটা ডায়েরি, খানিকটা কাহিনী, খানিকটা গীতিকবিতার লক্ষণাক্রান্ত। ইহার প্রধান ধর্ম এই যে ইহাতে ব্যক্তিত্বের ছাপ খুব সুস্পষ্ট এবং ইহার প্রকাশভঙ্গী খুব হাল্কা ও সরস। বাংলায় এই শ্রেণীর সাহিত্যের আমরা নাম দিয়াছি—রম্যরচনা। ‘লৌহ-কপাট’ এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এখানেও ইহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। রম্যরচনার প্রধান লক্ষণ ইহার লঘুতা, ইহা এত হাল্কা যে ইহার বিশ্লেষণ ও

বিচার সহজসাধ্য নয়। এই গ্রন্থেরও প্রথম খণ্ডে এই হালকা স্বর ধ্বনিত হইয়াছে। তুচ্ছ ঘটনা ও পলায়মান মুহূর্তের মাধুর্যকে গ্রন্থকার ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ঠিক যেন তাও নয়; সমগ্র মুহূর্তটিকে তিনি ধরিতে চাহেন নাই; শুধু তাহার স্বন্দ্র মধুরিনাকে স্বরণ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি বাস্তব, কঠোর সত্যের সম্মুখীন হইয়াছেন। রম্যরচনার সরসতা বর্জিত হয় নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে ভাবগাম্ভীর্য যুক্ত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের চিত্রগুলি ছায়াছবির মত দ্রুতসঞ্চারী, আর দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনীগুলি বাস্তব অভিজ্ঞতার মত জাজ্জল্যমান। বাস্তবজীবনের সঙ্গে নিবিড় সংযোগের জগৎ এই গ্রন্থে এমন একটি বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যাহা বিদেশী রম্যরচনায় দেখা যায় না। মনে হয় জীবনের সহস্রধারা চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে—লৌহ কপাটের অন্তরালেও আমরা তাহার মধ্য অবগাহন করিতেছি। বিষয়বস্তুর নবীনতা, লেখকের বর্ণনাচাতুর্য, সর্বোপরি তাঁহার সংবেদনশীল মন ও পরিমিতিবোধ এই কাহিনীগুলিকে অনন্ততা দান করিয়াছে। ‘লৌহকপাট’ রম্যরচনার স্বন্দ্র হালকা দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়াছে।

আমাদের কথা

ছাত্র-পরিষদ :

এবার কার্যভার গ্রহণ করার সংগে সংগেই আমাদের প্রিয় অধ্যক্ষ শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়কে বিদায় অভিনন্দন জানাতে হয়। ফিজিঙ্গ্ লেকচার থিয়েটার হলে এই বিদায়-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্মারক হিসাবে বিদায়ী অধ্যক্ষকে আমরা অতি সামান্য একটি উপহার দান করি। অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীহরীবোচন্দ্র সেনগুপ্ত।

এর পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলেজের প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহ উদ্‌যাপন। এই সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করি। ফিজিঙ্গ্ লেকচার থিয়েটার হলে একটি আধুনিক সংগীতের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে অংশগ্রহণ করেন শ্রীধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীগণ। তাছাড়া 'The Sea Around Us' নামে একটি রঙ্গীন চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়। বিতর্ক পরিষদ থেকে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রদর্শনী বিতর্কের আয়োজন করা হয় ও নাট্যপরিষদের তরফ থেকে রংমহলে বহুরূপী "সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে" নাটকটি মঞ্চস্থ করে। কলেজের বার্ষিক ষ্ট্রিমার পার্টীও এই সময় অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব-মুখর সপ্তাহের পরিসমাপ্তি ঘটে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের মিলিত একটি 'বৃক্ষে-টি'তে।

এই বছরে ছাত্র-পরিষদের সব বিভাগের কার্যাবলীরই বিশেষ সম্প্রসারণ ঘটেছে। সোশাল সার্ভিস লীগের তরফ থেকে কলেজের ছাত্রদের সুবিধার জন্ত একটি 'Cheap Stores' খোলা হয়েছে, জুনিয়ার কমনরুমের পক্ষ থেকে একটি নতুন টেবিল টেনিস বোর্ড কেনা হয়েছে ও কমনরুমটা সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজান হয়েছে, বিতর্ক-পরিষদের পক্ষ থেকে বহু প্রদর্শনী বিতর্ক ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং কলেজের ছাত্রীদের জন্ত আলাদা একটি প্রাচীর পত্রিকা খোলা হয়েছে। আশা করি পরবর্তী সম্পাদকেরা ছাত্র-পরিষদের কাজকে আরও বহু-বিস্তৃত করে তুলতে পারবে।

সারা বছর ধরে কার্যভার পরিচালনা করার সময় যত বন্ধু ও অধ্যাপকদের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি তাদের সবাইকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তবু বিশেষভাবে শ্রীহরীবোচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীশশীভূষণ চৌধুরীর নাম না করলে এই বিবরণী অসমাপ্ত থেকে যেত।

সোমেশ চক্রবর্তী—সাধারণ সম্পাদক

বিতর্ক-পরিষদ :

যে ভার নিয়েছিলাম তা' নামিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে। পত্রিকায় নিয়মমাত্তিক কর্মতালিকা পেশ করাটাই বাকি ছিল।

প্রথমতঃ কলেজে অনুষ্ঠিত বিতর্কের তালিকা দেওয়া হ'ল। বিশেষণের বাহুল্য নিম্নয়োজন বোধে বাদ দেওয়া হয়েছে।

১০ই ডিসেম্বর একটি প্রদর্শনী বিতর্ক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। হুধাংগু দাশগুপ্ত, পরিমল মুখোপাধ্যায়, কমল দত্ত ইত্যাদি অংশগ্রহণ করেন। বিষয়: Problems of the world can ultimately be solved not through reforms but through revolution alone.

প্রতিষ্ঠাতৃ দিবসের উৎসবের অংশ হিসেবে ২৩শে জানুয়ারি প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের যে বিতর্ক হয় তাতে উভয় পক্ষে অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত, নির্মল ভট্টাচার্য, শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, পরিমল মুখোপাধ্যায়, কমল দত্ত ইত্যাদি যোগ দেন। বিতর্কের বিষয় ছিল: A policy of neutrality for India is neither a necessity nor a reality.

১০ই ফেব্রুয়ারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। In the opinion of the House the proposed merger of West Bengal & Bihar is detrimental to the interests of West Bengal—এই প্রস্তাবটি ২৯৯-৬ ভোটে গৃহীত হয়।

১৬ই মার্চ 'Discontent, Disobedience & Discord are the guides of human civilization' এই বিষয়ে একটি আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক হয়।

১৩ই জুলাই ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধি দলকে এক সভায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়।

২৭শে জুলাই ফিজিক্স লেকচার থিয়েটারে British Council Debating Circle এবং আমাদের পরিষদের মধ্যে 'Debating is a mere waste of time' এই বিষয়ে যে বিতর্ক হয় তাতে Mr. Argles, মুখ্যমন্ত্রীর দাসগুপ্ত, শ্রীবিখানাথন, বিশ্বপ্রিয় বহু ইত্যাদি যোগদান করেন।

৩রা আগস্ট 'Passion, not reason, rules the world' এই বিষয়ে St. Xavier's College-এর সঙ্গে আমাদের বিতর্ক-পরিষদের একটী বিতর্ক হয়।

১৭ই আগস্ট 'Democracy and the cult of the individual in the USSR' সম্বন্ধে অধ্যাপক অন্নান দত্ত এবং মোহিত সেনের মধ্যে একটি আলোচনা আয়োজিত হয়েছিল।

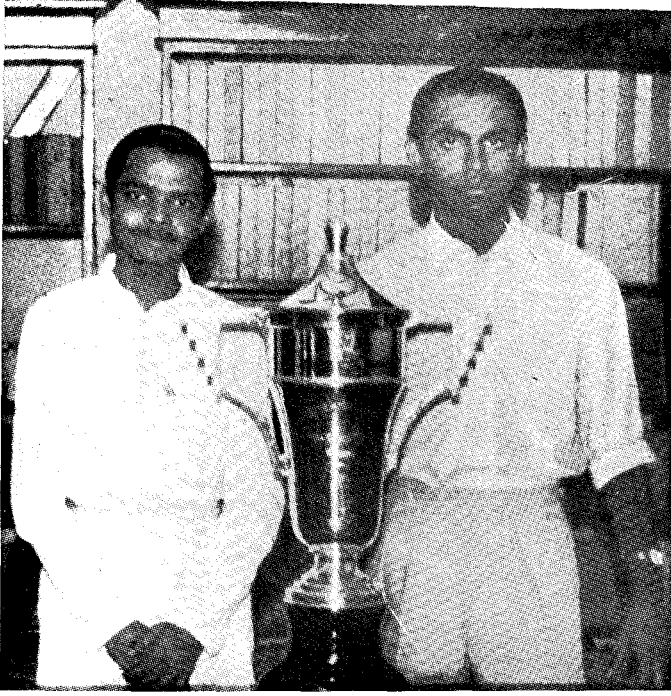
২৪শে আগস্ট United Kingdom National Union of Students-এর সভাপতি Mr. F. Coplestone-কে সম্বাধিত করা হয়।

৩১শে আগস্ট দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর উদ্বোধনে এবং বিতর্ক-পরিষদের আর্থিক সাহায্যে একটি বাংলা বিতর্ক আয়োজিত হয়েছিল।

১৪ই সেপ্টেম্বর West Bengal Debating Council-এর সঙ্গে একটি বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'Progress depends on the unreasonable man.'

বিতর্ক-পরিষদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এর কর্মক্ষেত্র কলেজের বাইরেও বিস্তৃত। আমাদের প্রতিনিধিদল নানান প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। যথা—Indian Institute of Technology, Kharagpur; University Institute; St. Stephen's College, Delhi; B.E. College, Sibpore, All India Radio, Calcutta; Scottish Church College; St. Xavier's College; India Tomorrow Club; Lady Brabourne College ইত্যাদি। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর কমল দত্তের St. Stephen's College এবং All India Radioতে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানধিকার উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শ্রীলেখা গুপ্ত, ষষ্ঠীরত চক্রবর্তী, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীশ নন্দী ও অহীন চৌধুরী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছেন।

নতুন developments সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। কি কারণে জানিনা আমাদের কলেজের মেয়েরা ইতিপূর্বে বিতর্কে বিশেষ অংশগ্রহণ করেননি; এবছর তাদের বিতর্কে আনানর চেষ্টা সফল হয়েছে। ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে প্রথাটির প্রসার হবে আশা করা যায়। লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের উদ্বোধনে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমাদের কলেজ জয়ী হয়েছে। আমাদের কলেজের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীমতী লতা রায় ও শ্রীমতী শ্রীলেখা গুপ্ত।



ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শ্রীযুগ্মীৱত চক্রবর্তী (২য় বর্ষ) ও শ্রীঅসিত বানাজী (৬ষ্ঠ বর্ষ)



বিভিন্ন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবন্দ

আনুষ্ঠানিক বিতর্ক ছাড়াও ঘরোয়া আলোচনার জন্ম একটি চক্র গড়ে উঠেছে। আপাততঃ একটি মাত্র অধিবেশন হয়েছে। উৎসাহী বিতর্কীদের আনুকূল্যে এটা বেড়ে উঠবে আশা করি।

ছাত্র-পরিষদ এবং বিশেষতঃ বিতর্ক-পরিষদের টাকার একটি বড় অংশ মাইক্রোফোনের জন্ম খরচ হয়। অদূরভবিষ্যতে একটি মাইক্রোফোন ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি কেনবার জন্ম বিতর্ক-পরিষদে একটি Fund খোলা হয়েছিল; অনিবার্য কারণে সে টাকা নাট্য-পরিষদে স্থানান্তরিত হয়েছে। Fund-এ টাকা জমানর দিকে ভবিষ্যতে দৃষ্ট দেওয়া উচিত।

বিত্তাগীয় উপদেষ্টা অমিয় মজুমদার, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক সেনগুপ্তকে তাঁদের মূল্যবান উপদেশ, উৎসাহদান ও সহযোগিতার জন্ম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য—সম্পাদক, বিতর্ক-পরিষদ

নাট্য পরিষদ :

পরিষদের কাজের শুরু হল “কলেজ-প্রতিষ্ঠাতৃ সপ্তাহ” উদ্‌যাপনের (Foundation Week Celebration) কিছুদিন আগে থেকে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কিছুটা বিশেষত্ব ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে কলেজ থেকে অভিনেতা খুঁজে বের করে নারী ভূমিকা বর্জিত সমরোপযোগী নাটক নির্বাচন করা খুবই কঠিন। তাই শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের “সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক” এবং চারটি নৃত্যনাট্য (‘রাণার’, ‘গৌবপার্শ্ব’, ‘বহা’ ও ‘তেলের শিশি-...’) প্রথিতযশা নাট্য-গোষ্ঠী “বহুঙ্গামী” ও “ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ”—এর শিল্পীদের দ্বারা ‘রঙমহল’ নাট্যমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম উঠতে পারে যে কলেজ নাট্য-পরিষদের সৃষ্টি ছাত্রদের অন্তর্নিহিত অভিনয় নৈপুণ্যের বিকাশের জন্মে, অস্তুর অভিনয় দেখবার সুযোগ করে দেবার জন্মে নয়। এখানে বলা দরকার যে পরীক্ষার ব্যাপারে সকলে ব্যস্ত থাকায় অভিনেতা জোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি আর তা ছাড়া অভিজ্ঞ কলাকুশলীদের অভিনয় দেখেও শেখবার অনেক কিছুই রয়েছে। যাক, অনুষ্ঠান কতটা সূষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়েছিল তার পরিচয় দর্শক সাধারণের মন্তব্যের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল বলেই এর বিচার ছেড়ে দিলাম তাঁদেরই উপর। ধন্যবাদ জানিয়ে ধন্যবাদার্থ ব্যক্তিদের বোধহয় ছোট করাই হয়, তবুও নিয়মের রাজত্বের অধিবাসী হিসেবে নিয়মমার্কিক ঐ অনুষ্ঠানের সফলতার জন্ম কলেজ ছাত্র-পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং “বহুঙ্গামী” সম্পাদক শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিষ্ঠাতৃ-সপ্তাহের অনুষ্ঠানের পর আমি বসে থাকলেও সময় বসে থাকে নি, সে এগিয়ে গিয়ে টেনে নিয়ে এল বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের পর্বকে। গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলবার সাথে সাথেই উঠে পড়ে লাগতে হল এই পর্বের সূষ্ঠ সাধারণ জন্ম। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট হলেও অভিনেতার সংখ্যা কিন্তু সত্যিই নগণ্য। শুধু তাই নয়, এই নগণ্য অভিনেতাদেরও আবার বহু সাধ্য সাধনার পর পাওয়া যায়। তারপর স্ত্রী-ভূমিকা-বর্জিত নাটক নির্বাচনের দুঃসহ সমস্যা ত আছেই। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় আইন করে ‘সহ-অভিনয়’ বন্ধ করেছেন (যদিও এর পেছনে কি যুক্তি আছে জানি না, তবুও সভ্যজগতের মানুষ বলে আইন অমান্য করা চলবে না)। একটি কথা এখানে বলা দরকার—এবারে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় যুব-সম্মেলনের উদ্বোধনীদের চাপে পড়ে ক’লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কেবলমাত্র ঐ সম্মেলনে পাঠানোর জন্ম “রবীন্দ্র-ভারতী”তে আন্তঃকলেজ একাঙ্ক নাটিকা প্রতিযোগিতার যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে ‘সহ-অভিনয়’র সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু, এই সুযোগের পর্যাপ্ত প্রচারেও আমাদের কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নি। যদিও, ছ’একজন যে এগিয়ে আসেন নি তা নয়, যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের ধন্যবাদ। যাক আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় প্রেরণের জন্মে “আজকের উত্তর” একাঙ্ক নাটকটি শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হল এবং তারপরেই শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্তী রচনা করলেন

পঞ্চাঙ্ক-নাটক “খড়ম”। লেখক দুজনকেই আমরা তাঁদের অকুণ্ঠিত দানের জন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নাটক দুটির বিষয় বস্তুর স্বন্ধে “যুগান্তর” পত্রিকার (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬) অভিমত তুলে ধরিছি—“নাটক নির্বাচন কলেজ নাট্য-পরিষদের সমাজ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া গেল।” * “আজকের উত্তর” ও রবীন্দ্রনাথের “খ্যাতির বিড়ম্বনা” (Radio-Play) প্রেরিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায়। স্ব বিশিষ্ট অতিথি, সমালোচক ও কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে “নিউ এম্পায়ার” থিয়েটারে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হল—কতটা সাফল্যের সঙ্গে তার বিচারের ভার আমার উপর নয়, ছাত্রছাত্রীদের উপর। কয়েকটি পত্রিকার মধ্যে “যুগান্তর”এর অভিমত হল—“সামগ্রিকভাবে নাট্যপরিচালনা এবং অভিনয় হুঁ অমূল্যবানের পরিচায়ক হয়েছিল একথা বলতে বাধা নেই।” অভিনয়মাংশে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চতুর্থ বর্ষ বাংলা বিভাগের শ্রীনিখিলেশ সেনগুপ্তের অনবদ্য অভিনয়। “যুগান্তর” এর অভিমত—“আজকের উত্তর” নাটকায় “বৈষ্ণব”এর ভূমিকায় শ্রীনিখিলেশ সেনগুপ্তের অভিনয় সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। “খড়ম” নাটকেও ‘কালীনাথ’এর ভূমিকায় শ্রীনিখিলেশ সেনগুপ্ত তাঁর সাবলীল স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।” সেদিন নিখিলেশ সত্যিই যে অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, তাতে তাকে নিঃসন্দেহে প্রেসিডেন্সি কলেজের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলা যায়। অস্থায়ী সকলেও খুব চমৎকার অভিনয় করেছেন। “মাইক-নাট্য” (Radio-Play) “খ্যাতির বিড়ম্বনা”র ‘দুর্ভাগিনী’এর ভূমিকায় চতুর্থ বর্ষ পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রীঅজয় বহু ও যথেষ্ট অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে আরো যারা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে বাঁশীতে শ্রীপ্রশান্ত রায়চৌধুরী ও গিটারে শ্রীলতিকা দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য। বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের সাফল্যের জন্ত অধ্যাপক শ্রীমুখোপাধ্যায় সেনগুপ্ত, নাট্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীভূদেব চৌধুরী ও “বহুরূপী” সম্পাদক শ্রীঅমর গঙ্গোপাধ্যায়কে (“আজকের উত্তর” পরিচালনার সহযোগিতার জন্ত) বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে, দুটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়েই যে সমস্তা সন্মুখীন হতে হয়েছিল তা হচ্ছে আমাদের একটি নিজস্ব ‘auditorium’এর অভাব। এ সমস্তা আজকের নয়, বহুদিনের, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের পক্ষে বাইরের থিয়েটার হল ভাড়া করে অভিনয় মঞ্চস্থ করা যে কতটা অসম্মানজনক তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া স্থান মঙ্গুলানের প্রশ্ন ত’ রয়েছেই। তাই পূর্বস্বরীদের মত আমিও এই সমস্তা সমাধানের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নবাগত সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বিবরণী শেষ করছি।

শ্রামল চৌধুরী—সম্পাদক

রবীন্দ্র-পরিষদ :

নবেম্বর মাসে (’৫৫) একটি রবীন্দ্র-সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। দেবব্রত বিখাস, হুচিত্রা মিত্র ও পূর্ণা চট্টোপাধ্যায়ের গান উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল।

জানুয়ারী মাসে (’৫৬) কলেজের “প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস” উপলক্ষে একটি গানের আসর হয়েছিল। এতে নির্মল চৌধুরী, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়। অর্কেস্ট্রার বিদেশী স্বর অনেকে পছন্দ করেননি।

বছর শেষ করা হয় জুলাই মাসে প্রথম, ও তৃতীয় ও পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীকে স্বাগত জানিয়ে। বাহুল্য বর্জিত

* Hindusthan Standard (14th Sept., '56) পত্রিকারও অভিমত তুলে ধরিছি :

“In both plays new ideas were mooted with an undercurrent of satire, and the student performers gave quite good account of themselves in the principal roles.”

হুগা সত্ত্বেও এ ধরণের অভ্যর্থনা এই প্রথম। আশা করি ভবিষ্যতে এই অনুষ্ঠানটির একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকবে প্রতি বছরের কর্মসূচীতে।

প্রেসিডেন্সী কলেজের 'রবীন্দ্র-পরিষদ'কে "রবীন্দ্র শতাব্দী সংঘের" সভ্য-তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তবে উপযুক্ত কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি। লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী ভেরা নোভিকোভাকে আমাদের কলেজে আমন্ত্রণ করার চেষ্টা হয়েছিল। শ্রীমতী নোভিকোভা হঠাৎ শান্তিনিকেতন চলে যাওয়ায় সেটা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সম্পাদক এটাকে সফল করলে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষায় 'রবীন্দ্র-পরিষদের' বার্ষিক কর্মসূচী এত সংজ্ঞাহীন ও বহু অর্থব্যয়ক, যে পরস্পরবিরোধী মতের প্রতিকূলে কোন জনপ্রিয় অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এই সংজ্ঞামূলক অনির্দিষ্টতাকে সরল করতে আমি পারিনি। এই বিষয়ে পরবর্তী সম্পাদকের সাফল্যের উপর ছাত্র-ইউনিয়নের আংশিক শ্রীবুদ্ধি নির্ভরশীল বলে মনে করা যেতে পারে।

নির্মল গোস্বামী—সম্পাদক, রবীন্দ্র-পরিষদ

সোশ্যাল সার্ভিস-লীগ :

সোশ্যাল সার্ভিস বলতে আমরা যা' বুঝি তা' এখানে করা হয়না, আর আমিও তার কিছু ক'রতে পারিনি এ আমার স্বীকার ক'রতেই হবে। তবে শুধু collegiate থাকতে হ'লে আর ঠিক সময় পরীক্ষা দিতে গেলে যে সে ধরণের সোশ্যাল সার্ভিস করা প্রায় অসম্ভব তা' বলতে পারি।

যা হোক, এবারে আমাদের কাজের মধ্যে অত্যন্তম হোল,

১। Cheap Store. প্রেসিডেন্সি কলেজে এ জিনিষ প্রথম। এতে বাজারের চেয়ে অনেক কম দামে খাতা বিক্রী করা হয় আর কালি ইত্যাদিও যথেষ্ট সস্তা।

২। Text Book Library প্রায় লুপ্ত হ'তে বসেছিল। ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই চেয়ে বিশেষ পাইনি। তাই শেষ বেলায় কিছু বই কিনে এর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ক'রেছি।

৩। Students, Health Homeকে কলেজের সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা ক'রেছি। আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যাতে এর সভ্য হ'তে পারেন তার ব্যবস্থা শীগ'গিরই করা হবে।

এ ছাড়া দুঃস্থ এবং রোগগ্রস্ত বারী সাহায্যের জন্ত এসেছেন তাঁদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হ'য়েছে।

দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত—সেক্রেটারী সোশ্যাল সার্ভিস-লীগ

অর্থনীতি ও রাজনীতি পাঠচক্র :

কাজ বুঝে পেয়েছিলেম বেশ দেরী করে।

করার অনেক—প্রারম্ভে থাকে উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রতিজ্ঞার ছড়াছড়ি। আস্তে আস্তে সময় ও পরিবেশ এনে দেয় দমতা ও নিতানৈমিত্তিক চলার ভঙ্গী। আমাদের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম নেই।

শতাব্দীর পুরোনো প্রায়াস্কার অনতিশুদ্ধ সেমিনার কক্ষ—আর তার পরিবেশ হিসেবে পেয়েছি, শিলিংএ রদায়ন বিভাগের কৃপাবর্ষণ, পাশে গার্লস্ কমন্সরুমের কলকাকলি, পথের যন্ত্রসঙ্গীত এবং সর্বোপরি সামনের ল্যাভাটরি।

কোন উপায় নেই, কর্তৃপক্ষ বধির। তবে আশাস এই, আশা নিরাশার দ্বন্দ্বদোলায় দুলাচ্ছে টিমটিমে দীপের সবুজশিখার প্রতিশ্রুতি—দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় কলেজের নতুন গৃহ নির্মিত হবে—তাতে থাকবে নাকি বিশাল এক অর্থনীতি বিভাগ। অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের উল্লসিত হওয়ার কথা!

এবার কাজের কথায় আসা যাক।

কাজ পেয়েই আমাদের ডাকতে হয় এক বিদ্যায়ী শ্রীতি-চা সম্মিলনী—৪র্থ বার্ষিক ছাত্রদের জন্তে। বিদ্যায়ের পূর্বের মিলনটি বেশ আনন্দ বিধুর!

তারপর শুরু বই দেওয়া নেওয়া। এ কাজটির গুরুত্ব হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু দায়িত্ব বেশ। সীমিত সংখ্যার বই নিয়ে বিরাট চাহিদা মেটানো যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার—তা' সকলে বোঝে না। তবু সেমিনার-সভাদের আন্তোত্ব-মনোবৃত্তি স্ফূর্ত পন্নিচালনার সাহায্য করে এসেছে বারে বারে। অসহযোগ ও অধিকার-প্রশ্ন যে বিভ্রান্তি ঘটায়নি, এমন নয়। তবে তা' অল্প।

প্রতি শনিবার বিভিন্ন আলোচনী সভা ডাকা হয়েছে। সারা বছরের উল্লেখযোগ্য বিষয় বলতে এইগুলিই বোঝায় :

- (i) The Economists and the Functions of the Govt. To-day—Gangadhar Jash.
- (ii) Party-System in U.S.A.—Aloke Datta.
- (iii) Problems of Economic Development in Under-developed Countries—Ashoke Sen.
- (iv) Our Real Plan—Its Problems and Objectives—Ramkrishna Basu.
- (v) Democracy and the Individual—Hariprasanna Manna.
- (vi) Future of Capitalism—Ashoke Guha.

এগুলির মধ্যে অশোক সঞ্জয় গুহের রচনাটি তথ্য ও মনীষায় অত্যন্ত মধুর ও উপভোগ্য হয়েছিল।

এতো গেল গতানুগতিক কাজের ফিরিস্তি।

এর ওপর আছে অধ্যাপকদের আসা যাওয়া। শ্রীতাপস মজুমদার ও শ্রীতরুণচন্দ্র দত্ত—এঁদের দু'জনকে বিদ্যায় দিয়েছি আমরা, পেয়েছি শ্রীপ্রভাকর সেনকে। লাভক্ষতির হিসেব মেলাতে গিয়ে দেখেছি—আমরা ছিলাম যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। এক্ষেত্রে আমরা অদৃষ্টবাদী আর কতৃপক্ষ অসহায়।

এবার উপসংহারে আসা যাক।

যা' কিছু কাজ হয়েছে সেমিনারে—হয়তো ভাল, হয়তো বা 'মন্দ নয়'। ভালো মন্দ মিলিয়ে বছর অংশ ও সাহায্য রয়েছে মিশে। নাম উচ্চারণ করতে গেলে অনুভব দোষে ছুট্ট হতে পারি। সভ্যবন্দকে তাই সমষ্টিগতভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আর দু'জনকে করব স্মরণ—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীউপেন ঘোষাল ও সহকারী গ্রন্থাগারিক রহমান সাহেবকে, তাঁদের পথপ্রদর্শী উপদেশ ও পরিচালনের জন্ত।

হরিপ্রসন্ন মান্না—সম্পাদক, অর্থনীতি সেমিনার
বিধরঞ্জন বসু—সম্পাদক, রাজনীতি সেমিনার

দর্শন-সেমিনার :

পারম্পরিক আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্তেই এই সেমিনারের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেমিনার ও তার লাইব্রেরি প্রায় সমার্থক। ঐ ক্ষুদ্র লাইব্রেরিটির পরিচালনাই সম্পাদকের কার্যস্থচীর সর্বপ্রধান অঙ্গ। ছুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছি এ অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আমরাও করতে পারি নি। নিজেদের অনুৎসাহই এর কারণ। তবে এ'বছর পাঠ্যতালিকার

বহির্ভূত কোন কোন বিষয় সম্বন্ধেও (বিশেষতঃ সাম্প্রতিক বৃটিশ দর্শন সম্বন্ধে) উৎসাহের লক্ষণ ছাত্রদের মধ্যে দেখা গিয়েছে, গত কয়েক বছরের ইতিহাসে যার পরিচয় পাওয়া যায় না, এ বিষয়ে প্রধান উৎসাহী বন্ধুবর শ্রীহিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়। আমাদের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় যে-সব প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছে তার মধ্যে শ্রীহিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়ের "Idea in Locke, Berkeley and Hume" এবং শ্রীম্নেহাংশু সরকারের "The Concept of Reality" মামুলি ধারার ব্যতিক্রম হিসেবে অভিনন্দিত হবার যোগ্য। পরবর্তী সম্পাদককে এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বন্ধুদের কাছ থেকে লেখা না পাওয়ায় আমাদের প্রাচীরপত্রটি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এরপর যারা আসছেন তাঁরা এটিকে নিয়মিত চালিয়ে যাবেন, এই আশা করি।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর ফাদার ফালৌ আমাদের সেমিনারে "অকল্যাণের দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক তাৎপৰ্য" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে মন্তব্য করা ধূষ্টতা। তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবাসজীবন চৌধুরীর উৎসাহ আমাদের অহুৎসাহকে লজ্জা দিয়েছে। তাঁর প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

শরদিন্দু ভট্টাচার্য—সম্পাদক

ইতিহাস-সেমিনার :

প্রেসিডেন্সি কলেজ ইতিহাস সেমিনারের দুটো বিভাগ—একটা স্নাতকোত্তর ও আর একটা স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্ম। এর মধ্যে প্রথম বিভাগের কাজ খালি এক আলমারি বই নিজেদের মধ্যে বিলিব্যবস্থা করতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ায় সেমিনারের ঐতিহ্যরক্ষার দায়িত্ব বর্তেছে দ্বিতীয় বিভাগের ওপর, তাই ইতিহাস সেমিনার বলে কিছু বোঝালে এখন তা দ্বিতীয় বিভাগটাকেই বোঝায়। আগে এই দুটো বিভাগকে একত্র ও পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু যে কারণেই হোক তা স্থায়ী হয়নি।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর '৫৫ অধ্যাপক সরকারের সভাপতিত্বে সেমিনারের এক বিশেষ অধিবেশনে প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রাচীর পত্রিকা প্রকাশ, আলোচনা সভার ব্যবস্থা ও সেমিনারের নিজস্ব গ্রন্থাগার পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলো প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে পুনর্গঠিত সেমিনার কমিটিতে শ্রীমনোরঞ্জন ঠাকুর ও শ্রীদেবরত বোধ প্রতিনিধি এবং শ্রীপ্রদীপকুমার দাস প্রাচীর-পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর সেমিনারের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর বিদায় গ্রহণের ফলে সেমিনারের মূল নির্বাচনে শ্রীঅনীমকুমার ঘোষাল সম্পাদক ও শ্রীদেবরত বোধ সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন। এবছরের শেষ নির্বাচনে শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী ও শ্রীনরসিংহপ্রসাদ শীল নবাগত তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন।

নিয়মমাফিক এখন আমাদের '৫৫-'৫৬ সালের কাজের কথায় আসা যাক। এ পর্বত সেমিনারের মোট সাতটা অধিবেশন হয়েছে আর এছাড়াও আমরা আরো কতকগুলো কাজ করেছি। সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের কথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয় অধিবেশনে "Suez Canal Dispute" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন তখনকার চতুর্থ বর্ষের ছাত্র শ্রীনির্মলেন্দু চট্টোপাধ্যায়। ৮ই অক্টোবর '৫৫ তৃতীয় অধিবেশনে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীধীরকুমার পাল "Nazism" শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

গত ২৩শে ডিসেম্বর '৫৫ সেমিনারের পক্ষ থেকে এক বিশেষ জলযোগের আয়োজন করা হয়। অধ্যাপকদের উপস্থিতিতে যারো পরিবেশে এটা খুব উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

সেমিনারের চতুর্থ অধিবেশনে আমাদের প্রাচীর-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমনোরঞ্জন ঠাকুরের লেখা "Luther as a Reformer" নামে প্রবন্ধটি আলোচিত হয়।

গত ৩রা মার্চ '৫৬ আমরা বিদ্যায়ী চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সর্ধর্না জানাই। অধ্যাপকগণের উপস্থিতি ও বন্ধুবর্গের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটির সার্থক পরিসমাপ্তি ঘটে। এই উপলক্ষে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী মন্দাকান্তা রায়চৌধুরী ও আমাদের কলেজের সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণা সাধু নানা কাজে সাহায্য করে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

২৯শে মার্চ '৫৬ সেমিনারের পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীঅহীন চৌধুরী এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল "Paul Sweezy's Questions (On the transition from Feudalism to Capitalism)"।

গত ১২ই এপ্রিল '৫৬ সেমিনারের এক বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন অধ্যাপক শ্রীহরিশোভন সরকার মার্কসীয় মতবাদের ভিত্তিতে উৎপাদন-প্রণালী ও সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক বিবর্তন সম্বন্ধে এক দীর্ঘ এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

গ্রীষ্মের ছুটির পর আমাদের কলেজ থেকে অধ্যাপক মামুদের হুগলী মোহসীন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে বদলী হওয়ার সংবাদ ছিল আমাদের কাছে যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনই বেদনাদায়ক। তাঁর মত উৎসাহী, জনপ্রিয় ও সুযোগ্য অধ্যাপককে হারিয়ে আমরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। গত ১৪ই জুলাই আমরা তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়েছি এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের মধুর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বন্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে তাঁকে নিয়ে অধ্যাপক ও ছাত্রদের একমুখে একটা ছবি তোলা হয়।

পূজার ছুটির আগে ১৫ই সেপ্টেম্বর সেমিনারের সপ্তম অধিবেশনে শ্রীঅহীন চৌধুরী এক প্রবন্ধ পাঠ করেন তাঁর পূর্বলিখিত বিষয়ে। সবকটি অধিবেশনে অধ্যাপক সরকারের সভাপতিত্বে পাঠান্তিক আলোচনা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। কয়েকটি অধিবেশনে অধ্যাপকগণ ও প্রাক্তন ছাত্রেরা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

দুইয়ের বিষয় এ পর্যন্ত সেমিনারের নিজস্ব প্রাচীরপত্রের দুটোর বেশী সংখ্যা প্রকাশের সুযোগ হয় নি। আশা করি ছাত্র বন্ধুরা লেখার ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

সেমিনারের বই আদান-প্রদান করতে গিয়ে আমার পক্ষে হয়ত অনেকেই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এর একমাত্র কারণ ছাত্র-সংখ্যার তুলনায় সেমিনারের বইয়ের সংখ্যা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অতি প্রয়োজনীয় বইগুলোর ৩৪ কপি রাখার ব্যবস্থা না করলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এবছর আমরা অধ্যাপক সরকারের সাহায্যে কলেজ লাইব্রেরী থেকে সেমিনার লাইব্রেরীতে কতগুলো দরকারী বই স্থানান্তরিত করেছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটা উদ্বেগজনক সমস্যার উল্লেখ না করে পারছি না। সেমিনারের বইয়ের সংখ্যা বর্তমানে দেড়শোর কাছাকাছি, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে এর একটা মোটা অংশ ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পূর্বপ্রথা মত এদের ডব্লিউ. বি. জি. প্রেসে বাঁধাবার জন্তু পাঠান হলে, প্রচণ্ড সরকারী কর্মতৎপরতা ও সময়নিষ্ঠার কল্যাণে দেড় থেকে তিন বছর সময় লাগবে এদের স্বস্থানে পুনরধিষ্ঠিত হতে, যদিও অল্প কোথাও বাঁধাবার ব্যবস্থা করলে এটা তিন দিনে হতে পারে। কাজেই সমবেত চেষ্টায় যদি আমরা নিজেরাই এগুলো বাঁধাবার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে আমরাই লাভবান হব।

অধ্যাপক সরকারের পরামর্শক্রমে এবছর থেকে আমরা সেমিনারের স্থায়ী কার্যবিবরণী রাখার ব্যবস্থা করেছি। এজন্য বাঁধান Record Book ও Issue Book কেনা হয়েছে। গত ৩রা মে '৫৬ থেকে তাতে ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ও স্থায়ী ঠিকানা এবং সেমিনারের কাজের ধারাবাহিক বিবরণ লেখা শুরু হয়।

সেমিনারের কাজ করতে গিয়ে অনেকেই কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি, সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ব্যক্তিগত ভাবে সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়, তবে একজনের নাম করা বিশেষভাবে উচিত বলে মনে করি। তিনি হচ্ছেন শ্রীমনোরঞ্জন ঠাকুর। সেমিনারের সব কাজে সব সময়ে তিনি যে উত্তম দেখিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

সেমিনারের ঐতিহ্য রক্ষায় আমরা কতদূর সফল হয়েছি তা আমাদের বিচার্য নয়, তবে এটুকু বলতে পারি যে নানা অহুবিধার মধ্যেও আমাদের দিক থেকে চেষ্টার কোন ক্রটি হয়নি।

পরিশেষে সেমিনারের সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীমুশোভন সরকারকে শুধু মামুলি ধন্যবাদ নয়—কারণ তা দিয়ে তাঁর সাহায্যের পরিমাপ হয় না—আমার কৃতজ্ঞতাও জানাই।

অসীমকুমার বোবাল—সম্পাদক, ইতিহাস-সেমিনার

ইংরেজী সেমিনার :

বই দেওয়া নেওয়া এতেই ইংরেজী সেমিনারের কাজ শেষ। অনার্স লাইব্রেরী, সেমিনার লাইব্রেরী ছুটাই চ'লছে—বেশ ভালোভাবেই চ'লছে। অনার্স লাইব্রেরী সম্পর্কে অধ্যাপকবৃন্দের অনেকেই আগ্রহ আছে, আমাদের চেয়েও বেশী। আমাদের দোষে এই আগ্রহটুকু থেকে যদি বঞ্চিত হই, তবে ইংরেজী বিভাগের ছাত্রদের সেটা খুবই দুর্ভাগ্যের কারণ হবে—কারণ এই জিনিষটি অপর কোন বিভাগেই নেই, অথচ এমন দরকারী জিনিষও কলেজে কমই আছে। 'পাঠচক্র' গোছের একটা কিছু করবার চেষ্টা হয়েছিল, কিছুদূর এগিয়েছিলামও, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। আশা করি, তৃতীয় বর্ষের উৎসাহী ছাত্রেরা এ বিষয়ে যথোচিত তৎপর হবে।

শ্রীশ্যামলকুমার সরকার—সম্পাদক ইংরেজী সেমিনার

গণিত-পাঠচক্র-সংবাদ :

পাঠচক্রের কার্যবিবরণী পেশ আর কাজের ভার পাওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান মাত্র তিন মাস। বলাই বাহুল্য এই অল্পসময়ে এমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করে বসিনি পত্রিকার পৃষ্ঠায় বা ফলাও করে ছাপান যায়। এতদিন আমাদের পাঠচক্রের কর্মসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল পাঠচক্রের গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত বই-লেনদেন। এবারে গ্রন্থাগারটিতে ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে কিছুসংখ্যক নতুন বইও যোগ করা হয়েছে। আর এই বই-লেনদেনের সঙ্গে সঙ্গে একান্ত বয়োয়া ও অনাড়ম্বর পরিবেশে অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষামূলক আলোচনাও পাঠচক্রটির এক বিশেষ আকর্ষণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে পাঠচক্রের মুখপত্র হিসাবে একটি প্রাচীর পত্র প্রকাশনারও উদ্যোগপর্ব চলছে।

সমক্ষেপে এই হ'ল পাঠচক্রের কথা। অব্থা এই বিবরণীকে দীর্ঘতর করে লাভ নেই। আর যাদের কাছে আমরা প্রকৃত ঋণী মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের খাটো করতে চাই না। অতএব এখানেই ছেদটানা নমস্কার।

নির্মাল্য সিংহ—সম্পাদক, গণিত পাঠচক্র

শারীরবৃত্ত পরিষদ :

প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় বোজনা করে শারীরবৃত্ত পরিষদ এবার সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করলো। আজকের যে কর্মসূচীর “শারীরবৃত্ত পরিষদ” কলেজের অল্পতম প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, শারীরবৃত্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক সহানুভূতি ও অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তা গড়ে উঠেছিল ১৯৫০ সনে। এই বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক হচ্ছেন ডাঃ সুবোধ মহলানবিশ। শারীরবৃত্ত পরিষদের গত ছয় বৎসরের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে কলেজের “Centenary Volume” এবং শতবার্ষিকী আরক সংখ্যায়।

* * * * *
১৯৫৬ সালের ৩রা আগস্ট পরিষদের বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পদাধিকার বলে ডাঃ বন্দোপাধ্যায়
প্রতিবছর পরিষদ সভাপতি হয়ে আসছেন। এবারে নির্বাচিত হয়েছেন :

- ১। ডাঃ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—সভাপতি।
- ২। ডাঃ চণ্ডীচরণ দেব—সহ “
- ৩। শ্রীশিশির মজুমদার—সাধারণ সম্পাদক।
- ৪। শ্রীশেফালী মল্লিক—সহকারী সম্পাদিকা।
- ৫। ডাঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—কোষাধ্যক্ষ।
- ৬। শ্রীশ্রীল ভট্টাচার্য—সহঃ “
- ৭। শ্রীদেবেন্দ্র সিংহ—প্রাচীরিকা সম্পাদক।
- ৮। শ্রীহৃদীন সেনগুপ্ত— “ “
- ৯। শ্রীশকুন্তলা গুপ্তা— “ “
- ১০। শ্রীঅমিতা পালিত— “ “
- ১১। ডাঃ প্রেমশঙ্কর আগরওয়াল প্রতিনিধি (শ্রেণী)
- ১২। শ্রীলিনা দাস “ “
- ১৩। শ্রীমীরা সেন “ “
- ১৪। শ্রীশ্রীর্না চট্টোপাধ্যায়

এ পরিষদের বহুমুখী কার্যকলাপের মধ্যে আছে প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা, বিতর্ক, আলোচনা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, প্রতিবছর প্রাক্তন আর বর্তমান ছাত্রদের সম্মেলনের ব্যবস্থা ও প্রতি পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া নবাগতদের আমন্ত্রণ ও বিদ্যায়ী ছাত্রদের অভিনন্দন জানানোও পরিষদের কার্যকলাপের অন্তর্গত। এ ছাড়া পরিষদ থেকে—“The Physiological Institute Journal” প্রতি বছর বের হয়। পাক্ষিক প্রাচীর পত্রিকা “প্রাচীরিকা” কলেজের উৎকৃষ্ট প্রাচীর পত্রগুলির অগ্রতম। আন্তঃপরিষদ খেলাধুলাও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

সাংগাহিক আলোচনা সভা :

১৯৫৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে বিশ্ববিশ্রুত শারীরতত্ত্ববিদ নোবেল লরিয়েট ডাঃ বি. এ. জসে আমাদের বিভাগ পরিদর্শন করতে এসে সদস্যদের অহুরোধে “দুষ্করণে অন্ত্রস্রাবী গ্রন্থির অভাব” প্রসঙ্গে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। পরিষদের ইতিহাসে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এবংসরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাংগাহিক আলোচনা সভায় আলোচিত হয়।

1. Biology of the World—Dr. August Pi Suner.
2. Researches for reviving the dead and clue to creation—Sri Rabindra Nath Sen.
3. Higher functions of Nervous System—Dr. Haripada Chatterjee.
4. Paper Electrophoresis—Sri Kantipada Chatterjee.
5. Science and Man—Sri Sisir Kumar Majumdar.
6. Condolence Meeting on the death of Dr. H. C. Mookherjee, Ex-Governor of West Bengal.
7. Enzymatic Basis of Narcotic Actions in Brain Tissues—Dr. J. Ghose.
8. Body Fluid in Cold—Dr. C. C. Deb.
9. Film Show—United States Information Service.
10. An Introduction to Aviation Physiology—Sqn. Ldr. Dr. M. K. Mookherjee.

জগন্ম বার্ষিক পুনর্মিলনী উৎসব :

এ বছরের প্রান্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২৯শে সেপ্টেম্বর। এবারে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন কলিকাতা স্থাশনাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কুমারনাথ বাগ্‌চি ও প্রধান অর্থাধ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। দুই দিবসব্যাপী উৎসবে বর্তমান ছাত্রদের দ্বারা “রত্নদীপ” নাটক ও প্রান্তন ছাত্রদের দ্বারা “গন্শার বিয়ে” নাটক অভিনীত হয়। এছাড়া প্রান্তন ও বর্তমান ছাত্রদের ফুটবল খেলা, ঋতুরঙ্গ সহ-অভিনয় প্রসঙ্গে বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়।

বার্ষিক ভ্রমণ :

এ পর্বন্ত আমাদের বার্ষিক ভ্রমণ হয়েছে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে। এবার আমরা ভ্রমণে যাই পার্বত্য অঞ্চলে—শিলং, চেরাপুঞ্জি, কামাখ্যা, দার্জিলিং, গৌহাটী। ভ্রমণ খুবই আনন্দপ্রদ হয়েছিল।

এবছর আগষ্ট মাসে আমাদের পরিষদের ভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও সহসভাপতি শ্রীহৃথময় লাহিড়ী সরকারী বৃত্তি পেয়ে Oxford University-র Biochemisry-র Head of Department Dr. Krebs (N. L.) অধীনে গবেষণা করতে গিয়েছেন। তাঁকে বিদায় অভিনন্দন জানানো হয়।

পরিষদ মুখপত্র “প্রাচীরিকা”র ঐতিহ্য আজও অগ্নান রয়েছে।

শিশির মজুমদার—সাধারণ সম্পাদক

পদার্থবিজ্ঞা সেমিনার :

পদার্থবিজ্ঞা সেমিনার আমরাই প্রথম আরম্ভ করেছি বলে গর্ব অনুভব করছি। প্রথম বৎসরেই আমাদের কাজ বেশ ফল্গুভাবে পরিচালিত হয়েছে। আমাদের আলোচনী সভায় ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রচুর সাড়া পেয়েছিলাম। নানারকম সাহায্য ও উপদেশের খাতায় শ্রীদিলীপ ভদ্র ও শ্রীনিত্যরঞ্জন নাথের কথা উল্লেখ না করলে অকৃতজ্ঞতা হবে।

আমরা নিম্নলিখিত ১২টি আলোচনী সভার আয়োজন করি।

Differential Equations—কমলকুমার দত্ত।

Taylor Expansion—তাপসকুমার মৌদক।

Compton effect—শিশির ভদ্র।

The Bohr atom—তাপসকুমার দাস।

Fourier Analysis—রণেন্দ্রনারায়ণ বিখাস।

Rutherford Scattering—দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত।

Inverse Square Motion—কমলকুমার দত্ত।

Cosmic rays—দিলীপ ভদ্র।

Some ideas on Probability—মনোজমোহন ভট্টাচার্য।

Trends of thought in modern physics—তাপসকুমার দাস।

Minimal principles—হুবল দাশগুপ্ত।

Classical mechanics—Hamiltonian and Lagrangian Formalisms—কমলকুমার দত্ত।

আগামী বৎসরে শ্রীচকল মজুমদারের পরিচালনায় সেমিনারের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কমলকুমার দত্ত—সম্পাদক

ভূ-তত্ত্ব পরিষদ :

ভূ-তত্ত্ব পরিষদের ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সালে এর প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৫৭ ভূ-তত্ত্ব পরিষদের “সুবর্ণ জয়ন্তী” উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পরিষদের বার্ষিক মুখপত্র “ভূ-বিজ্ঞান” ঐ একই দিনে প্রকাশিত হবে। বিশেষ স্মারক সংখ্যা হিসাবে এবারের “ভূ-বিজ্ঞান” যথেষ্ট আকর্ষণীয় হবে আশা করা যায়।

ভূ-তত্ত্ব পরিষদের মত ছাত্র-প্রতিষ্ঠান বহু জায়গাতেই বিরল। ভূ-তত্ত্বের বর্তমান ছাত্র ব্যতীত প্রাক্তন ছাত্ররা অনেকেই এই পরিষদের সদস্য। ছাত্র ব্যতীত পরিষদের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২২২। অত্যন্ত বৎসরের ছায় এখানেও আমাদের দেশের ও বিদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা ভূ-তাত্ত্বিকের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। ভূ-তত্ত্ব পরিষদের আলোচনা সভাতে তাঁদের বক্তৃতার বিষয়বস্তুগুলি নীচে দেওয়া হ’ল।

1. “Origin and Occurrence of Petroleum” by Dr. P. D. Track.
2. “Difficulties of defining Ore and Ore Deposits”—by Prof. Russell Gibson.
3. “Seismographic Exploration” by Mr. E. Kingsley.
4. “Development of Australian Brown Coal Mines” by Mr. H. G. Mantel.
5. “Development of Mineral Resources in Australia” by Dr. A. K. Banerjee.
6. “Occurrence of Crioceris in India” by Dr. Satya Sadhan Sarkar.
7. “Geology and Morphology of the Bana Shigri area, E. Punjab” by Sri G. N. Dutta.
8. “Earth tremors in Bhopal” by Dr. A. G. Jhingran.

এছাড়া প্রতি শ্রেণীর পাঠচক্রের কাজ মোটামুটি সম্ভাব্যজনক।

* * * * *

পরিষদের তরফ থেকে এবারে “Scientific Indian Glass Co. Ltd”—এর কারখানা দেখাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই ব্যাপারে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রদের উৎসাহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র পরিষদের উদ্যোগে মারে মারে দেখান হয়েছে। এদের মধ্যে British Information Service-এর সৌজন্যে প্রদর্শিত “The White Continent” চিত্রখানিই বিশেষ সমাদর লাভ করে।

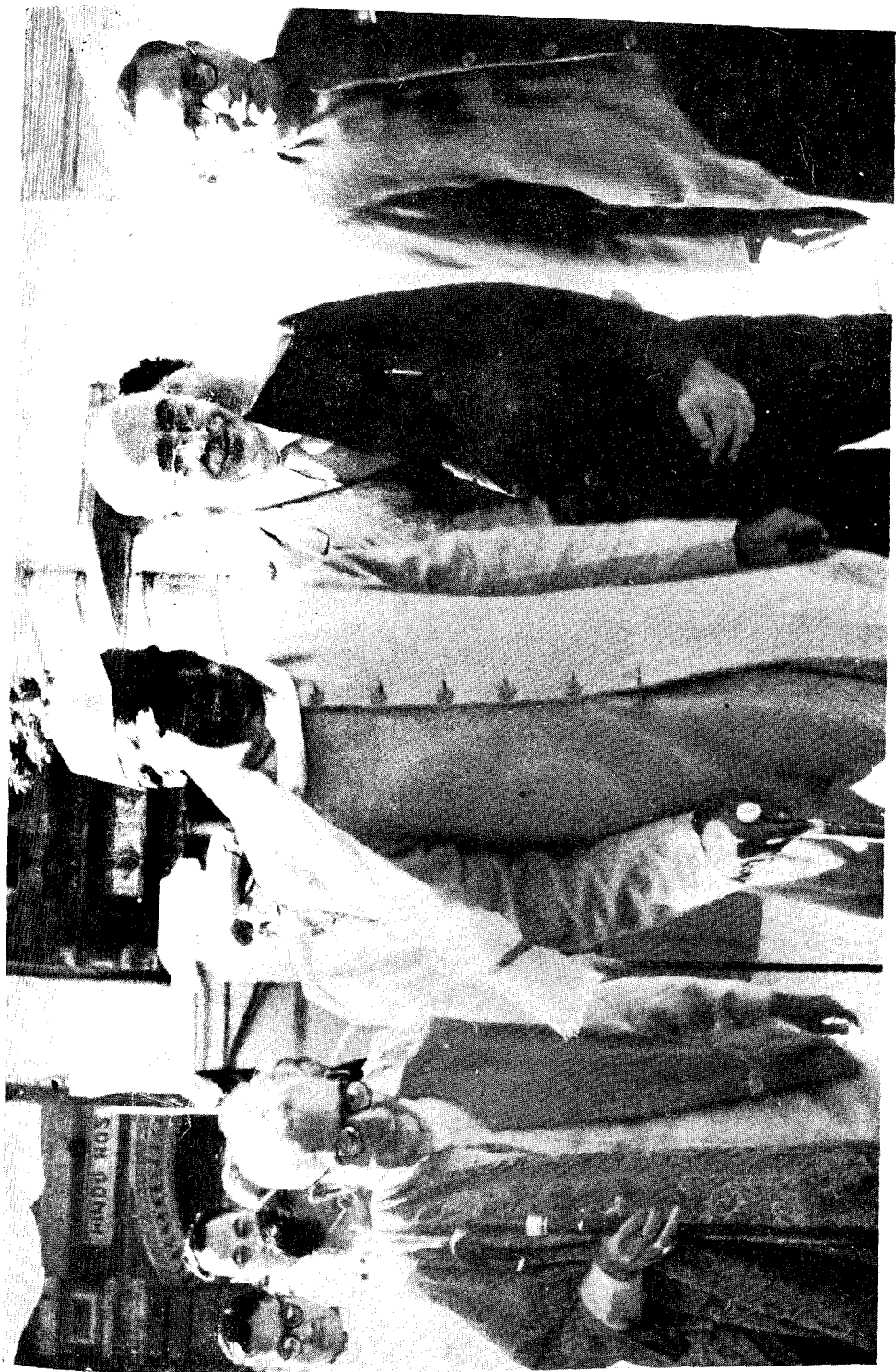
* * * * *

পরিষদের প্রাচীর পত্রিকা “The Institute Reporter” নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

* * * * *

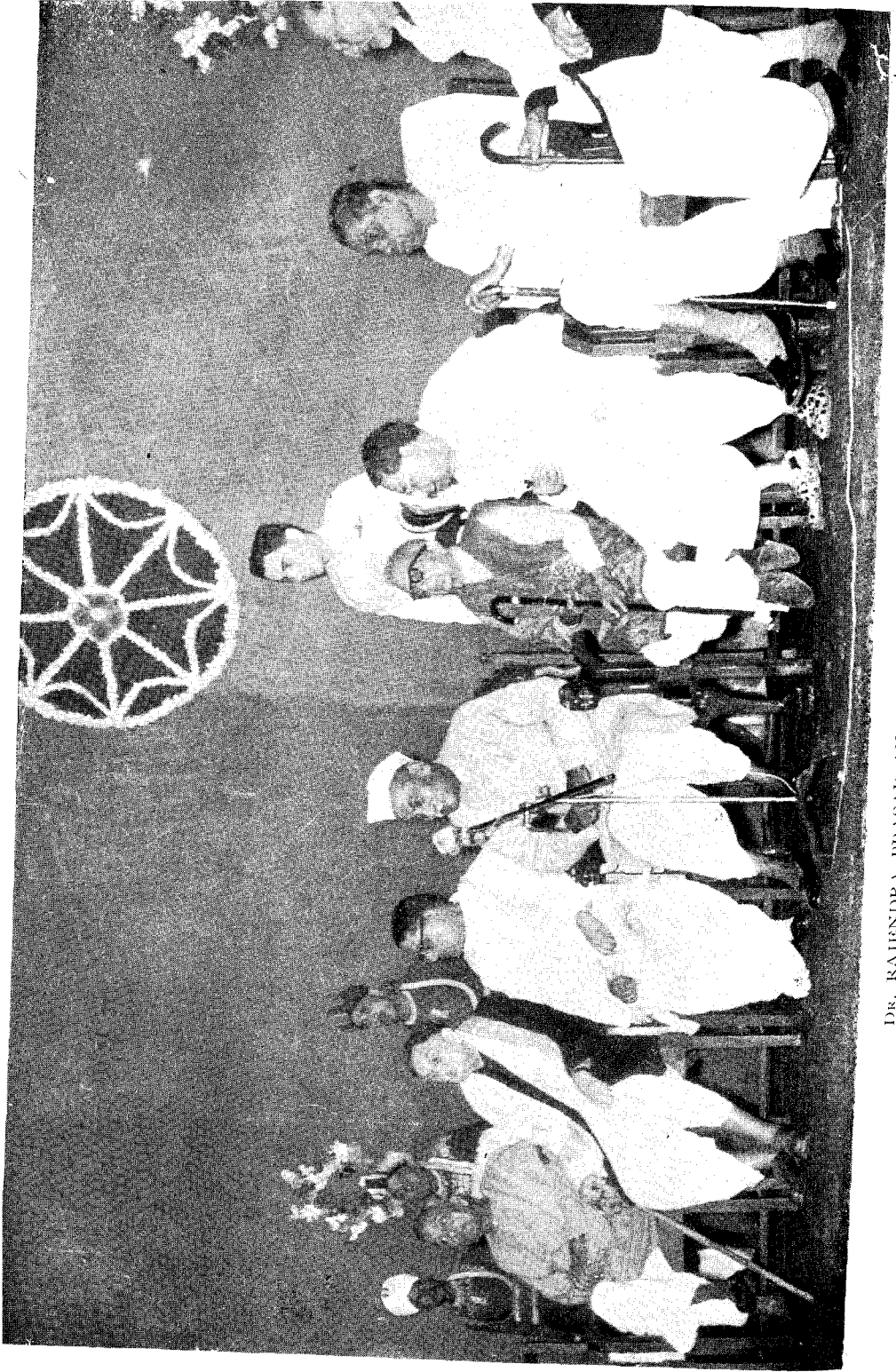
সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে—তাঁর অমূল্য উপদেশ ও আন্তরিকতার জন্য। পরিষদের কর্মপরিচালনায় যে সমস্ত ছাত্রবন্ধুদের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রদীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—সাধারণ সম্পাদক



(From left to right).—Dr. Radhakumud Mukherjee, Dr. Rajendra Prasad, Mr. Friend Perera (Principal), & Prof. W. N. Rudra.

[Photo by K. Basubramanian]
—6th Yr. M.Sc.



DR. RAJENDRA PRASAD AND SOME OF HIS OLD CLASSMATES.

Photo by K. Rajagopalan

THE PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Thoughts for the Founders' Day

Presidential Speech of

DR. RADHA KUMUD MOOKERJEE, M.P.

It is given to few Institutions in the world to be able to attain a longevity of 100 years. The college has produced through the century a galaxy of great men who have shed lustre on the whole country, leaders in the spheres of thought and action, scientists and philosophers, statesmen and administrators but the most distinguished of them all is our great President, an old boy of the college, who is universally esteemed for his unique contribution to the cause of the country's freedom and his rare qualities of head and heart.

I deem it my duty to take advantage of this significant occasion to press for some urgent improvements of the Institution in the light of modern educational thought. My first suggestion is that as the primary factor of educational efficiency the college should be enabled to maintain a proper proportion between the number of teachers and taught. There should be an extension of the tutorial system under which there should be one teacher to act as the guide and guardian of a group of not more than 10 students. The phenomenal success of the great University of ancient India at Nalanda, a University which functioned for over 500 years, and attracted by its reputation students from foreign countries like Korea, Mongolia, Japan, China, Tukhara, Tibet, and Ceylon, had on its rolls 8,500 students, who were taught by 1,510 teachers, as recorded by one of its students in residence for 5 years from 635 A.D., the learned Chinese Scholar Yuan Chwang. The University was run as a post-graduate research Institution under teachers daily delivering between them 100 Discourses to 100 Seminars on 100 different subjects. This ideal of personal individual instruction is now being aimed at in the field of education all over the

world. The Massachusetts Institute of Technology for instance employs 1174 teachers to instruct its 4,874 students in as many as 900 different subjects of science and technology so that there should be one teacher to take charge of 5 students for advanced specialised study. An American philanthropist Harkness has made a donation of several millions of dollars to his Alma Mater, the Phillips Academy at Exeter, on the express condition that the ratio of the number of its teachers to taught should be at least 1: 10. The Reed College of Oregon employs 60 teachers to teach its 600 students and turns out more scientists and Rhodes Scholars than advanced Universities like Columbia or Chicago. Towards this fundamental pedagogic standard, the U.K. Government has increased its educational budget to about Rs. 350/- crores. It is noteworthy that the Presidency College has been able so far to capture this educational ideal in a commendable degree in the ratio of about 1: 13 in the number of teachers to taught.

My next suggestion is that, following the Report of the Asquith Royal Commission on Cambridge and Oxford, provision should be made for select scientific studies to replace those which are outmoded in this Atomic Age. Among these new subjects the Commission mentions Ballistics, Short-Wave Study, Sound-ranging and Wireless, Reactor Technology and generally the various developments of Nuclear Physics. The introduction of the study of these new subjects depends on the University and not on a college but this college may act as a pioneer in this matter. The Asquith Commission also recommended a greater integration of studies in the Sciences and Humanities in the interests of both. Lord Peel and Gladstone were double first in Mathematics and Classics. In India the study of Humanities must be based on a study of Sanskrit as the record of Indian thought which is universally recognised as a unique contribution to the culture of mankind. The Presidency College has taken the lead in the study of Sanskrit and ancient Indian culture and produced eminent scholars in this field.

In conclusion, it is my duty and pleasure to congratulate those meritorious students on whom the awards of different distinctions have been bestowed by the college. Their Alma Mater expects them to be examples of citizenship in Free India and they can have no better inspiration as citizens than the following message delivered to his disciples by the Great Buddha: Charatha Bikkhave Chārikam—

Bahujana hitāya bahujanasukhāya
 Atthāya Hitāya Sukhāya
 Devamanussannam.

“Go out, ye Disciples, on Missions of social service, dedicating thyselfs to the promotion of the Common Weal, the Welfare of the Many, their Happiness and Prosperity, and that of both gods and men.”

Marxism and Literature

SURAJIT SEN

3rd Yr. Arts

"It was Hegel who said that any philosophy may be reduced to empty formalism if one confines oneself to the simple repetition of fundamental principles"—John Lewis, "Marxism and its critics."

In the course of a recent lecture on "Fiction and the criticism of Fiction" Mr. Philip Rahv says something that is relevant to our essay in more ways than one. "If the typical critical error of the thirties," he tells us, "was the failure to distinguish between literature and life, in the present period that error has been inverted into the failure to perceive their close and necessary relationship. Hence the effort we are now witnessing to overcome the felt reality of art by converting it into some kind of schematism of spirit." It is precisely this way of looking at literature, this "schematism of spirit" that Marxism is concerned to challenge, and it is in such a context that its strongest appeal is made. The strength of the error and the courage and power of mind needed to challenge it can hardly be over-emphasized. Formulated at a time when the formidable edifice of the Hegelian system was disintegrating into the weirdest variety of philosophic sects, the Marxist theory had the bracing effect of a tonic. And like a tonic it appeared to those nourished on the typical Victorian literary attitudes—attitudes which, to quote Dr. Leavis, held that "Gifted individuals occur, inspiration sets in, creation results." Marx, by laying bare the network of relations that integrate all man's activities into one causal process, fashioned an instrument which no critic who wishes to think intelligently about his craft can afford to ignore. But we must limit our problem if we are to solve it and Marx who was occupied with the revolution in economy effected by capitalism, had little time to spare for the detailed explication of that portion of the Preface to "A Critique of Political Economy" that is our major concern here.

We have remarked earlier on the challenge to existing critical modes that this view of literature entailed. By insisting that literature is more than a succession of isolated figures, Marx implied that it was something organic. Sixty years after the publication of the Preface to "A Critique of Political Economy" this notion of organic form was to receive definitive expression in Mr. Eliot's classic "Tradition and the Individual Talent." The invocation of Mr. Eliot in such a context might appear gratuitous and, of course, the

differences are as remarkable as any possible correspondence. But both views have this in common, that literary evaluation, if it is to be responsible and not merely impressionistic, must acquire what Mr. Eliot calls "historical sense." History—"social existence" as Marx has it, "the mind of Europe" Mr. Eliot says—is the matrix in which literature is created and to which our judgments must be related. "History" is not as simple a category as its use in the hands of certain critics would lead us to believe; and Eliot, like Marx before him, is concerned with defining a particular problem—the relation of the artist to his predecessors. But the approximation is suggestive.

To say that a writer is the product of the historical conditions of his time is not of course, to say that he is passive or that his work is a museum piece. "Like the Communist Manifesto, Jonathan Wild emerged out of history; that does not mean that it is dead."* The more, in fact, one thinks about it, the more it appears that Marx's formulation raises as many problems as it solves. What do we mean when we say literature is a "reflection" of reality? Plekhanov and a number of sociologists after him took this to imply that the writer reflects the psychology of his class. From such a view (not unrelated to Plekhanov's hieroglyphic epistemology) it followed as a corollary that the writer was really irresponsible for his work and that the task of literary criticism consisted in the re-translation into terms of actual life of the symbolic rationalisations of the author. Such a view, which we might with justification term the "schematism of economics," could hardly rouse much enthusiasm for that cultural tradition which Marxists are so quick to invoke (and defend). What is more to the point is that it is contradicted by even the most superficial reading of the classics. What the writer responds to is a total situation, a response which involves an agonising "wrestling with the angel" of reality. The Keats who wrote the Nightingale Ode was clearly not reflecting the conditions of his civilisation in any passive sense. Indeed, the term "reflection," as Mr. Lindsay has argued, has served its polemical purpose and should be discarded if we are to avoid confusion. The weight of external reality crushing the carbon of the ego to produce the immortal diamond, that is how Mr. Spender describes the poetry of Rimbaud. In the surrender of the personality to something more important, argues Engels, lies the greatness of a Balzac. These writers give us the emotional tenor of life at moments of social crisis and to see them as subscribing blindly to the values of a class is to exhibit a singularly obtuse sensibility. Rimbaud, like Hamlet, voices the aspirations of humanity at a moment when those aspirations are not historically realisable: it is this contradiction which explains "the residue of idealism"² to be found in the works of the great writers of the past.

¹ See Arnold Kettle's essay "The Progressive Tradition in Bourgeois Culture" which remains as a landmark in Marxist literary criticism.

² The phrase is Mr. Kettle's.

Plekhanov's theory reveals an interesting and characteristic preoccupation with literature more as an occasion on which to wield the dialectic than as something to be responded to. And later Marxists have not been slower to evoke a political response in place of a judgment related closely to the medium by which any literature lives, if it has life at all: the printed words on the page. This is the confusion between literature and life that Mr. Rahv found characteristic of the 'thirties¹. When, for example, the Marxist critic invokes Shelley as the Great Poet, is he really basing his evaluation on his experience of the spate of untidy imagery and embarrassing emotionalism that characterise so much of Shelley's verse, or is he merely remembering Marx's aphorism on Shelley and Byron?

"The merit of a poem," we are reminded, "is measured by its accuracy, not by the importance of a rough approximation to what is being said." And it is sufficient to think of poetry to recall how astonishingly bare of results the Marxist approach to literature has proved. We need not impute this to some inherent defect in the dialectic itself. The responsibility rests to a large extent with the creative writers who have adopted the standpoint of Marxism. Arguing on the basis of their own felt needs, Eliot, Empson and others succeeded in achieving a radical revaluation of literary concepts and history. The symbolists in France likewise proceeded to construct an aesthetic that would, they felt, rescue the writer from the sterile Romantic-Parnassian polarities.

In every critical revolution it is always the writings of the practitioners of literature that provide the seminal, the growing points round which a new aesthetic is erected. Reading the speeches of the recent Soviet Writers' Congress or the writings of Howard Fast it is difficult to remember that these pronouncements are made by individuals having a direct and intimate knowledge of the intricacies of the creative process.² Repeated admonitions to the writer to be aware of his great task—which nowhere achieves concrete definition—self-conscious criticisms of their own work and a confident assault upon Western literature and Western literary values: all this phrased in the paralysing jargon so characteristic of this type of Marxising is to be found in abundance in the reports of the Congress. But we look in vain for the pressure of the artist's own experience. Thus, is the spirit of the dialectic perverted and Marxism itself reduced to empty formalism.

The Marxist writer, argues Ralph Fox in his stimulating essay on "The Novel and the People" must assimilate and reorganize the learning of his time. A failure to achieve such a synthesis must go a long way in explaining the failure to evolve a Marxist aesthetic. It has, for one thing, resulted in the curious fact that while Marxist methodology constitutes a

¹ Miss Annete Rubinstein's recent "The Great Tradition in English Literature" offers a truly monumental example of this confusion.

² Does this, one wonders, have any bearing on the relative mediocrity of post-war Soviet fiction? Certainly a new literature and a new criticism go hand in hand.

radical departure from Victorian modes, a modern critic, Mr. Cleanth Brooks, can with some justification, allude to its literary evaluations as Victorian in its message hunting. And yet recent critical notions—paradox and ambiguity for example—are such as one might have expected the Marxists themselves to discover and apply. Formulated as they have been by bourgeois writers, they have acquired an unduly one-sided emphasis. It is the distinction of Caudwell that he attempted this gigantic task. That he did not succeed or that his success was only partial is not the point, and today we can still profit by his example and insight. We say often enough that literature is conditioned by reality. Caudwell saw that it was itself a reality and as such having its own laws of motion, its own contradictions and, therefore, its own form. His endeavour was to evolve a set of critical procedures that would in their concreteness and complexity enable us to discriminate between our aesthetic experiences and perceive what gives them their relative significances. It is, I feel, only along some such lines of enquiry as he adumbrated that any Marxist investigation of the future can be profitably conducted. Only when such an analysis is attempted, when sociological and literary criteria are fused in one methodology, can a Marxist aesthetic emerge.

The "Imperfections" of Shakespeare's Stage

JASODHARA SENGUPTA

Fifth Year, Arts

"Piece out our imperfections with your thoughts"—says Shakespeare rather apologetically. It is true that Shakespeare's stage was full of "imperfections." Stagecraft was rather crude in Shakespeare's England. Yet, paradoxically enough, quite a bit of the excellences of Shakespeare's drama has actually originated from the very 'imperfections' which troubled Shakespeare.

But first of all, what was the Elizabethan stage like? The Elizabethan stage is a far cry from the modern stage. It had none of the picture-frame look of its modern counterpart; it was in fact, closer to the moving scaffolds of the Miracle plays. That is to say, the Elizabethan stage consisted, for the major part, of a platform jutting out into what may be called the auditorium. This platform, or the "outer stage" as it was called, was open on three sides. Just behind this came the 'inner stage' which could be screened off if necessary. In addition, there was a balcony or an 'upper stage.' The audience gathered on all the three sides of the stage, the 'outer stage' being flanked by the 'groundlings.' There was no artificial scenery. The Elizabethan stage was unadorned—it had no scene-settings, no elaborate 'wings' for entrance and exit (there being just two openings on the two sides to serve the purpose) and finally, no drop-curtain. The magic of the modern lighting system was totally uncalled for as the plays were staged in broad daylight.

Without any of these modern paraphernalia, Elizabethan stage, however, was closer to the people's heart, than any of the later stages. It was, no doubt, physically nearer. Modern stage wears a pre-eminently distant look, particularly when it is 'curtained off' from the audience. But there the thing was going on right before them: Dogberry discharging his duty, Lear raging, Hamlet anguishing. It was all an intimate affair.

The Soliloquies, which form the cream of Shakespeare's dramatic and poetic genius, bear testimony to this air of intimacy. While Soliloquising the hero would come up to the edge of the 'outer stage', so that he would be, for all practical purposes, one of the audience. It would be like taking the audience into confidence, as it were. Instantly a bond of sympathy would grow up between the actor and the auditor. He would feel, not for

Hamlet, but with him. But look what happens on the modern stage. The hero talking to himself—produces a most unnatural effect, moreover, he can no longer whisper the lines broodingly, as on Shakespeare's own stage, but has to shout and lecture at the audience!



Shakespeare's stage had no artificial scenery. To bridge this gap he sometimes used his pen for the brush; and the product was such lovely lines as

"Look, love, what envious streaks
Do lace the severing clouds in yonder east:
Night's candles are burnt out, and jocund day
Stands tiptoe on the misty mountain tops"

or, the short scene before Macbeth's castle or the flower-passage in 'Winter's Tale'. If the stage lacked in adornments the plays did not.

We talk of the life-like comprehensiveness of Shakespeare's tragedies. A good deal of it, incidentally, has direct reference to stage necessities. For instance, the fact that there was no curtain to be wrung down at the end of scenes or acts had a curious effect on the Tragedies. At the close of a Shakespearean tragedy there would be quite number of corpses lying about the stage, on a modern stage they would simply get up and walk off after the curtain has been wrung down. But on the Elizabethan stage the corpses had to be borne out and the stage cleared off.

"Let four captains
Bear Hamlet like a soldier to the stage."

This necessitated the play to go on for some time even after the protagonist had 'breathed his last'. This has the effect of broadening out the dramatist's canvas, so to say. We feel that tragedy is not the last word in life—it is only a part of it. The world outside goes on as usual and does not come to a standstill with the hero's death. Thus Malcolm carries on Macbeth's interrupted administration, Fortinbras takes over charge though the 'noble heart' of Hamlet has 'cracked'.

And the much-abused comic interludes in Shakespearean Tragedy! Tragedy, specially Elizabethan tragedy, uninterrupted, is a little too strenuous for the nerves of the audience. Hence some sort of relief is necessary to ease the tension. On the modern stage the necessary relief comes with the drop curtain. But on Shakespeare's stage the drama is one long run from the beginning to the end. However, the dramatist once again, pens his way out. He brings in the comic interlude and almost at once brings down the highly strung atmosphere to a lower key. In a way, therefore, the 'comic relief' is imposed by the stage. Now, what does Shakespearean tragedy gain by these patches? Once again, the artist's canvas is broadened out to coincide with life. Life is not one unmixed tear or laughter, it has space enough to accomodate both.

Coming down to the field of Comedy, three of the most popular of Shakespeare's comic heroines disguise themselves as men. These three are, if you will remember, Rosalind in 'As You Like It', Viola in 'Twelfth Night' and Portia in 'The Merchant of Venice'. Yet another, Beatrice in 'Much Ado About Nothing', is almost masculine in her boldness. Apart from giving rise to such excellent comic complication as in the scene between Rosalind and Orlando ('As You Like It' Act IV Scene I) or those between Viola and Orsino ('Twelfth Night' Act II Scene IV) and Portia and Bassanio at the end of the Trial Scene, this device of disguise has lent a peculiar vivacity to these heroines. Not a little does Shakespeare's comic would owe these splendid heroines. Yet, after all, it was a matter of convenience. The fact of the matter is that in Shakespeare's days the female rôles were

played by boy actors (remember the one in 'Hamlet?') and by disguising their sex Shakespeare's heroines were simply changing over to their own selves and feeling more comfortable about it.

Every cloud, therefore, has its silver lining. Shakespeare's stage was crude. It had none of the technical 'finish' of the modern stage. Yet, with 'all the imperfections on its head' it produced great results. We are grateful to it, for it gave us brilliant things like Hamlet's Soliloquies, the Porter Scene in 'Macbeth', the fool in 'King Lear' or the gallery of Shakespeare's unforgettable comic heroines. To quote a critic, "Shakespeare, out of the limitations of dramatic art in general and out of the particular limitations of the Elizabethan playhouse, has wrought his magic and summoned forth the semblance of a life more vivid than reality." Indeed, for an adequate estimation of Shakespeare's stage, the best we can do is simply to repeat what Shakespeare himself said about his Cleopatra: "She did make defect perfection."

The Fascination of Shop Windows

SASTHIBRATA CHAKRAVARTI

Second Year, Science

The artist is charmed by nature, the scientist is engrossed with his inventions, the politician is attracted by the dais, but for some shop windows hold a strange fascination. This fascination is truly noble. It does not entertain any idea of personal gain. Its conception is at once both sublime and real. There is no suggestion of material profit for it is only "fascination for fascination's sake".

It develops with the cultivation of habit. Gradually the habit intensifies and with repeated observances of this custom, one finds oneself a member of the refined and learned faculty of "window gazers". Once having become a member, it is essential that one should adhere to the unwritten regulations. Infrequent subscribers wishing to develop a more permanent membership will discover to their cost that this fascination for shop windows is not to be adulterated with a vulgar desire for possession. Like the "higher love" of Mr. Shaw, the allurements of shop windows should in no way be utilised for earthly existence, on the contrary, the virgin nature of this fascination is to be strictly maintained.

The objects exhibited in shop windows are meant to be looked at rather than purchased. For shop windows hold no fascination for the haughty

whose piercing glances discriminate and who are vulgar enough to buy on the counter whatever may appeal to them in the showcase.

The decorations are usually gaudy by nature; encased sometimes by plate-glassed windows; ornamented by ladies' ribbons; and furnished with velvet or silk. They are fossilised gems like those which fill the museum cases, with hearts of stone, jealous of their independent position. They are the ready preys to an inelastic political system which is repulsed by any idea of foreign domination. They love their home and do not wish to leave it. The exhibits are rarely induced to stray. They are an integral part of shop windows.

The monastic rigour with which the accomplished windo-gazer fulfils his duty—perhaps more than once in a day in the fashionable quarters of the city—without the slightest inclination to buy, is really to be admired. These ascetics are men (and women) of the very highest calibre in society and accordingly should be deputed to the barred habitats of honest people. For such idleness is a pathway to delinquency.

This rigid asceticism scarcely appeals to humbler mortals who are intently concerned about the mundane existence of our dreary lives. For those who will refrain from exercising heroic control over their baser passions and give vent to their desires, shop windows hold little or no fascination. Only those who, without inhibitions, subscribe to a loftier theme will fall a prey to the allurements of shop windows.

A Critique of Marxian Economics

ASHOK GUHA

Fourth Year, Arts

Old prejudices, we are told, die lingering deaths, and they are not without their cyclic resurrections and recurring burials. The past is always with us; ancient error must ever disturb the rarefied atmosphere in which our intellectuals live, move and have their being. Our greatest arcadias have their ghosts, even that most 'progressive' and, is that magical modern catchword, 'dynamic' of our intellectual systems, Marxism, resounds with reminiscent echoes of man's oldest illusions.

Essentially, Marxism is an attempt to transplant the Hegelian dialectic on the bedrock of a Materialistic Conception of History. Its primary claim is that technological development is the motive force behind the unfolding of history. Technique uniquely determines the relations of production, the pattern of distribution of the instruments of production. Economic power concentrates in the class which owns these instruments, economic power confers social, political and legal powers, as well, so that society is dominated by this class, and the cultural and political values of the age become but images of the economic base. Power, moreover, is exploited for the fulfilment of the economic motives of the rulers; a conflict of economic interests develops between the rulers and the ruled, precipitating a revolution from which the exploited class rise victorious. History, thus, reduces to a succession of class-struggles; the class which most efficiently exploits current technology calls into being its antithesis with further technical development, until ultimately the old order changeth, yielding place to the new.

The economics which fall neatly into this prefabricated mosaic depend on the twin pillars of the Labour theory of Value and the Surplus Value theory. The whole value of a commodity, on this analysis, derives from the volume of socially necessary labour invested in its production. But the wages of labour, by the now discredited Iron Law, oscillate about subsistence-level, so that the product of labour exceeds its remuneration. The excess comprises surplus value, which is appropriated by the capitalist. This exploitation of the worker is the stimulus to the class-struggle between capital and proletariat.

Capital maximises profit at the expense of an expanding Industrial Reserve Army of the unemployed, displaced by machinery, and increasingly consolidated by the consciousness of a common interest. Again, competition favours large-scale production and the larger capitalist. The smaller

capitalist is ousted and precipitated into the proletariat with the growth of monopoly capital. Society is increasingly polarised, with the concentration of capital, into conflicting camps. What is more, the rate of profit falls, as unproductive machinery is increasingly substituted for labour, which is the only source of value. Industrial crises develop, the class-struggle intensifies. Finally, the expropriators are expropriated; and the millennium arrives.

* * *

The historical doctrine thus expounded rests on assumptions which the faithful choose either to overlook or to invest with the sanctity and infallibility of religious dogma.

Firstly, it assumes a unique connexion between the state of technique and the relations of production. This connexion, unfortunately, is pure wish-fulfilment, a bridge of sighs between two independent phenomena. Thus modern technology is integrated alike into the Soviet and American productive systems, despite the difference in class relations. Nor is this difference transitory, since American capitalism appears, to the rational mind, to be undergoing a transformation, not according to the Communist, but according to the welfare state ideal, and this new development is, unfortunately, all too likely to be internally stable.

Secondly, the doctrine assumes that economic power alone confers social, political and legal power, while, in fact, the reverse is equally true. Property is not the only source of power; witness the power of the scientist who, even on the Marxian analysis, controls the unfolding of history through the development of technique. Even conceding this assumption, the acquisition of property except by inheritance (which is insignificant in the modern welfare State) is the product, not of economic power, but of non-economic ability. The relation between economic and non-economic forms of power is circular, rather than linear.

Thirdly, the historic necessity of the class-struggle arises, not from any mystic impulse, but from the consciousness of the conflicting economic interests of classes, moved primarily by economic motives. And, it is amusing how Marx, after superciliously labelling senior and his disciples as vulgar 'economists,' proceed to exhume from its weed-grown grave the most discredited of their concepts—that of the Economic Man. Behind the Materialistic Conception of History, a whole race of devitalised economic Men crawl on their bellies towards a classless paradise at the end of the dialectical spiral, while, in the background, the vulgar economists nod approval. Indeed, the economic motive, the incentive to economic power, is no self-sufficient impulse; power and wealth are not end in themselves, but means to the satisfaction of a multitudinous complex of motivations, the instinct of self-preservation, the love of power and distinction, the desire for security, fellow-feeling, family-affection and love all sustain the economic

motive, and may as readily flow into other channels and find other expressions. The economic motive, far from being a primary human motivation, is, then, not even a self-sustaining impulse; and the simplification of the tortuous human psyche that the Economic Man concept involves renders Marxist theory distressingly inapplicable to the daylight realities of the living world.

Marx's imposition of abilateral structure on the complex and composite social entity follows logically from these insecure premises, and diverges accordingly from experience. Ours is, indeed, a world stratified in many dimensions, of which the economic is but one. Fraternity of economic interests between the workers of the world was, for instance, submerged by a sense of political division at the memorable dinner at which the British Labourites are said to have ruined Mr. Khrushchev's substantial appetite by broaching the delicate subject of Social Democratic prisoners in the Soviet Satellites. Moreover, community of economic interests, itself, even among the workers of the world, has evaporated in a world of inflationary pressure and competitive wage-bargaining by rival trade unions.

Indeed, as Croce suggests, the Materialistic conception of History applies, not to the world of reality but to Marx's private world, peopled by the phantasmagoria of Economic Men, with a unified, idealised proletariat in relentless conflict with the organised forces of tyrannical capitalism. Unfortunately, this is strictly a private world.

*

*

*

Marxian economics collapse in the very first chapter of 'Capital' in the course of what Marx, with a splendid display of the faith that surpasseth reason, believes to be a scientific proof of the Labour theory of Value.

A loaf of bread, notes Marx, may exchange in the market for a cask of ale. This equality of exchange-values suggests the existence of a quality common to both goods. But their physical or geometrical properties do not coincide, nor do their use-values. The only remaining property, concludes Marx, is the labour invested in their production, which, accordingly, is their only source of value.

The interesting demonstration has a prologue. In this, Marx postulates that natural resources, which are not products of labour, have no exchange values—a ludicrous assumption, reducing the demonstration to argument in a circle.

As for Marx's isolation of labour as the only property common to different good—this is the consequence of intensive preoccupation with supply factors to the painful neglect of demand. It is, perhaps, unfortunate for Marx that, in the words of the limmerick,

The little bird
Had never heard
Of marginal utility

And, it is, perhaps, below our dialectician's dignity to note those qualities so conspicuously common to both bread and ale—utility and scarcity in proportion to demand.

Moreover, the labour socially necessary for bread-making and wine-making is so heterogeneous that, for comparison, it must be reduced, according to a scale, to unskilled labour as the standard. The scale is formed, according to Marx, by a mysterious social process, explained by Hyndman and other Marxists as the competition and bargaining of the market. Value, then depends on incorporated labour, but the measure of labour derives from market-values, so that we arrive at the profused, irrefutable, but futile conclusion that value depends on value.

The surplus value theory, the super-structure of this house of cards, constitutes one of the comedies of modern economics.

Marx divides capital into constant and variable—that sunk in the means of production, and that invested in labour power. By the Labour Theory of Value, variable capital alone is productive of surplus value, constant capital merely transferring its value unchanged to the product. Accordingly, it should pay the capitalist to employ a higher proportion of variable and a lower of constant capital i.e. more of labour and less of machinery—a conclusion in glowing contradictions with facts.

Marx's explanations and its fallacies are best treated algebraically.

The total labour power L comprises an amount l , productive of surplus value, and an amount w , accounting for the wages of labour (i.e. for variable capital).

$$\therefore L = l + w - (l)$$

The total capital C comprises a variable amount c .

$$\therefore C = c + v$$

$$= c + Wx, \text{ where } x \text{ is the productivity of labour.}$$

$$\text{From (1), } Lx = lx + Wx$$

$$\therefore \text{Profit, } P = Lx - C \\ = lx - c$$

Labour productivity, x , is by the Labour Theory of Value, unaffected by mechanisation. From the equation $P = lx - c$, mechanisation by increasing c , reduces profits, unless accompanied by an increase in l . And this according to Marx, does happen, so that mechanisation increases $(lx - c)$.

\therefore From the equation $Lx - C = lx - c$, it also increases $(Lx - C)$.

But since machinery displaces labour, thus reducing L , since x and C are assumed constant, this is absurd. Hence, Marx's explanation is not self-consistent.

Yet another disturbing consequence of the Surplus Value Theory is the conclusion that industries with higher proportion of variable capital should yield more profits than those with a lower—the precise opposite of the truth.

In elucidation, Marx is reduced to claiming that hitherto he had referred, not to goods separately, but to the social product as a whole; not to capitalists as individuals, but as a composite group, the surplus value won by all being distributed among all. Profits here are equalised by competition, but the uniform rate of profit demands that some goods sell above, and some below their values. Thus does Marx sacrifice his initial assumption that goods exchange at their values. Simultaneously, he creates a divergence between value and price; Marxian value becomes just that abstruse metaphysical abstraction that must result from distorting reality into harmony with a preconceived formula.

* * *

As for the train of Marxist prophecy, its stately sequence has been ruefully disturbed by the unfolding of history.

The rate of profit, far from falling, is buoyant as never before. Secular exhilaration, rather than stagnation, faces the post-war world, even if the inflationary pressure of armament production be discounted. Nor is this surprising, for the doctrine of the falling rate of profit is a logical corollary of the Labour theory of Value and collapses with it.

Again, while industrial control has concentrated in the salaried managers of big business, the evolution of the principle of limited liability, divorcing ownership from control, has dispersed ownership of capital goods among a multitude of small savers and shareholders. We view capitalist concentration, in the Marxian sense of a centralisation of ownership, from the distance enchanted, especially in welfare states, where taxation has reduced incomes to a drastic equality.

The Industrial Reserve Army, the Marxist 'young man's vision and old man's dream' remains a dream, shorn not only of its nightmare menace, but even of its shadowy existence. Indeed, Marx's concept of long-period technological unemployment is strangely reminiscent of that of the Technocrats, who were laughed into oblivion during the days of the Depression. Labour saving innovation, doubtless, temporarily displaces labour; but it creates new products and consumption standards, cheapens old products and leads to the expansion of a mass market. New channels of investment in the capital goods industries develop the deepening of capital stimulates demand to such an extent that displaced labour is rapidly absorbed, and, in the long period, an expansion, rather than a contraction, of employment follows.

Finally, by the Law of Increasing Misery, the pressure of an expanding substratum of the unemployed was to depress living standards and real wages, or—as later Marxists, wiser and sadder, choose to interpret—the share of labour in the total product. Unfortunately, however, the real wages of English labour have multiplied threefold since the appearance of the first volume of 'Capital' in 1864. Moreover, the share of labour in the total

money income has been substantially constant, while its real share has actually increased: the prices of wage goods have fallen more than those of luxuries, since wage-goods have a mass market, which has stimulated their economical mass-production. The capitalist engine of production has increased the purchasing power of the wage-dollar more than that of any other dollar; it has raised living standards far more at the base than at the peak of the social pyramid.

* * * * *

Indeed, the Marxist mystique, like most other mystic cults, lacks a rational basis, the psychic elements out of which its magic spell is woven are, however, not far to seek. In its prophecy of the decline and fall of capital, it represents the rosy wish-fulfilment of a displaced feudal oligarchy. It embodies the emotional frustrations of a class, created by the capitalist engine of cheap mass-education, far in excess of the capacity of the liberal professions to absorb, and forced into employment to which it is maladjusted. It thrills the native admirers of Victorian science by its claim—spurious, yet attractive—to have reduced the unpredictable complexity of historical processes to simple scientific determinism. Finally, the glamour of infallibility with which later Communist thought has invested it, its totality of scope, the unquestioning faith it demands—offer to many a substitute for the security and stability of Victorian thought and religion.

Hence, as feudal resentments die out; as the realisation of the dignity of labour quells the disaffection of the educated, forced into manual occupation, as modern thought and research evolve a more balanced view of the place of determinism in science and sociology; as, finally, individual reason and intellectual liberty come to be valued above ideological rigidity and unquestioning faith—the Marxist myth recedes. Indeed, contrary to Marxist prophecy, it is only in the less developed countries that Marxism commands an appreciable following. For, after all, in an age of social democracy and the welfare state, it is essentially a thing of the past.

Some Aspects of Contemporary Capitalism

AMIYA KUMAR BAGCHI

Sixth Year, Arts

1. Is the mighty adventure of capital over? Or is it to sail over yet new seas and conquer yet new realms? The movements of social systems involve changes in the ways of life of those who are included in those systems. As such, the observation of such movements can rarely be without a bias. Yet a mid-century view of the contemporary world capitalism may be helpful for formulating our future programme of action.

The end of the Second World War has seen the emergence of the former colonial countries as partial competitors of the advanced capitalist countries. The fact that a third of the world has gone socialist and that trade with the socialist countries is frowned upon by the U.S.A. has led to a more intense exploitation of the rest of the world market by the advanced capitalist countries like the U.S.A., U.K. etc. At the same time the crushing of Japan, the liquidation of the overseas economic empire of Britain and the demolition of the French prowess have combined to make the U.S.A.—armed with a more rapid rate of technical progress—the undisputed leader of the capitalist camp.

2. Let us first review the prospects of a "Stable Capitalism" in countries like the U.S.A., U.K., etc. The Great Depression of the 1930's roused the economists in capitalist countries from their century-long complacency in regard to the automatic sufficiency of demand for maintaining full employment. Keynes led the attack on orthodoxy and formulated a programme. In a capitalist society—based on payment to labour in the form of money wages—expenditure of money by other people is the source of the capitalists' and their employees' income. Total expenditure is made up of consumption expenditure and investment expenditure. Consumption is limited at any moment by historical-cultural factors, and hence is stable as a proportion of income. But the motive force of investment or, what Marx called accumulation, is profit. If the rate of profit does not appear to be attractive enough, capitalists will not make investment of an amount sufficient to generate full employment national income. In that case, Keynes argued, public expenditure will have to be undertaken to fill the gap between the actual national income and the full employment national income: "a somewhat comprehensive socialisation of investment will prove the only means

of securing an approximation to full employment." (p. 378). He hoped that it would be possible "by a right analysis of the problem [of unemployment] to cure the disease while preserving efficiency and freedom." (p. 381). He admitted that in the past war has had economic causes, "namely, the pressure of population and the competitive struggle for markets" (p. 381). But he hoped that "if nations can learn to provide themselves with full employment by their domestic policy", "International trade would cease to be what it is, namely, a desperate expedient to maintain full employment at home by forcing sales on foreign markets and restricting purchases" (pp. 382-383). [All the page references are to Keynes' "General Theory" published in 1936]. His policy would also ensure "freedom and efficiency", according to Keynes.

3. Have the hopes of Keynes come true? Apparently, yes. There has been no major depression in the capitalist countries during the last ten years. The recessions of 1949 and 1953 in the U.S.A. were just rumbles which were warded off in time. But this fact will not support any bigger claims than that, for the time being at least, by whatever means, capitalism in the advanced countries has been able to reduce the amplitude of crises arising from insufficiency of demand.

4. Keynes' hopes could not have all come true, for his implicit faith in the liberal norm of free competition is not justified by reality. Under this assumption almost anybody can become a capitalist, if he has sufficient talents for satisfying the demands of consumers. Efficiency is enforced by the struggle for survival. The State does not come in, except as an impartial arbiter between the rival claims of capitalists or of capitalists and labourers. But modern capitalism is dominated by monopolies and "crypto-monopolies" where not one, but a few, sellers dominate the market. Prices now do not indicate the conditions of supply and demand on the market. Prices here act as "an umbrella which efficient and inefficient producers alike will tacitly agree to hold at a sale level over their heads and under which all will live comfortably, profitably and inefficiently" (Galbraith: *American Capitalism*, Chapter IV). The new corporate giants now spreadeagle many industries, and they extend their control over many lands. The very concentration of capital and its centralisation in ever fewer hands give the "robber barons" an opportunity to crush their smaller rivals, by means of sales drives, by means of introducing a new and cheaper method and by political manoeuvring. It is very hard not to be affected by the "snobbery about size" when approaching these private empires.

Will you have some facts? Here are they. A recent investigation by the Federal Trade Commission showed, for the year 1947, that the 113 largest manufacturing corporations in the U.S.A. owned 46 p.c. of the property, plant and equipment, employed in manufacturing. In the production of motor vehicles, agricultural machinery, rubber tires, cigarettes, aluminium, liquor, meat products, copper, tin containers and of office machinery [in the

U.S.A.] the largest three firms in 1947 did two-thirds or more of all business.' In Britain, the total profits of the four companies—Royal Dutch Shell, Anglo-Iranian Oil Co., Uralivers and I.C.I.—equalled one-seventh of all company trading profits in 1949 and by 1953 this proportion had increased to one-sixth.

Commenting on the fact that Royal Dutch Shell in 1952, sold products to the value of £1,616,000,000 even the 'Economist' exclaimed that this figure was three times the gross national income of New Zealand, and bigger than the gross national incomes of all but a handful of major world powers (Economist, March 16, 1953).

Not only in the field of production, but also in the control of supplies of raw materials the big giants dominate. When in 1888 J. B. Dunlop invented the rubber tyre, the necessity to acquire sources of rubber led directly to Dunlop's acquiring 90,000 acres of rubber plantations in Malaya—the largest area, as they now boast, under one management in the British Empire.

And big business has been always in company with big money in the management of the affairs of the capitalist world.

5. Some natural corollaries of this concentration of economic power have been firstly, the ability of the monopolists to influence government policies at their source; secondly, their ability to block any innovations that threaten their capital values, and thirdly, a motivation to extend their foreign markets in order to maintain their huge profits.

The policy of maintaining continuous full employment has been adroitly exploited to correct any existing maladjustment by overflowing the market with ever larger streams of purchasing power. Inflation has become the norm in postwar capitalism. In addition to increasing present income streams, inflation also decreases consumer saving and encourages the investment of all sums saved by ordinary people, for the real value of money is decreased with the passage of time. "Another social function of inflation is as a method of mollifying class conflict in a capitalist society", at least so long as it does not take away all the gains achieved in real terms. Strikes, for example, are short or non-existent when wage demands can be granted and then translated into price increases (M. Bronfenbrenner in "Post Keynesian Economics"). But can you fool all the people all the time?

The maintenance of a sellers' market has been facilitated by the monopolists, control over consumer tastes. Everybody knows the craze for purchasing the latest model Buick or Plymouth; and credit extended to consumers for purchasing these durable goods has risen very much in relation to the national income in the U.S.A. But a mounting debt spells trouble. Moreover, as a result of all these drives creating artificial demand, consumption has also become unstable.

The extension of the programme of government spending has been a major factor in the prosperity of modern capitalism. But this spending has

taken mainly the form of huge capital-consumption for defence. The U.S.A.'s expenditure on defence hovers round the level of \$40 billion and almost 10 million people are engaged in arms production and armed forces (Economic Notes, February 1955). Armaments expenditure has the eminent virtue of creating demand without at the same time extending capacity. Moreover, this furthers the foreign ambitions of monopoly capital. The militarization of the economy has meant increased possibility of control by the government over the main sectors of the economy.

6. But have the troubles of capitalism been over? By no means. In the first place, there is the group of troubles which quite orthodox economists have stressed—namely, those relating to efficiency and the loss of vitality. Monopolies have immense resources for developing new methods and new products; and when fighting against other giants these serve as formidable weapons. But they have also the ability to block technical changes which affect them adversely. As Sam Aaronovitch has observed in his informative Study of British monopoly: "Every great combine is deeply interested in controlling inventions in and around its sphere of influence. A great deal of what goes on in the laboratories of many of the big combines is concerned with the development of patents to remove the threat of competitors..... Today the U.S. combines are entering into a whole series of agreements with British firms whereby these produce under licence from the American firms on the conditions decided by the Americans." The same conditions prevail in regard to production in other countries. This not only means a less rapid rate of progress than is possible; but it also means the blocking of investment opportunities, for in the absence of rapid population growth, a rapid rate of innovations and aggressive competition inflicting losses on others are the main springs of domestic investment (See E. D. Domar, "Investment, Losses and Monopolies", in Essays in Honour of Hansen). The "safe" atmosphere generated by inflationary conditions prevents capital loss, and by prolonging the life of inefficient sectors of the economy, makes adjustment more difficult. Britain, especially has found to her cost, that maintaining the competitive efficiency of her export industries and thus protecting her balance of payments is a far more difficult task than maintaining full employment.

But even the maintenance of full employment has been a sham performance. The economists in the U.S.A. and Britain have accepted a certain percentage of unemployment as "normal" and necessary for maintaining "flexibility" of production. Thus Marx is vindicated by the unconscious spokesmen of capitalism. In the U.S.A., there has occurred a decline in total unemployment over the years 1940 to 1953 but there has been an immense increase in part-time unemployment, as a result of technological automation. Official statistics often mask the real situation: Technological unemployment as a result of automation has gone so far that it is beginning to affect office-work. Displacement of labour in the major productive

industries like mining, building, transport, processing etc. has been partially, but only partially, offset by a draft of labour into the armed forces and the relatively unproductive service industries. (See I. Kuzimov International Affairs, No. 4, 1956).

In the U.S.A., major industries like shipbuilding, agriculture, etc. continue to be depressed. In many other capitalist countries like Japan and France, the struggle against American competition and the decline in the growth of real capital—the means of employment—have involved a decrease in real wages of workers. It is only the countries which have huge economic empires that have been able to grant increases of real wages to their workers. However, as some recent studies have shown, the rise in real wages as shown by money wages deflated by a cost of living index often conceals a deterioration in working conditions and in provisions for maintaining health. Moreover, it can be shown that the devotion of a greater proportion of a country's resources to non-productive purposes like defence inevitably tends to bring down the real wages of workers.

7. But it is high time now that we turned to the international stage, where the real drama of modern capitalism is being enacted. On the eve of his Atlantic meeting with Winston Churchill in August 1941, President Roosevelt said to his son: "The British Empire is at stake here. It's something not generally known but British bankers and German bankers have had world trade sewn up in their pockets for a long time. . . . Well, now, that's not so good for American trade, is it?" (Elliott Roosevelt: "As He Saw It," p. 24). The great President was absolutely right in his prediction. Britain's losses of foreign investment ran to billions of pounds. And the U.S.A. gained even more, for she captured the former markets of Germany and Japan, and helped reconstruct the economy of war-ravaged Europe while she herself remained unscathed. "The U.S.A. has become a sort of super-imperialist State both protecting and exploiting the older and weaker imperialist powers—sometimes helping them to hold on to their colonial possessions, sometimes coming forward as the champion of a colony's independence in order to bring it directly into the American orbit" (Monthly Review, January 1956). This proposition can be supported by any number of illustrations. But let us take the case of oil only. "The entire production of oil in the capitalist world is dominated by seven firms: five American and two British". Let us see what has happened to this partnership over the years.

SHARE OF MIDDLE EAST OIL

			Controlled by Britain	Controlled by U.S.A.
1939	76%	17%
1952	33%	59%

(Data from Aaronovitch: Monopoly)

Besides other weapons, American "aid" has become a potent weapon for opening new markets to the U.S. business. The more rapid rate of American technical progress is also another factor; this is also one of the causes of the persistent "dollar shortage". Britain is paying the penalty of too much security in the old days in terms of lesser competitive efficiency.

We are moving into the rarefied atmosphere of international finance where also rivalry rages. Britain's post-war currency position has been characterised by sharp fluctuation in gold and currency reserves. She is fighting for preserving the "sterling area" of which India is a member. The most important feature of this system—itsself the child of the depression of the '30's when the free international currency market was replaced by a number of currency areas—is that 'under the agreement on the "dollar pool", the gold and dollar reserves of the sterling area countries are concentrated in London and their distribution is centralised. This agreement enables Britain to make use of a considerable part of the dollar and gold reserves for her own benefit. The U.S.A. is trying her best to abolish the sterling area, so that she may exploit the huge commonwealth market more easily and can also dominate the international financial system. The British bankers are not yet obviously losing.

But let us not continue the story any further. Let us not insist that the crisis of capitalism is in full swing. Or that, despite all manoeuvres, the Marxian law of falling rate of profit holds good when we consider all the investments of advanced capitalist countries together. "That which has not the grace of God is far better in silence."

8. We now pass on to the "underdeveloped" brethren in the comity of capitalism. What has happened to private foreign investment in these areas? Let us listen to the patient voice of very orthodox economist, S. Herbert Frankel ("Economic Impact on Underdeveloped Countries"). In the 19th century international investment was, by and large, and notwithstanding frictions and political interference, conducted on the implicit assumption that for investment purposes the world-economy of the Great Powers and their peripheral and colonial dependencies were one, and should be regarded as one. And in fact it did function broadly as a unity. What is the situation now? Everyone is crying for public welfare, somebody or other is hurling out threats of nationalisation.

Keynes wrote in 'the Nation and Atheneum,' August 9, 1924: "To lend vast sums abroad for long periods of time without any possibility of legal redress, if things go wrong is a crazy construction; especially in return for a trifling extra interest." When foreign capitalists are investing in the erstwhile colonial countries, do you think they will do so without the hope of fantastic rates of profits and they will not fight back with all the means at their disposal if their capital is threatened?

What is the advantage that the underdeveloped country secures? Here is what Frankel says: "A capital export to, or import by, an underdeveloped

country is not necessarily investment at all—it may well represent capital consumption”. What has Saudi Arabia or Venezuela gained from their vast royalties of oil? Will the capitalist countries easily give up their sources of raw-materials and moreover, help in the process by industrializing these countries? Do you know what is the position of these underdeveloped countries? Burma is chiefly dependent for her export on rice; Malaya on tin and rubber; Pakistan on cotton and jute; all these commodities are notoriously fluctuating in price. Over and above this come the huge American farm surpluses which are threatening the markets of Burma, Indonesia etc.

9. Lastly, another question. What are the prospects of rapid growth of these countries on a capitalist basis? As everyone knows the days when a talented entrepreneur could set up in business with a little capital are over. Schumpeter's entrepreneur who does new things in new ways is a rare creature in the underdeveloped countries. Now, if you have to start in business, you will have to start with a huge amount of capital. Thus these countries are from the very beginning dominated by monopolies.

At the same time, many of the features of the older colonial-feudal society are being retained, so that no major social transformation is taking place. Yet the governments of all these underdeveloped countries are talking of technical change. But, as Frankel has emphasised, technical change is not a matter of knowing only, it is a matter of performance. Performance requires new pattern of social relations. Capital also is in the last resort the action of man's labour upon the natural environment. Technical change is but one aspect of mutually determined and determining, processes of growth on many fronts of the social structure as a whole.

Therefore, capitalism as it has been introduced into these underdeveloped economies cannot transform the economy, for it is introduced only in some sectors of the economy and it is by nature atomistic. It is doing what it can do. It is breaking up the isolation of 'natural' economies and bringing them within the orbit of exchange-relations. Since the rate of growth of capital is slow in the underdeveloped countries and since at the same time it has a tendency to introduce the modern, cheap methods of production, it is creating enormous surplus population in relation to the means of employment.

Let us hope that later historians will be able to say of these capitalists: "Having done what men could, they suffered what men must."

A Few Notes on India's Peace Policy

PRANAB KUMAR BARDHAN,

Third Year, Arts.

Constant unanimity of public opinion on any subject is often a great deterrent to critical thought. When opinions differ on any topic, we can at least be sure that it would be subjected to much debate and discussion until all its aspects—both favourable and unfavourable, are revealed. The searchlight of criticism will be focussed on the minutest detail and there will be constant attempt on the part of all the contending sides to make their respective positions as unassailable as possible. But when a particular policy or action has the misfortune of being endorsed by all for a long time, without any dissenting voice, it produces some kind of indifference in the minds of the people and stifles their spirit of critical enquiry. If there is a long-standing opinion in a country about any policy that it is a very good one, and that no better can be conceived of, people, after a certain period, cease to view it in the critical light of reasoning, cease to discuss it threadbare and remain satisfied with certain vague notions about its splendid success. India's peace policy, I am afraid, is one such topic on which such superficial views do exist. It is admitted on all hands, leftist or rightist, that India is a peace-loving country, that she is making a commendable effort to promote peace and as such her peace policy is above reproach. This leads to the formation of a complacent attitude as a result of which many aspects of our peace policy do not receive adequate attention. I am not setting to launch an attack on India's peace policy, for that would be simply preposterous; I would only like to point that the mere fact that India's peace policy has been so long an admirable one should not make us so insouciant as to prevent us from the constant application of our critical judgment to its manifold aspects.

Take for instance, the term 'neutrality'. We, Indians, are proud that in a world, which is sharply divided into two rival camps, we are 'neutral'. But that is exactly the reason why some foreign powers criticise our policy. Mr. Dulles, Mr. Nixon and many other fire-eating politicians of the western world point out that it is immoral on India's part to be 'neutral' in the struggle between the 'free world' and the Communist countries. Apart from the consideration that such belief is born of ideological prejudices, we can also say that this is partly due to a regrettable misconception about the term 'neutrality', of which even many Indians are not perfectly free. India's policy, strictly speaking, is not one of 'neutralism' as is commonly under-

stood, but non-alignment with any power bloc. If neutralism means passive inaction and aloofness from world politics (and that is perhaps the sense in which the Western politicians take it) India is seriously against it. For, she is not an escapist in a world full of complex problems, nor is she a silent spectator of the international scene. She is an active member of the United Nations and its specialised agencies; she plays a positive and constructive role in promoting international understanding and harmony. She is always ready to give the benefit of her diplomatic services, whenever so required, in solving international issues and thereby make her modest contribution to the cause of peace. But what is remarkable about her is that in her efforts, she refuses to toe the line drawn either by the U.S.A. or the U.S.S.R. Her is essentially an independent approach. She does not believe in the bipolarisation of the world and alignment with military alliances and power blocs. Her eyes are not coloured with ideological dogmas—revolutionary communism or bourgeois liberalism. Indeed, as has been said, to India all 'isms' are today 'wasms'. Her approach to every problem is pragmatic not doctrinaire. She is not addicted to any fixed political belief petrified into a dogma, she only tries to focus her efforts on practical measures for enlarging human freedom and dignity. Unfortunately we live in a world where ideological cloaks cover the man in human beings, where political shibboleths cloud the vital human issues. The basic problem which the world faces today is not whether to imbibe Communism or to reject it, but it is the problem of Hunger, Disease and Ignorance. In his New Year's message for 1956, Dr. Martin Niemoller voiced a sentiment which finds an echo in every thinking mind:

"We are facing the last chance of our generation. All people have to work for peace to-day. The situation is even much worse than we realise. The East-West struggle is not the worst problem we face. Half of the world's population is living in a state of hunger—below the minimum for existence. . . . This hunger is a greater problem than the East-West struggle. This is the future—not Russia or America".¹

India's policy marks a clear appreciation of this realistic vision unhampered by ideological clouds. What we need to-day is peaceful economic reconstruction, and "not a game of choose-up sides for an atomic war". Bandung is symbolic of the united desire of the underdeveloped countries for peace so that they can prosper. An infant social democracy like India can contend with its legacy of economic backwardness only in an atmosphere of peace and tranquillity. We should ask not whether certain countries are on 'our side' or not, but whether we can cooperate for common purposes and mutual benefit. That is why India's policy is one of 'constructive dynamism' and not one of ideological exploitation. This policy is only a projection of her own domestic needs and a reflection of her own political philosophy.

¹ Quoted by G. L. Mehta, Ambassador of India to U.S.A., in his speech delivered at the 89th Annual Commencement of Simpson College on 3rd June, 1956.

Before going any farther I wish to pause here a moment and deal with a point which has assumed serious importance regarding India's neutralism. Some doubts, which I believe are none-too-illegitimate, have lately risen in many an honest heart as to whether the attitude at first adopted by India towards Hungarian affairs was consistent with her strict neutralist principle. Although Sri Nehru's historic speech of the 19th Nov., 1956 in Loksabha where he came out with a much-needed yet much-belated statement revealing a balanced picture of the recent developments in Egypt and Hungary, has largely succeeded in dissipating all doubts and misgivings, yet there can be no denying the fact that the Indian Government was at first rather meek and halting in denouncing the Soviet action in Hungary. The Hungarian situation put India's much-proclaimed neutralism to a severe test, in which, I think, Sri Nehru has not fared so well as might have been expected from him. The complexity of the whole affair has been put forward as a specious excuse for his hesitant policy. But the fact—the bitter cold unpalatable fact—stands out above the welter of confusing details and the mechanistic interpretation of pacts and treaties, that in Hungary there has been a flagrant violation of domestic liberty and national sovereignty, and as such we should condemn it as promptly and as severely as we did in the case of Anglo-French aggression in Egypt. Of course, Sri Nehru did condemn it, but not before a certain section of the people at home and abroad had started forming conjectures about the discriminating nature of India's neutralism. What is worse, the vacillations in the different statements coming from a statesman of Sri Nehru's eminence leads one to suspect that there must be some confusion or vagueness in the policy itself. And, however vehement he may be in supporting Krishna Menon's action in the U.N. Assembly, a pertinent question still remains: if India was so particular about the specific details of the U.N. resolution as to feel like opposing it when the paragraph relating to the proposal of holding elections in Hungary under U.N. auspices was put to vote, then why, we ask, did India abstain from voting when the paragraph calling for the immediate withdrawal of the Soviet troops from the Hungarian soil was put to vote? Why this hesitation? What prevented India from vigorously supporting that particular paragraph? What did the 'conscience' of Krishna Menon say? These are questions so conveniently parried to cover a definite diplomatic error.

Again, while assessing the contribution of India to international peace, we must not lose sight of certain external and fortuitous circumstances which often pale into obscurity before the halo of glory with which the frequent triumphs of India's peace policy are usually associated. Despite the Suez flare-up and the tragic events in Hungary, it remains true that to-day the world opinion is gradually veering round in the direction of peace. Except a few pugnacious chauvinists, imperialists and capitalists, almost everybody in the world today wants peace. But this universal yearning for peace is not so much generated by the peace policy pursued

by countries like India, as it is the natural consequence of the fear of becoming helpless victims in a nuclear holocaust and the instinct of self-preservation which is dominant in all men. To-day we cannot destroy others without destroying ourselves. Radio-active waves do not respect geographical boundaries or ideological differences. They destroy one and all. Since nuclear co-annihilation is the only kind of warfare in which the Powers could henceforth engage, mankind has now reached a point where it has to take the crucial decision whether to bring about total obliteration of humanity from the face of the earth or to 'live and let live' in peace. And if there is a 'balance of power' in the world to-day, it is brought about, not so much by the policy of peaceful coexistence as by a 'balance of terror' generated by the H-bomb.

But this should not be thought of as going in any way to detract from the value of India's contribution or to deny the sincerity of her efforts. She has been playing a very significant role in the cause of world peace. She has thrown in the whole weight of her moral force to ease international tensions and thereby to enlarge the area of peace. She has left no stone unturned in solving international problems through peaceful negotiations and reconciliation. She has been instrumental in settling the Korean tangle, in securing armistice in Indo-China and in bringing about some relaxation of tensions in the Formosa area. Besides, she has been a constant critic of the military alliances which in the name of checking Communism have only accentuated mutual suspicion and accelerated the suicidal armament race. She has always pointed out that the solution of vital international problems lies not in 'collective security' through military pacts but in the establishment of the principles of international relationship which she has enunciated in the 'Panch-sheela'. And it is gratifying to note that several countries such as Burma, China, Indonesia, Egypt, Yugoslavia and the Soviet Union¹ have already expressed their adherence to the fundamentals of these principles that marks a triumph of India's peace polity.

But trouble-spots yet remain and continue to threaten world peace. With dark clouds still hovering over the Suez Canal, with the die-hard French imperialists revelling in the blood-bath of Algeria, with the situation in West Asia being embittered by Western interference calculated to crush the resurging Arab nationalism, with an explosive East Europe seeth-

¹ The last-named country has at least formally accepted the Panch-Sheela, though her recent action in Hungary proves the otherwise.

Indeed, "doubts can be raised about the sincerity of States in their acceptance of the principle of peaceful co-existence. It is possible to argue that States are willing to pay a lip-service to this principle so long as it is expedient for them to do so." —["Peaceful Co-existence" by Deshpande, The Indian Journal of Political Science, Jan.-March, '56].

Stalin told a Bolshevnik Congress in 1927 that temporarily, *until they had an upper hand* (italics mine), the Soviet should base their policy towards capitalist lands on 'admitting the coexistence of two opposed systems.'

ing and fuming under the Soviet overlordship, with the South Africans being tortured and trampled under the weight of white fanaticism, and with the German question still undecided, thanks to the machinations of power politics, it is obvious that ferment and tension are smouldering in many corners of the world which can blaze forth, at any moment, into a global conflagration, despite the pious wishes of peace-loving countries like India. And in some cases, India's overzealousness to maintain peace at any cost has landed her in absurd positions. The half-hearted, meek and irresolute policy followed by the Delhi pacifists has made it possible for the tyrants of Lisbon to continue their atrocious hold on Goa. Or look at Kashmir. Partly due to the political manoeuvres of the West and also largely due to the lukewarm policy followed by India, Pakistan has been raised from the level of an aggressor to that of a legitimate disputant in the eyes of outside world. Peaceful coexistence does not mean (or at least should not mean) timid subservience to injustice. The pursuit of a peace policy should not be confused with the connivance of wrongs done. The considerations of peace should not come in the way of decisive action and resistance against oppression.

In our enthusiasm to extol India's peace policy we should not lose sight of another aspect. The time has now come to judge whether her policy has been successful in making any effective contribution to the cause of *permanent* peace. We feel proud that India has played a useful part in solving the Korean problem. But if we look deeper, we shall find that India has succeeded in only replacing hot war with cold war. Her achievement lies only in turning a field of clash of arms into a centre of political deadlock. Thus far and no farther. The 38° line remains not merely a line of latitude, but a line of mutual suspicion and distrust tearing across the Korean territory. On either side, much swashbucklings and sabre-rattling still continue. A permanent settlement which necessitates an exchange of heart has not yet been found.

Or look at the stalemate in Vietnam. In the Geneva Conference, India was appointed Chairman of an International Commission, pledged to hold general elections in Indo-China in April, 1956. The time has long elapsed, yet we hear nothing of the elections, nor can we see the possibility in near future. The people of Indo-China continue to be deprived of having a government of their own choice. Instead, there is only a deadlock, with two rival camps, one Red, led by Ho Chi Minh and the other led by Diem and supported by the U.S.A., and with the 17° line cutting across the land as a wall of separation. The China-Formosa affair is another example of many such deadlocks existing in the world to-day which are usually acclaimed as landmarks of the brilliant success of India's peace policy. Temporary cease-fire arrangements and stop-gap settlements should not be confused as monuments of *permanent* peace.

Of course, we should not minimise the importance of India's endeavour. For temporary negotiations have also their utility: they serve as safety-valve for passions. As Mr. Lester Pearson has observed in his recent book, 'Democracy in World Politics', "wise men should not scorn devices or expedients of this kind which can gain time for more fundamental solutions to mature."¹ Considering the complexity of problems in the atomic age, we have to accept 'the inevitability of gradualness' in solving international differences.

The sheet-anchor of India's peace policy is the Five Principles of Peaceful Coexistence embodied in the Panch-Sheela.² These principles assert the belief that nations with divergent political set-ups and socio-economic systems can live together to their mutual benefit, respecting one another's integrity and independence. We are told that a *lasting* peace can be ensured only on the basis of those principles of coexistence. But, with all deference to Sri Nehru and his worthy followers, it is my humble opinion that theirs is a superficial view. For, the principle of peaceful coexistence may at best be a temporary expedient, but never the instrument of bringing *permanent* peace. Peaceful coexistence, in the sense of peaceful competition, is, if I am allowed to say so, only another phase of the cold war. This competition may not entail all the same hostility and animosity which have so long defiled the relations between the East and the West. But cold war, though of a comparatively low temperature, will persist, and the dismal prophecy of so perceptive an observer as Toynbee might prove true: 'Tensions may last for centuries on end; they are not a phase.' In other words, we must not confuse competitive coexistence with pacific harmony. The fundamental question is not merely to live and let others live, but to live and love others. And that spirit of love mere coexistence will never beget. The ultimate solution lies not in a peaceful coexistence but in a peaceful *fusion* of the two systems—a harmonious blending and not a mere juxtaposition. We agree with Sri Nehru that "if you reject coexistence, then the alternative is war and mutual destruction" and with Mr. Attlee that "the alternative to coexistence is non-existence"; but we think that mere coexistence or physical co-presence of the two systems, with each believing in the 'inevitable' disruption of the other and patiently waiting for the day, can never bring *permanent peace*. What we need for permanent peace is "a synthesis between liberalism and Marxism, a synthesis broad enough to permit varieties but sufficiently coherent to form the basis of a world at peace with itself. Such a synthesis cannot, of course, grow all on a sudden, so that in the short term the best that the opposing blocs can do is to ensure an interval of peace by agreeing, as best as they can, to differ. But in the long

¹ Quoted by G. L. Mehta, in his speech delivered to the Cleveland Council on World Affairs on January 30, 1956.

² Peaceful co-existence is, however, no new or novel discovery of India. This principle has been regarded as the basis of international morality through all times. It has been simply revived with a new emphasis in the new context of an atomic age.

run, the world must find out more positive principles on which to rest its faith and build its unity." ('For Democracy': Amlan Dutta). While it would be the long-term goal of humanity to evolve the *new synthesis*, what we can do to-day is to hold the balance between the contending blocs and point the way to a higher stage in the evolution of human society. That is exactly what India is doing and admirably too.

Some Impressions on Music

ARUP KUMAR MUKHERJI

Fourth Year, Arts.

"Music hath charms" has indeed been truly said of music when one considers that the sphere over which it casts its spell has no geographical limits. People of different races have met on this plane of common interest as teacher and pupil or performer and listener and been drawn closer to an understanding of each other, than might have been possible otherwise.

Music has played an important part in the life of man in both peace and war, and love of it has afforded many a one an opportunity to reach out to the farthest end of the world and strike a chord of accord in his fellowmen in person or via the medium of the gramophone and the radio. It is doubtful whether the discovery of electricity gained as much popularity in as short a time as did the invention of the wireless because it (the wireless) is the one medium of bringing pleasure to many by a few. The desire for happiness is so strong in man that he will snatch at it even when his hours on earth are numbered. The fact that music brings happiness is proved by the need for music amongst soldiers, during the last war. It inspires the brave, soothes the tired and even saddens the reminiscing—but pleases all.

Music has been defined as the art of expressing emotion by a harmonious combination of sounds. Oriental composers lay more stress on melody while those in the occident are inclined to concentrate on harmony. A few composers however have effected a compromise in some of their compositions, for example, "Scherzade" by Rachmaniaoff, "In the Steppes of Central Asia" by Borodin and the famous "Persian Market", and their compositions being within the comprehension of both east and west, are in great favour in both sections of the world.

The compositions of Chopin, the poet of music, are a very good example showing that music is an expression of emotion. His association with

Madame Sand and his subsequent unhappiness through his attachment to her gave the world some of the most beautiful music it will ever know. That it (music) is an art is probably best proved by Beethoven, the deaf composer of brilliant Concerti, Symphonies and Sonattas, and Sèszt, who achieved in orchestral effect only on the piano. Paganini, the world's greatest violinist composed and played music that was thought impossible to play on the violin: so the rumour went that he had sold himself to the devil for his art.

The origin of what is known as popular music may perhaps be traced back to the Waltzes of Sohana Sebastian Strauss, the younger, whose revolution in that field sent the world whirling away on a new axis. But when popular music of today is considered, the utility theory of music is found to creep in as instruments are learnt not for sheer amusement as before, but with an end in view.

It has been said of performers of classical music, that they are musical snobs and as such treat anything non-classical with a touch of contempt. That two different types of music may be able to impress the same mind and develop its ability to grasp both in their fundamental character without limitations has been proved by by a contemporary performer of repute—Siberace.

Music has been called a form of Escapism—perhaps it is because it transports one into a world of his making from the world of his birth. What could be better relaxation than listening to music, or better recreation than making it? Living is a serious business for the mind, and it is an ancient and a true adage that “all work and no play makes Jack a dull boy.”

The Beginnings of the European Diplomatic System

A STUDY IN RENAISSANCE DIPLOMACY.

PRADIP KUMAR DAS

Fourth Year, Arts

A general account of the development of Western diplomacy in its formative period *i.e.*, between 1420 and 1530, necessarily involves a study into the new institution of permanent diplomacy which was fully developed in Italy by the 1450's and spread thence, like other Renaissance innovations to the rest of Europe around 1500. It continued to develop along the lines laid down throughout the period, was drawn into the service of rising nation states, and began, like the standing army of which it was a counterpart, at once to nourish their growth and foster their idolatry.

This was largely due to the vitality of New Europe which was so great that even the asceticism and fatalism of the Middle Ages failed to prevent the growth of European genius. The rise of an urban middle class, the revival of old classical traditions in Mediterranean cities preceded and sustained by economic expansion, the secularisation of the Cosmopolitan thomist thought of the Middle Ages which had as its principles, individualism, objectivity and tolerance, and finally the emergence of the idea of the "State" had all led to a striding insurgence into new plenitudes of experience.

On the other hand, Europe was politically imbecile. Drowned into the orgies of bloody nationalism in which the issues of power and ideology were inextricably mixed, she had drifted into the clutches of hungry dynasts with a military tradition of Kingship, whose security seemed conditional on the ability of each to subjugate Italy. Naturally each European nation faced the preliminary task of consolidating its own government. This work begun in the 15th Century was still unfinished at the opening of the 16th and has to be understood as the concrete political problem underlying the rivalry and the ambition of subsequent years. Italy, for its part, still stuck to the old notion of the Europe of Emperor-pope and thereby she proved unequal to the task of extruding the "selfish barbarians". It was this feeling of oppression, quite unintelligible to the people which later drove Pope Peliers into his career as a soldier and that gave such cutting edge to the keen mind of Machiavelli.

Mainly it was these tensions that produced the new style of diplomacy which in effect developed as "one functional adaptation of the new type of self-conscious, power-seeking, competitive organism". This was of course helped on by the fact that wars waged by mercenary troops under generals zealous for their own professional reputation, tended to be less bloody and less decisive than the earlier clashes of citizen militias, though still painfully expensive. But for this very reason as campaigns became more and more a series of manoeuvres for political advantage, they made increasing demands on statesmanship. Secondly the dominant elements in European society particularly in Italy began to set a higher value on a form of contest in which their leading citizens, not necessary strangers who might change sides, were the champions. This was not an unusual thing to do since the merchants and professional men—most of them with some legal or notarial training—had been led to believe that words might be as potent as swords, on the practical basis of a humanistic education. Consequently their faith in the efficiency of diplomatic and forensic persuasion as an auxiliary to or substitute for, military force, was heightened.

In the Middle Ages, diplomatic representation was a method of formal privileged communication among the members of a hierarchically ordered society, and its exercise could be admitted or denied according to the relations of the parties concerned and the nature of the business at hand. The precise definition of a body of diplomatic principals had to wait for a revolution in men's thinking about the nature of the State. But the onset of the Renaissance and the changed political situation in Europe led to the invention of a new kind of diplomatic officer, the resident ambassador, who was to put Wotton's Wry epigram into English and disregard its English pun, "a man sent to lie abroad for his country's good". Not all resident embassies were reciprocal and not all residents were called ambassadors.

Since the resident ambassadors were servants, as Mathigly observes of "the sacred egoism of their respective states" they could at best furnish a unity of tension. Yet the efficiency of the residents in detecting subtle changes on the fabric of international politics did help to maintain the balance of power. Thus as in the Milanese crisis of 1476, the attitude of the major powers was so promptly registered by their ambassadors that fishers in troubled waters were deterred and a crisis was averted.

Not that the network of resident embassies replaced the older means of diplomatic intercourse—far from it. Occasionally princes would decide to become their own ambassadors, and for these there were no set rules. But such interviews were risky in so far as they involved the fanfare of attendant publicity which advertised failure as surely as success.

In the new system one major power was of course Italy. Whether they felt that the reciprocal exchange of residents was beneath the unique dignity

of their office or simply because the Pope could hardly lack agents, informants or means of communication, the Roman pontiffs received resident ambassadors, but sent none. It is true that lack of military strength did give the later 16th Century Italian diplomacy its air of desperate improvisation, but to the end of the Italian wars it retained a technical superiority.

All this merely contributed to the 16th Century struggle for power which had a dynastic rather than a national orientation. Of course the Holy League of 1495 and the League of Cognac 1526 were illustrations of balance of power politics—the combination of a group of powers against an apparent victor. In the 16th Century however, the position had altered somewhat. No longer did the allies hope to redress their grievances by just balancing the strongest power but in trying to outweigh it; and for that they had inevitably to fall back on underhand means. Naturally Machiavelli in his "Prince" put forward the plea that to keep faith is the last thing a prince should do, since in the ruthless struggle for power there were only the tricksters and dupes.

Without going to such extremes however, it is possible to suggest that the defects of Renaissance statesmanship were twofold. In the first place, there was no competent arbitrating authority. Treaties such as the Treaty of London forged by Thomas Wolsey provided for nothing except consultation among its signatories, exhortations to the combatants to submit to arbitration and then eventual armed sanctions against whichever party refused to cease hostilities. Secondly the political structure of Europe organised as it was round dynastic chieftains "had divided European political space among a group of coresponsible power-eating organisations which jostled each other prematurely even though their internal tasks were far from complete." At the same time the way was left open for these to coalesce into fantastic political monsters. The origins of the resident embassies had been in the Italian power struggles to serve as liaison agents and spies of competing despots; and they remained that way. So that if after the generalisation of the system which followed in the wake of the Peace of Lodi there had been any expectation of the residents turning back to the older mission of the ambassador, peace, it was frankly an optimistic one.

Paul Sweezy's Questions

AHIN CHOWDHURY

Fourth Year, Arts.

Recently there has been a very interesting discussion among eminent Marxist intellectuals regarding the transition from feudalism to capitalism. This subject is bound to provoke deep interest in us chiefly because of two reasons. First, it attempts to satisfy our natural curiosity to know how the present social system has evolved out of the preceding one. Secondly, the whole discussion has an important bearing on the Marxist way of looking at history and consequently on those historical generalisations that go to make the 'world-outlook' for a Marxist.

According to the Marxist theory, contradictions develop within a unit, and these contradictions are the basic cause of its development, eventual disintegration and replacement. With regard to this theory there is complete agreement among all Marxists. Maurice Dobb in his 'Studies in the Development of Capitalism' has devoted a part of the volume in accounting for the break-up of the feudal mode of production as the background to the emergence of capitalism. A confirmed Marxist as he is, he has tried to show that the factors that led to the decay of feudalism are to be found inside the feudal mode of production itself, or, in other words, the break-up of the socio-economic structure of feudalism was the result of the self-movement of its productive forces.

Paul Sweezy raises some questions which are admittedly very important for the understanding of the historical development of this particular period of transition as well as the efficacy of Marxism as a method of studying this development. Apart from posing some vital questions and criticising Dobb, Sweezy has attempted to construct an alternative theory or rather he has tried to look at the problem from a different angle. His original theory has many weaknesses. But the fact that it has been successfully demolished by Takahasi and Dobb does not in any way invalidate the questions which he starts with and which still await their satisfactory answers. The starting point of Sweezy is the limitation of Dobb and we shall concentrate on that. When Sweezy breaks away from his fundamental questions and tries to construct a theory of his own we begin to lose interest.

The first and the most important question that Sweezy asks is this: What were the contradictions inherent in the feudal mode of production that led to its development and by its own logic, to the ultimate crisis and eventual replacement?

The characteristic feature of a Feudal economy is that it is a natural economy, its production being for use in contrast to moneyed exchange economy. Marx has pointed out in his "Capital" that in any given economic formation of society, where not the exchange-value but the use-value of the product predominates surpluses will be limited by a given set of wants and no boundless thirst for surplus-labour would arise from the nature of production itself as in the case of capitalism. In the case of feudalism the elements of instability are to be sought not in the nature of production while in the case of capitalist mode of production the chief element of instability (capital accumulation) is in the logic of the system itself. One element of instability is the competition among the nobles for land, power, and prestige and the consequent continuous state of warfare. This competition is analogous to that for profit in the capitalist system. But they produce different results. The resultant insecurity of life and possession merely accentuates the mutual dependence of the vassals and the lords and reinforces the basic structure of feudal relations. The second probable element of instability is the growth of population. The structure of manor sets limit to the number of producers it can employ and also to that of the consumers it can support. The younger sons of the serfs are pushed out of the regular frame-work and they either become mercenaries or go to make up a kind of vagrant population exercising no revolutionary influence on the feudal society. All this is to emphasize that the feudal society has a fundamentally conservative and change-resisting character with a particularly strong bias towards maintaining the given methods and relations of production. Now, where are the internal contradictions we look for?

Dobb points out that the growing need for revenue of the expanding parasitic class intensified the pressure on the direct producers to a point where in a very real sense it was unendurable. In order to survive the serfs deserted the manors and fled to the towns. Few that remained were too overworked to maintain the system on its old basis. The increasing exploitation inevitably led to the exhaustion or actual disappearance of the labour force by which the system was nourished.

None can dispute the growing need for revenue and the flight of the serfs on a mass scale. But can they be shown to be inherent in the feudal mode of production? That is the moot question. Dobb offers three explanations for the growing need for revenue:

- (I) Growth in the parasitic class.
- (II) Constant war and brigandage leading to impoverishment.
- (III) Growing extravagance of the feudal ruling class.

The growth of the parasitic class in size is a *prima facie* reason for the growing need for revenue which explains gradual intensification of the

pressure on the serfs. But the growth in the parasitic class was matched by the growth of the serf population as there was no dearth of cultivable land to be brought into use. Secondly, since the feudal warfares took its main toll from the upper order we may well doubt whether there was a significant relative growth in the size of the parasitic class.

Wars and brigandage were always there and if at a particular time they became intense accounting for the growing need of revenue we cannot say that this happened owing to the inner logic of the feudal system. Dobb has not cared to explain such a trend. The special drainage attributed by him to Crusades are of dubious significance. Crusades were fought in the East and caused devastations in the East. Secondly, they brought some material rewards since the Crusades were to a great extent looting expeditions. Thirdly, they were mere substitutions for than additions to the normal feudal warfare. And even if all the three arguments are not valid, Crusades can never be reckoned as a factor internal to feudal mode of production.

The growing extravagance, a plausible explanation for the growing need of revenue cannot be explained by the nature of the feudal system. Even under dynamic capitalist system spontaneous changes in consumers' tastes and preferences are negligible, not to speak of that tradition-bound feudal society. It can only be accounted for by the rapid expansion of trade which brought an ever-increasing quantity of a variety of goods. But this trade cannot be regarded as internal to feudal mode of production.

The flight of serfs can only be partially explained by internal pressure. Unless they had somewhere to go, they simply would not have deserted the manors only to be plunged into uncertainty. It was better they thought, to eke out an animal-existence in the manor than to relegate themselves to a vagrant population and constitute the dregs of society. Because towns (external to the feudal unit) were there to offer liberty, employment and improved social status for the oppressed serfs, they acted as a powerful magnet and the flight of serfs became epidemic. In the absence of towns, the flights of serfs were not so common. Dobb insists that in this process the internal pressure was the main cause. But in a causal relation where each of the factors is necessary but not sufficient in itself to produce the effect what is the criterion to call one more important than the other?

Dobb cannot rescue his theory by maintaining that the growth of trade and the rise of towns were a process internal to feudal system. The question whether a factor is internal or external will depend on the definition of the unit. Prof. Takahasi says, that in the last analysis everything external must be explained internally to history when we shall proceed to investigate how these external factors arose. Very true. If we take "the world in the 12th century" as our unit instead of feudal mode of production then we can dub any factor as internal. But that will be clearly a deviation from the

Marxist method of constructing historical units. Dobb correctly defines feudalism, of course from the Marxist view point, as a method of production and its corresponding production-relations. He equates feudalism with serfdom. The essence of his definition is in the "socio-economic content of the obligation" that connects the serfs and the overlords. Feudalism is a system where some economic demands are imposed on the serfs by force and which they must fulfil independently of their volition whether the demands take the form of services or rent paid in kind or money. So far as this unit is concerned, which is the true Marxist unit, trade and trading towns are external to it. When Takahasi, Dobb and Hilton describe trade and town as internal to feudalism they are misleading in the sense, that then feudal mode of production is no longer the unit but they then take Western Europe as a geographical unit to serve their purpose. It is one thing to point out that trade and feudal Europe are related in points of time and space, it is another thing to establish a conceptual relation between trade and the feudal mode of production. In so far as the unit is broadened and changed in order to characterize the trade and the rise of towns as internal factors—we clearly deviate from the Marxist methodology of taking a mode of production as a historical unit. In so far as we stick to the Marxist unit we cannot maintain that those processes were internal and so cannot prove that the disintegration of feudalism was due to the internal dynamics of the system. This is the dilemma which confronts a Marxist historian. And in order to solve this they give rise to all sorts of confusions.

The other two questions of Sweezy are:

- (2) Why did the development of the Western European feudalism ultimately collapse? and
- (3) Why did capitalism succeed feudalism?

As regards the second question of Sweezy, Dobb states that the disintegration of feudalism was due to a considerable change in the technique of production. For that he asks Sweezy to take up two pages and a foot note of Molly Gibs's (Marion Gibs?) "Feudal Order". All that we can find there is that at two points of time there was variation or improvement in the technique of production. But what is there to show that this particular change in the technique of production (a) necessitated a new set of production relations and (b) created productive forces which could be maintained and further developed only under capitalism? This is the crux of the problem, and Dobb has not answered these questions.

In order to minimize the importance of trade as a determining factor in the process of disintegration of feudalism both Takahasi and Hilton tend to treat the substitution of money rent for labour services or payment in kind as a matter of form only and lose sight of the fact that this change

can occur only on the basis of developed commodity production. So the second question remains totally unanswered. And since Dobb or any other historian or economist has not been able to prove that feudalism by its own logic created conditions which necessarily give rise to only capitalist mode of relation of production, the third question also remains unanswered.

The upshot of this discussion is that the Marxist theory that the decay of feudalism was due to its inner contradictions has yet to be established because Paul Sweezy's questions still await their satisfactory answers. And until this theory is established beyond doubt the Marxist generalization that all societies break up due to their inner contradictions cannot be accepted as valid. And it is always dangerous to make a theory the guide to our social action, unless the theory is proved beyond all doubt. I think, the implications are obvious.

On A Holiday by the Sea With Me

KALYAN C. DUTT

Fifth Year, Arts

The rattle of our carriage wheels (*Jatka*, a kind of local dog-cart) heralds us as we (you are the guest of our party) journey from the station to our destination on the Orissa coast. We speed through stubble fields and tiny villages with their cluster of huts, pass over railway level-crossings and brick bridges, skirt round hillocks and water-logged low-lying areas. Gradually the sun declines towards the west, till it is setting on the plain behind yonder clump of bamboos. The slanting rays fall on our faces making them aglow. Now we are going through a wonderful shady avenue of banyans, peepuls, mango-trees, cocoanut-trees and bamboos; we are turning to the left, we have turned and lo! what a glorious sight!

There, in front of you, lies the vast, heaving greenish-grey sea, stretching out in all its beauty and mystery as far as the eye can see. Listen! yes, to be sure, you can hear the boom of the breakers on the shore. The cool salt breeze blows on your face and caressingly alleviates the rigours of a long but interesting journey. But it is too late for a refreshing dip as the twilight is thickening into darkness. In the rapidly fading light the stars are coming out one by one. Soon the waxing moon will mount the sky and shed her blessings on the earth. Then night will fall, the stars will glitter and the sighing of the waves would be heard. Perhaps you are too tired for anything just now so I shall wish you Goodnight. But please remember, to-morrow morning we shall have a nice long bath. You would come surely, won't you? So, once again, Goodnight.

What does it matter if one knows to swim or not? Confidentially, I am an awfully clumsy swimmer. Only the other day, while splashing along with the greatest difficulty and gulping down pints of salt-water I dashed into an unfortunate bather standing in waist-deep water. Rubbing my head hard I rose to apologise but found, to my horror, the fellow rolling like a jelly-fish on an under-tow. It was with the greatest difficulty an expert finally rescued him. In the meantime, I had shown the cleanest pair of heels possible on a sandy track. So you need not be ashamed if you are a novice. If the sea can afford plenty of pleasure to a lubber like me, sure you can have rollicking fun. But if you are on the look out for adventure and thrills, get hold of an inflated rubber tube and a nulia (an expert local swimmer) to take care of you and ride the surges like a King.

It is early, next morning. A cock is crowing. The east is in a glimmer with the first streaks of dawn. The sea is calm and inviting. The morning air is cool, fresh and salty. A number of crows are quarrelling on the top-most branches of a casuarina tree. You hurriedly get out of bed and finish toilet. Then after pulling on your swim-suit, grab something to eat and dash out. The sun has just risen. You see me coming and shout above the tumult of the sea:

"Good-morning".

"Good-morning. I'm afraid I'm a bit late."

"Oh, it doesn't really matter. In fact, I came here just a minute ago. But where are the others?"

"You know how lazy they are? I guess they'll turn up soon within . . ."

Before you have finished you spot them advancing and give a cry of delight.

"Now, are you all ready? Let's deposit all our belongings with him. Niloo you keep guard here", you order your servant.

"Hurrah! Let's all plunge in."

All are so eager that they practically tear off their outer garments and dash in. By Jove! the wa-water is co-cold. But soon one gets used to it. Now look out! A mighty breaker is noisily approaching. You can distinctly see the wind lashing its foam-crested top and sending out salt-sprays. You can feel the water boiling and increasing. Dive. The breaker passes over your body and crashes on the beach. Everyone laughs in sheer pleasure. What is coming this time? A lovely big swell. Jump and relax. You gently swing with the swell and then feeling sand underneath, get up. Wonderful. Then comes a roller and you either dive or present your side with your full weight thrown on your front foot and your hands stretched out to keep balance. Exciting isn't it? In this fashion, a happy, uproarious hour slips off without your even noticing it.

In the afternoon, the sun is rather unpleasantly hot. So the best thing to do is to enjoy one's siesta after lunch. A little snatch of sleep would freshen one up marvellously.

Late in the day, towards evening, when the sea is a liquid gold during sundown and a strong cross-breeze sets in, it is the ideal time for treading swish-swosh on the soft sagging sand-bed at the edge of the sea where every now and then a curl-top breaks and washes one's feet. I can never resist the temptation of stooping and picking up the curiously shaped sea-shells that litter the sands. If you do not like this fascinating pastime you may very well watch the myriads of coral-red, buff and slaty-grey crabs crawling on the sandy floor and quickly hiding in the countless minute holes from the rushing waters. Or you may sit on the crest of a windy sand-dune and watch the catamarans out to bring in the harvests of the sea rising and falling with the waves in the offing. As a change, you may, again, take a stroll along the backwaters with the sky and the trees reflected on it and

observe the skimming terns playfully rippling the placid waters; the gulls floating buoyantly on the brine and sending out raucous cries to their mates gliding gracefully over-head under a memorable sunset sky. Suddenly, a flight of herons plaintively floating their way up the miniature lagoon with the mellow sunbeams gilding their snow-white wings would dazzle you and set you thinking about the inexhaustible store of beauty even in this prosaic world of ours. A soaring fish-eagle, a symbol of freedom and power, would amaze you by its breath-taking swoop through space. You ramble onward meditating on the wonders of creation. You think of the mysterious beauty of the sea and its changing moods during different parts of the day. Presently your gaze falls on the over-turned boats hauled ashore and the swarthy fishing nets spread out to dry. You move on till on seeing a well-known land-mark you realize you have strayed a good deal. At once you turn back and deeply inhale the invigorating ozone. For a moment you become acutely conscious of the mere joy of living. You start running homeward. Mid-way an acquaintance accosts you:

"Hello, where have you been?"

"For a stroll along the beach as far as the sand-bar."

You slacken your pace. The sun-god quietly takes his evening-bath.

Our next day's programme consists of a picnic-cum-shooting-cum-punting rip on and up the backwaters. And if you wish to join us you are more than welcome. We shall start early in the morning. Please do not forget to bring your straw hat and camera.

Early in the morning, next day, you turn up with your hat and camera properly dressed for a rough-out picnic trip. I carry my pet '22 bore saloon rifle. Besides, others bring small baskets stuffed with sandwiches, cakes, pastries, fruits and some tinned provisions. A liberal supply of drinking water has been stored in three large earthenware jars. We shove off the big flat-bottomed boat that we have hired for the purpose from the bank amidst three cheers! Slowly the punt is poled up the shallow lagoon. We loudly sing the old song:

"Row, row, row, the boat
Gently down the stream,
Merrily, merrily, merrily, merrily
Life is but a dream"

Before the last line dies away, our watcher, scanning with a binocular, spots hundreds of little ring plovers resting and running about on a sand-bank or "chur" a little ahead of us. Immediately, the boat is silently brought to a standstill. It is your turn to have the first shot of the trip since you are the guest. So you get down after some persuasion and cautiously wade forward in a little above knee-deep water. You seek and find a comparatively dry part of the "chur" and squat to take a steady aim. You pull the trigger.

"An excellent shot", all cry out in delight. A snipe, which we have not seen, remains kicking to the ground "winged" while the rest fly away and settle down again a little up the bank. The bird is quickly retrieved. In this way we go on till afternoon bringing to our bag half a dozen plovers, two snipes (including the one you shot), a cormorant or snake-bird, one egret and a couple of dab-cheeks besides mortally wounding a jackel in a paddy-field. While returning you have managed to take silhouette pictures of clouds and trees which have come out brilliantly. We have been so ravenous that we have eaten like ogres finishing almost all our provisions which were enough to feed us for three days under ordinary circumstances. We have started on the flow-tide at dawn and have come back on the ebb-tide in the evening. During our expedition, we have carried on our raids on the shore several times, shot game, took photographs, scoured the Casuarina Grove (a name humorously given by you) at the mouth of the channel and bathed.

Did you have a good sleep the night before our return to town? At least, I didn't. I was loath to leave our new-found horizons where we ranged at will and go back to the ever shrinking horizons of the city. Here, sitting and pondering on the beach in a still night under a starry sky and hearing the ceaseless wash of the sea and the murmur of the breeze, one realizes for the first time, as it were, the meaning of eternity.

"Roll on! thou deep, and dark blue ocean roll."

The Fallacy of General Will

ANIL KUMAR MUKHOPADHYAYA

Fifth Year, Arts

I

The bitter tragedy, though I reiterate a very hacknied philosophy, assumes its ugly shape only when a man comes to be what he never ought to have been. I cannot but begin my pen on Rousseau with no better a comment than this. The literary wealth of the world would have been enriched, I am sure, to a further extent, had he not made a miserable mistake with regard to the choice of life. Rousseau was certainly blessed with an uncommon literary genius. All the qualities of a prospective litteratur are too evident to escape enthusiastic attention in his writings. His masterly literary expression and magnificent eloquence, to be frank, have for many a time rendered him great service. Where logic fails and Rousseau's position is at stake, it is his rare rhetoric that is prompt to parry the palsy of his argument. But Rousseau deviates from the destined way, decides to be a political theorist and hence is challenged and deposed, so to say.

In the history of mankind the French Revolution of 1789 has been an epoch-making event for ever. It forces the fervid attraction and rapt reminiscence from all ages. The French Revolution, however, was no sudden explosion of fury against oppression. A number of heterogeneous conditions—moral, social, economic, political and religious—constitute the compendium of its causes. It will, however, be no mistake to ascribe the French Revolution, to some extent, to the writings of a number of political philosophers. They added a burning flame to the smouldering fire stealthily awaiting a violent outburst. Among them Rousseau, no doubt, stands pre-eminent.

In fact, Rousseau's ideas, however utopian they might be, exerted an enormous influence upon the furious French mind which it is unjust to minimise. His political doctrines are more easily traceable than those of all other revolutionary thinkers. What is much more striking is that Rousseau, more than all the rest, was quite aware of the necessity of supplementing destructive criticism by a constructive theory. Even his hostile critics admit the paramount importance of his work in shaping and disseminating the explosive ideas that kindled the flames of revolution. As Maine, though a vigorous critic, says¹: "The world has not seen more than once or twice in all the course of history a literature which has exercised such prodigious

¹ Maine—Ancient Law, Chapter IV.

influence over the minds of men, over every cast and shade of intellect, as that which emanated from Rousseau between 1749 and 1762."

It is only a psycho-analysis of Rousseau's mind that can help a best understanding of Rousseau's revolutionary political thought. It is rather rare that the political belief of a thinker can germinate under so great an influence of his personal individual life as in the case of Rousseau. He was of an emotional, sensitive, self-conscious temperament, impatient of control and always dissatisfied with the institution or convention that prescribed restriction or regularity.² "The hero of Rousseau's primitivism was not the noble savage; it was the irritated and bewildered bourgeois at odds with a society that despised and looked down on him. He joined in a condemnation of both the social order that oppressed him and the philosophy which had attacked the foundation of that society." The spirit of protest already suppressed in his mind for his restless and unhappy private life attained a vigorous voice when Rousseau was out to preach his revolutionary ideals. He never learnt how to oppose with a cool brain. He knew not how to stop short of the uttermost limit of protest. He never paused till he had provided for the complete refashioning of government, state and society.

But Rousseau can hardly claim a creative genius. No note of novelty can be found sounding throughout his works. He lighted up and magnified, but never created. Old well-known concepts were juggled by his brilliant fancy till they were changed and made appealing to men with an uncanny attraction.³ "The truth is that Rousseau was a romantic caught in the toils of a classical conception in which he had dressed himself but in which he did not believe."

II

Achieving a great success in his "Discourse on the Progress of the Sciences and Arts", Rousseau made up his mind to write a comprehensive work covering the whole field of political science. The Social Contract published in 1762 is a part of this work. Before he took up this task, he came close to the political theories of certain philosophers like Pufendorf, Locke and Montesquieu, Grotius and Hobbes. The ideas of Locke, however, generated dreams of social and political revolution in the alert but unbalanced mind of Rousseau. Now what Rousseau had to forsake was Locke's systematic individualism. The writer who gave him the best assistance to have an easy release from this individualism was Plato. Rousseau, we should remember, here, had a profound admiration for the political ideals of antiquity. Now what he learnt from Plato was that community itself is the chief moralising agency and that political subjection is essentially ethical. For a long time, however, the social contract was interpreted as a cult of individualism. Its opening

² Sabine, A History of Political Theory, Part III, Chap. 28.

³ Barker—Social Contract, Introductory Chapter.

sentence: "man was born free and everywhere he is in chains" however, offers a clear clue. Rousseau's thoughts are on the flying wings and actually the argument of the Social Contract, if studied carefully, shows a rapid transition from an initial individualism towards collectivism. In fact, Rousseau's social contract is inspired by two ideas—on the one hand, a Platonic consciousness of community and on the other hand, a passion for individual liberty even more illuminating than Locke's. How is it possible to reconcile the sovereignty of the state with the freedom of the subject? That is the problem Rousseau sets himself to solve in his Social Contract with the help of the concept of General Will. Liberty and authority are absolute logical contradictions in the Discourse and the Emile. But in the Social Contract Rousseau wants to establish them as inseparable concepts.

Rousseau is conscientious to condemn the authority of man over man. It can, he is emphatic, never claim a rational basis, save agreement and consent. He, however, does not fail to find a form of agreement by which liberty and authority can peacefully co-exist. This is the contract through which a mass of men become a collective unity. Hobbes applied a very loose logic to show absolute monarchy as a consistent corollary of the social pact. To this Rousseau offers an open objection. But Hobbes's precision in defining the terms of the contract has a great appeal for him; and his own dealing of the subject is but the substance of Locke developed by the method of Hobbes.

III

The only basis of the state that Rousseau is ready to admit is the rational basis of a reasonable will. He refuses to rest the state on mere will and insists that it must have as its basis a will of a particular quality. This is what he entitles as General Will. He postulates a community freely established by means of a voluntary contract made by men enjoying the liberty of the primitive state of Nature. Sovereignty is the absolute power which the social contract gives the body politic over all its members when this power is directed by the general will. The formula, as he lays down, is that⁴ "Each of us puts into a simple mass his person and all his power under the supreme direction of the general will; and we receive as a body each member as an indivisible part of the whole."

This general will has got certain peculiar characteristics. It is, no doubt, a will aimed at the attainment of general welfare. But that merely does not cover its entire connotation. When Rousseau speaks of the general will, he uses the epithet to indicate the quality of the object sought and not the quantity of the subjects or persons by whom it is sought. The general will cannot be permanently consistent with particular wills; private interests may be antagonistic to it. Rousseau believes that the will of all, which is the net

⁴ Rousseau, *The Social Contract*, Book I, Chap. VI.

addition of particular wills, regards only private interests and, therefore, distinctly differs from the general will which is concerned only with the common interest. A will, in order to be general, need not be unanimous, but every voice should be counted. It is the common interest rather than the number of voices that matters most. If the people conclude a resolution on sufficient information and without intercommunication, the general will will have its perfection and the revolution will always be good.

The General Will, thus conceived, is proved by Rousseau to be inalienable, infallible, indivisible and absolute. It is inalienable because the will cannot be bound by promises. As the sovereign is a collective being, it can only be represented by itself; power may be transmitted, but not will.⁵ "If the people promise to obey a ruler; the people as such *ipso facto* is dissolved, the state no longer exists. The state, as a state, can no more alienate its sovereignty than a man can alienate his will and remain a man." By the same logic, Rousseau, with a cavalier gesture, shatters the idea of representative government.

Indivisibility forms another characteristic of the sovereign power. Sovereignty can have its best manifestation in an act of the whole people for the whole people. So far as the issues from the sovereignty, such as the legislative and executive powers are divided, Rousseau does not object. But sovereignty itself, he holds, is wholly incapable of division.

Thirdly, the sovereign will is inerrant. It is always right and always tends towards the general welfare. The general will can only be transitorily deceived, but, on the whole, it is always prone to promote right. As Rousseau says⁶: "A man always wills his own good, but he does not always see it; the people is never corrupted, but it is often deceived and only then does it appear to will what is wrong."

Finally, the sovereign will is absolute. Rousseau declares that⁷ "as Nature gives every man an absolute power over all his limbs, the social pact gives the body politic an absolute power over all his members." The sovereign has unlimited control over all that affects general welfare, and the indisputable right to judge as to what falls under this category. Whoever refuses to obey the general will shall be constrained to do so by the whole body. In other words, he shall be forced to be free.

IV

This is, in outline, Rousseau's General Will. The ghost of General Will has haunted a host of generations and drawn a mass of musings from the best intelligentsia. There is, indeed, much to be said in its favour. But the problem is with regard to reality, *i.e.*, its application in actual life. It is

⁵ Merriam.—History of the Theory of Sovereignty since Rousseau, Chap. I.

⁶ Rousseau.—The Social Contract, Book II, Chap. III.

⁷ *Ibid.*, Book II, Chap. IV.

here that Rousseau sails into troubled waters and finds himself in a helpless dismay.⁸ "A true politician," to recall Burke, "always considers how he shall make the most of the existing materials of his country". Quite opposite is Rousseau's case. He is a dogmatic doctrinaire and cares little for the infinite variety and the complexity of life. Apparently, no doubt, the General Will appears very innocent. This false simplicity is solely due to Rousseau's inability to realise and appreciate the difficulties of his task. He never probes the political complications of his time. His total ignorance of affairs together with his contempt for civilised life prevents him from any theory of practical utility.

Rousseau's attempt to distinguish a real general will from a mere will of all "by the presence or absence of party lines in voting" is futile. He argues that if party be there and a great clique carries the day, the well-being will have to be sacrificed; if there is no party and each individual casts his individual vote, the individual selfishness in voting will cancel one another and the general good will be secured. But it is certainly in the citizen's free choice that true freedom finds its congenial companion and there can arise no question of choice unless there are alternative programmes declared by different parties. Hence it is not the absence, but the presence of party which is essential to the existence of General Will.

Rousseau's exposition of the spirit of General Will, as Dunning sees, is⁸ "an amazing medley of bad logic and utter puerility". Equality, he believes, is secured, because each individual completely surrenders himself and all his rights to the community. But it is as logical as to imagine a handsome amount in a desolate zero. By the same reasoning the union is, according to Rousseau, absolutely perfect and no individual can claim anything. This clearly means thorough submergence of the individual in the State. But Rousseau ludicrously finds the fullest freedom. Again, to apply rhetoric to show that restricting liberty is really increasing it and that coercion is not really coercion makes the matter more confusing. Forcing a man to be free is a clear euphemism applied as a plea for making him blindly obedient to the mass or the strongest party.⁹ "Thus the General Will of Rousseau is Hobbes's Leviathan with his head chopped off, and the headless Leviathan of Rousseau is as formidable as the complete monster of Hobbes."

The whole system of Rousseau is indeed "inverted Hobbism", the many-headed multitude supplanting the despotic monarch. He fails to escape Hobbes's conception of sovereignty as a supreme coercive power though he pays his best effort to dissemble his despotism by identifying the general will with the vote of the majority. We may, however, think of a majority as a coercive power. But hardly we can conceive a general will in the sense of an unselfish interest in the common good. Thus for the sovereignty of the general will we get the sovereignty of a majority of parti-

⁸ Dunning—A History of Political Theories, Vol. III, Chap. I.

⁹ Hearnshaw—History of Political Ideas, Chap. VI.

cular wills. Again, Rousseau's assumption about general will as consisting in the common elements of particular wills is in reality a mere abstraction; for opposing wills may not cancel one another, or factions may remain, or even if the general will is always right, as Rousseau dogmatically opines, patriotic citizens may err from want of enlightenment; and in all such cases the aim of general will *i.e.*, common good remains unattained.

If Rousseau be a bit reasonable, he has to admit that in practice we can only count the heads of absolute and mutable majorities in which case his distinction between the general will and the sum of particular wills completely vanishes; for his representation that a member of the minority as such must be mistaken about the general will is a mere subterfuge resorted to in a desperate effort to save inconsistency. Rousseau, again, is found to insist always that general will is just. But this is merely a truism, because general will stands for the social good which is itself the standard of right.

In fact, Rousseau's sovereign power which injures none of its subjects and always aims impartially at the common good is an ideal, no doubt. But when he goes to identify sovereignty with the general will and the general will with the will of the majority ascertained by counting of votes, we see how rapid is the abjection from the ideal to the actual, how easy the lapse into fallacy.

All these easily prove that Rousseau's theorisation on General Will has been entirely a fruitless toil. Of course we never do deny certain basic truths contained in the concept of General Will. These are that—it emphasises that society is an organic unity, that will and not force is the basis of the State, that the state is natural having its basis in the will and natural need of man, that the true basis of democracy is not force, but active will. The stimulating force of his suggestive theory, indeed, long remained a cardinal fact of literature and history. The concepts of common interest and general will came to be crucial factors in almost every theory of the State. Through them a way was found out that enabled the unity and solidarity of a population to be the necessary assumptions of scientific politics. Rousseau thus, to be frank, was a remarkable contributor in evolving the theory of national state. His burning faith upon the virtues of general will and general interest brought these concepts into the limelight of political theory and evoked from rational writers than Rousseau more refined solutions of the problems he placed forth.

But these facts cannot, in any way, serve as an excuse for his fault. It requires little trouble to visualise his great influence upon the French Revolution. But that must not be the criterion to judge his merit. The fact is that people of that period of turmoil were eager to escape from the weltering chaos in which they had long been hankering after a better state of things. So his General Will had an exquisite charm for them.¹⁰ "The

¹⁰ Tozer—The Social Contract, Introductory Chapter.

age, indeed, was ripe for revolution and the inarticulate multitude, chafing under an effete administration, found in him a fitting champion. For such as these Rousseau's transcendent power of ringing with passion a set of definite dogmas had an extraordinary fascination."

We do not, however, want to minimise his purpose. The reconciliation of liberty and authority is something quite innovating at that age. But what we condemn is his approach. It is his inherent nature to hold glaring paradoxes with an array of ingenious arguments. With fatal felicity and apparent precision he deduces from his unfounded premises a series of inconsistent conclusions which he regards as authoritative and universally applicable. The concept of General Will had enough possibilities. The practical uses to which this might be applied were various. But Rousseau has neither knowledge nor patience to explore them. It is his exuberant emotion and romantic restlessness that bring his utter failure. Had his rational mind triumphed over his fiery emotion, had he been always able to make a balanced judgment, he could have been successful in his mission. But unfortunately quite opposite has been in actuality and hence Rousseau's soul has to sprawl on thousand thorns of criticism. We, though regretful, can do no better to this situation and simply, with silence, take leave of him.

Colour Photography

PRATIPENDRANATH BHOSE

Fourth Year, Science

The invention of technicolour films has created a new era in the history of photography. The old process of black-and-white photography cannot give the vivid representation of the object photographed; it gives just an outline, so to say, and not the detail. On the other hand, if you load your 'Rolliflex' with an Ektachrome or Kodacolor, and have a flash, the scene before your camera is at once recorded with all its colour and beauty. In fact, the colour photographs are sure to provoke joy and wonder to one and all.

In order to know the construction of a technicolour film, we should, at first, be well aware of the fact that colour can be recorded in 2 manners—

(i) Plates which are additive in character; *e.g.*, Lumière plate. Here, minute dots of different colour unite to give the colour in the original.

(ii) Films which are subtractive in character, *e.g.*—Kodacolor, Ansco colour, Ektachrome, Kodachrome etc. These give pictures in which layers of blue, magenta and yellow dyes, subtract certain specific lights of particular wavelengths, permitting the right amount of red, green and blue to reach the eye, thereby the colour in the original is produced.

It goes without saying that the latter variety is superior to the former one. The films can be obtained both for amateur cameras and for plate cameras.

The "Koda Colour" film can be used in all cameras without any light filter before the camera-lens. This film is provided with a light sensitive pellicle which is composite in nature, consisting of 3 layers sensitive to 3 different lights; the top layer is sensitive to blue light only; the middle layer is sensitive to green and the bottom layer to red rays only. Under the first layer, there is a "stop-all-blue" layer which stops all the blue rays in the light going to the subsequent layer, because the layer sensitive to green and red, are sensitive to blue also (it is the usual case with all photographic films). Under this layer, there is a "mask layer". Each of the 3 layers, is provided with a proper coupler in microscopic globules carried on organic carriers; these "couplers" are capable of producing a dye of desired colour after reaction. These couplers are fixed in their positions and all the possibilities

of wandering about are closed. After exposure, the film is allowed to react with the developer, diphenylene diamine (or its derivative) so that metallic silver and the oxidised diphenylene diamine are produced; the latter dissolves in the organic carrier and couples with the selected body therein forming the dye. The utility of the mask layer is only to improve the print. Thus finally we get a negative containing the image in the dye. This should be printed on papers which are similar in construction to the film only the mask layer being exempted.

Kodachrome, however, is somewhat different from Kodacolor, though the overall principle is the same. This is also composite in nature consisting of 3 layers of silver salt emulsions as before. Each layer is separated from the other by gelatin. Exposed films are first put in the usual developing solution so that a silver image is produced throughout the whole film. Next, the film is exposed to red light through the base of the film; unaffected silver salt is thus affected. The film is again put in a special developing solution containing cyan couplers which can produce dye of desired colour by coupling with the oxidised developer. Thus, due to secondary development, an image in cyan dye is produced. Then, the top layer is exposed to blue light and developed in a special solution containing a special coupler so that image in the desired dye is produced. Last of all, the middle layer is exposed to green light and developed in a similar way. Hence ultimately we get an image consisting of dyes only. The silver image is also present at the final state. The next step involves the removal of Ag^1 produced by the secondary exposures, unchanged Ag-halides and the original Ag-image leaving behind the image consisting of dyes. In this way, the Kodachrome is made directly into the final transparency in colour. Kodachrome, in spite of its composite nature, is as thin as ordinary "black-and-white photography" films.

Usually, uncoloured couplers are used in Kodachrome etc. But it has been experimentally seen that the definition of the image is increased many times by the introduction of coloured couplers. This was first utilised in "Ektachromes" which have come out in the market in August 15, 1949.

The chemical reactions involved between the developer, Ag-halide and the couplers, are symbolised below:—

Any unreacted coloured coupler molecule exists unaffected even at the final stages. This, as one should understand readily, is the whole chemistry behind the philosophy of the coloured photography.

The subject is still in its formative period and we expect more and more developments in this new, astonishing branch of photography. This particular branch is sure to oust all other branches, in days to come.

¹Ag means silver.

Use of Radio Isotopes in Medicine and Industry

KIRON BORDOLOI

Sixth Year, M.Sc.

Modern news paper readers are familiar with tales of isotopes rushed to hospitals, of isotopes used in industry to determine wear in pistons or to control the dyeing of fabrics, even of isotopes used in sport to locate elusive golf balls. The extensive use of radio isotopes, obtained as a by-product of work on atomic energy, occupied the attention of the nuclear physicists in different parts of the world. They made a vigorous research in this field or long ten years and were successful in applying economically in medical therapeutics and in industrial processes.

What is an Isotope?

The nucleus of an atom is built up of protons and neutrons. In all the atoms of a given element the number of protons in the nucleus is constant, it is called the atomic number. With this fixed number of protons there may be associated a varying number of neutrons. This means that all the atoms of any particular element have the same chemical properties; but their masses may differ (because the mass of an atom is equal approximately to the sum of the masses of the protons and neutrons in the nucleus). These different forms of the same element are called the isotopes of the element. The isotopes of one element differ from one another in their physical not their chemical properties. There are two types of isotopes—stable and radioactive. The radioactive isotopes are those whose nuclei break down spontaneously and emit particles or electromagnetic waves or both. At least one radio active isotope is known to exist for all known elements. The two features of radioactive-isotopes that give them their technological importance are that they are indistinguishable in their chemical properties from the stable isotopes of the same element, and that they emit radiation which can be detected by various means, such as photographic films, electronic instruments like Geiger Müller counters and the scintillatrons produced in certain phosphors and organic crystals. Although some radio isotopes occur in nature, most of them are made artificially by bombarding stable elements with neutrons, protons and denterons (nuclei of the heavy hydrogen atom). For the production of isotopes formed by neutron bombardment the nuclear

reactor is obviously supreme, since it generates neutrons in far larger quantities than any other device.

Isotopes in Medicine :

Radioactive isotopes are extensively applied in biological and medical investigations. Their uses for these purposes are based on the fact that biological organism cannot distinguish between a radioactive element and its non-radioactive counterpart, since the two are chemically identical. Therefore, if somebody drinks or has injected into him a solution containing a radioactive isotope (for example radioactive iodine 131), mixed with its stable naturally occurring isotope (in this instance iodine 127), the active and inactive isotopes will follow exactly the same paths in the body. But the location of the radioactive substance can readily be determined by the effect of its radiations on suitable detecting instruments and since whatever happens in the body to the iodine 131 also happens to the stable iodine, the fate of the latter can be established. In this instance, the iodine goes to the thyroid gland, which is the chief store house of iodine in the body, and much of our understanding of the functions of this gland and the effect of certain drugs upon it has been obtained with the help of radioactive iodine. Thus tracer experiments with iodine 131 showed that iodine in iodides is converted by the thyroid to thyroxin and the latter is thyroid hormone. Moreover, this particular tracer application of iodine 131 is used in the diagnosis of diseases of the thyroid: by means of a suitable Geiger counter the shape of the gland can be traced quite accurately and of the intensity of the radiation is measured an indication can be obtained of the rate at which iodine is taken up by the gland. If there is an advanced cancer of the gland and fragments of the diseased tissue have broken off and moved to other parts of the body, they can be located by radiations and excised surgically.

Another interesting application of radioactive tracers to medical diagnosis is the use of sodium 24 to determine the rate of flow of blood, for example, when it is suspected that there is restriction, as in thrombosis. Suppose a Geiger counter is placed on the patient's hip and an active sodium chloride solution injected into a vein in his foot, the interval of time that elapses between the moment at which the injection is given and at which the counter begins to respond, indicating that blood containing active sodium is flowing in the hip will show how long it has taken the blood to flow up the leg. If the time taken is so long, compared with the other leg, as to suggest that there is a constriction in the arteries, the position of this constriction can be found quite accurately by moving the counter down the leg. This principle can be extended to study the pumping action of the heart. Another active isotope, phosphorous 32, can be used to measure the total volume of blood in the body: by comparing the activity in unit volume of the blood with a standard sample suitably prepared. In another field, that of botanical

and biological research, much new knowledge of photosynthesis in plants and of metabolism in cells has been obtained from tracer experiments with compounds containing radioactive carbon 14.

It has been noted that in addition to their use in medical research and diagnosis, some radio isotopes have therapeutic applications; for example the long established treatment of tumours by gamma-rays from radium. These therapeutic applications depend on the fact that the radiations produce ions in diseased tissues and destroy them. In some treatments diseased parts are irradiated from outside the body, the external source of radiations may be an x-ray tube, radium or nowadays a radioisotope like cobalt-60. Cobalt 60 is a strong gamma-emitter which has many advantages over radium, particularly that it is cheaper and emits much more homogeneous gamma-radiation and much softer beta-radiation which can be filtered out; also there is no danger of radioactive contamination of radon gas. It can, moreover, be machined to any desired shape or size before irradiation, or it can be drawn into thin wire; in this very radioactive sources can be tailored to fit any special needs. An alternative method of treatment is to take the advantage of the property of preferential uptake, which we have discussed in connection with iodine; thus if a patient is given a dose of a solution containing iodine 131 in much greater strength than that required for tracer use, the radiations from the great concentration of iodine which builds up in the thyroid will be absorbed in the diseased tissue, as otherwise it will not be possible to get enough radioactive substance into the tumour to destroy the malignant cells without at the same time destroying normal cells elsewhere. Unfortunately, there are many conditions for which this necessary prerequisite cannot be satisfied, so far at any rate.

Isotopes in industry :

Isotopes are extremely good tools for finding solidification boundaries in continuous casting process of aluminium. In process of improved casting two different methods were used. The first is called "activation analysis", in which the sample to be investigated, is irradiated in a nuclear reactor after a trace of non-active material has been added during the casting process. Conclusions can then be drawn from simple autoradiographs.

In the other method, a radioactive component was added during casting. Both methods proved to be highly successful and helped to improve the casting process.

Gauges containing radioactive materials are also helping industry to produce better quality products and to save time in locating faults. These have proved of great value in measuring the thickness of materials being rolled—such materials as paper, plastics, linoleum rubber or sheet material. The latest developments in this type of gauge enable speedy location of corrosion in pipes without dismantling the installation. With this gauge, one operator

can detect from the outside any corrosions within the pipes, eliminating the need to halt production and saving the expense of x-ray equipment.

Another use of radioisotope is detecting leakages. A paper read at International Radioisotope Conference dealt with the use of isotopes for waterflow and velocity measurements. Further progress has been made in this field since then, perhaps the most outstanding achievement being the ease with which it is now possible to detect leakages in pipelines—hitherto an exceedingly difficult task.

To trace a leak in an underground pipeline, a radioactive salt is dissolved and put into the pipe, which is then washed out with clean water. A recording detector is sent through the pipe; this records any activity that has leaked out into the surrounding ground, and by knowing at what time this records was at each place during its journey, it is possible to find the exact spot where the leakage has occurred.

This simple method will save considerable sum in the future detection of leaks.

Isotopes are also being used in construction of pipe lines, wherever a pipeline is being laid, all wells have to be checked with the help of x-rays, but to use a conventional x-ray apparatus in the field presents problems of its own, for electrical supplies are needed, and x-ray sets require maintenance. By the use of radioactive isotopes no longer than a small pea, the need for special power lines and the problem of maintaining complicated equipment are overcome.

Radio activity can be used, too, to reduce or prevent fire risks in certain types of factories. In the manufacture of paper and textiles or any other insulating materials, for example, it is quite common, specially in dry climates, for static electricity to be produced by rubbing of the material. If the static electricity potential is too high, there is a danger of sparking and therefore a big fire risk.

Engineers have for long been seeking a means of getting rid of "static", which can now be achieved fairly easily and cheaply by installing a radioactive source near the place where it is being formed. In most cases this will overcome the fire risks and in some instances production can be increased, for machines can be operated at higher speed once the formation of static electricity has been mastered.

Thus radio isotopes have found wide application even in its stage of infancy. The future awaits its maximum lines of applications.

Farewell Address of Prof. S. C. Sircar to the Students of the College

DEAR FRIENDS,

For almost a quarter-century, without a break, I have been lecturing and talking in the precincts of this College, and it seems that even today a speech is expected of me. But all of you will understand how difficult it is for me to talk coherently at a time like this. Leaving Presidency College is such a wrench in my personal life that I cannot trust myself to control my emotion. The gracious words to which I have been listening have moved me so deeply that any conventional words of thanks will seem inept and inappropriate. I have been touched specially by the fact that many students who are not even directly my pupils, wanted to bid farewell to me. This is indeed a proud moment in my life.

Memories throng upon the mind thickly on an occasion like this. Almost forty years from today, I entered the College as a young boy, pulsating with life and eager curiosity. I spent six happy years here—perhaps my happiest years. For four of these, I was living across the street in our beloved Hostel. I only hope that the students of today have as happy an experience as we had in our days.

Memories of great teachers gather round me as I speak today. I must mention two of them separately—Kuruvila Zachariah whom I have always regarded as my 'guru', and Praphullachandra Ghosh than whom I cannot imagine a more inspiring teacher.

I left the College in 1923, and ten years afterwards it was one of the happiest moments in my life when my old College called me back to join the ranks of its teachers. Since then for twentyfour years I have directly shared the joys, the sorrows, the triumphs, and the failures of the institution. Today I am standing on the brink of the break in that direct link.

At a moment like this, one must try to face things philosophically. In the personal life of an individual, such a break is a necessary end which will come when it will come. In the life of an institution, whatever void one may leave behind will be filled up in the course of time. All wounds are healed by Time, the refreshing river.

I have been, I suppose, regarded as a fairly successful teacher. Looking back today, I feel however that what little I could do is overshadowed by the vast undone. And if there has been any success, that has been due primarily

to the response I have received from the streams of young people who, year after year, have flowed through the portals of the College, and have patiently listened to me. Day by day I have watched bright young minds, unfolding like flowers, petal after petal—if I may paraphrase the words of one of the greatest teachers in our history.

My young friends, I have never presumed to give any direct advice to you or your predecessors, but today you will forgive me if I claim the privilege of old age and retirement. Try to build up in your lives a devotion to something impersonal—as distinct from personal ambition, career, wealth, fame, family ties, or personal relationships. Try to cultivate a love for something impersonal—an institution, pursuit of knowledge for its own sake, some abstract idea, some cause, some movement. In the words of a great figure in history, in relation to the image of his native city,—let your thoughts dwell upon it day by day till the love of it fills up your mind. Impersonal love does not mean that you must be blind to the limitations in the thing you love—you love it in spite of these. That is the way to gain strength, courage, endurance, dignity, a stature, and some nobility in life.

I offer my most grateful thanks to the members of the College, my colleagues and my students, for the love and affection which has been showered on me. Thank you again.

18.12.56

Editorial

In India today we are living in a period of transition. Far-reaching changes in the economic, social and political order of our society are taking place. To explore the character and the future development of these changes is a task which is both fascinating and inspiring. But since all the contributors to our magazine have concentrated their attention on subjects of academic interest, it has been left to the editor to make an attempt to outline the main directions of these far-reaching changes.

I

India today has entered into an era of planned economic development. National economic planning always derives its meaning and direction from the aspirations and goals of the society within which it operates, of the people whom it serves. The aspirations of the people in our country today are to rise above their abject standard of living and to conquer for ever their four great enemies: poverty, unemployment, hunger and disease. Hence the all-out effort to build an integrated national economy, industrialize the country, extend its transport facilities, expand agricultural production, wipe out mass unemployment, raise the living standard so that the doors of a richer and more varied life can open out before the eyes of our teeming millions.

The path of economic transformation of our society, as we have visualised it, is radically different from that followed by the majority of the leading nations of the world today. In countries like U.K. or U.S.A. economic development was promoted chiefly through the initiative of private capitalists and this pattern of development was naturally associated with growing inequalities in income and wealth.

We, in India, have rejected such a line of advance not only because the private enterprise is economically weak in our country to undertake such gigantic programmes of development but also because of our inherent aversion towards the acquisitiveness of society. The philosophy behind economic planning in our country is that "the basic criterion for determining the lines of advance must not be private profit but social gain." The benefits of economic development must accrue more and more to the relatively less privileged classes of society so that a new milieu for the common man can be created.

To usher in this new milieu the State will have to play the crucial role. It has to act as the principal agency speaking for and acting on behalf of the community as a whole. A rapid expansion of the economic and social

responsibilities of the State will alone be capable of satisfying the hopes and aspirations of the people today. This need not involve complete nationalization of the means of production at the present stage. It does mean, however, a progressive widening of the public sector and a reorientation of the private sector to the needs of a planned economy.

The assumption of the responsibilities for economic development by the State, however, does not signify an automatic solution of all the problems. In the under-developed societies the aspirations of the people far exceed the possible limits of actual performance. This gap grows wide as development proceeds and as the Plan requires more and more austerity on the part of the people it begins to lose that popular support which is vital for its successful working.

Economic planning in our country today is also sharing the same fate. In the end of the first year of our Second Plan the people of our country, faced by an increasing burden of taxes, soaring prices, rising unemployment are becoming alarmingly pessimistic over their economic future.

Such an outcome is inevitable if economic planning proceeds within the existing socio-economic framework. In fact, if one takes the social institutions and social relationship as given, one can never overcome the contradictions between growth and equality or between technical progress and employment that are rooted in the very structure of an underdeveloped economy. The only way that then remains is to make a retreat from the ambitious path of progress and slow down the pace of development.

But there is another way out of the impasse and paradoxically enough, this lies not in slowing down but in accelerating the pace of development. And this, it must be emphasized, is possible only when there is a right approach to the problem of development, only when economic planning is viewed as an integral part of a wider process aiming not merely at the development of resources in a narrow technical sense but at the development of human faculties and the building up of an institutional framework adequate to the needs and aspirations of the people. In planning for a better economic order a readoption of social relationships and a reorientation of social institutions thus becomes necessary so that the community can draw upon the latent energies within itself to an extent which insures development at rates much faster than what the blue-print of the plan might suggest. As Maurice Dobb, writing about the experiences of Soviet planning, has remarked "Planning in a backward economy must not be concerned with economic problems only, it must be concerned equally, if not more, with wider issues concerning those social relationships that compose the basic texture of society."

II

In a society involved in a process of transition a struggle ensues between the out-worn social forms and the new urges which cannot be contained in

the old moulds. In this struggle the new forces generally emerge as victorious. The old social units like the joint-family systems disappear with the erosion of the social systems based on status (slavery, serfdom, caste, family, race) and they are substituted by systems based on contract and upon equality of opportunity with a high level of vertical social mobility. This breakdown of social hierarchies and the removal of restrictive strata give for the first time a sense of liberty and equality to the millions which had formally accepted their lowly position in society as ordained by fate.

In India today we are also witnessing such a revolutionary break from the past social order. But to make the process of transition smooth and frictionless and to utilize the tremendous release of human energy in the task of national reconstruction, such social changes have to be consciously planned and directed. From the very start they have to be related to the basic objectives which the society has in view. Thus the task before our planners today is to remould and refashion our socio-economic framework on democratic and egalitarian lines so that it can contribute effectively to the realization of wider and deeper social values.

In India over the last decade we have no doubt made laudable advance in certain directions of social change. Equality of opportunity has been granted to all irrespective of race, religion, sex or creed, educational facilities have been increasingly provided for the poor and the underprivileged, old social customs and conventions like untouchability that thwarted the development of human personality have been prohibited and a determined struggle has been undertaken to uproot casteism, communalism and linguism from our country.

But in those major fields of social change which have a direct bearing on the economic destiny of our country, progress has been either halting or unsatisfactory.

A major socio-economic experiment was undertaken in the vast rural sector of our economy under the First Plan to abolish feudalism and establish in its place the nuclei of a cooperative society. But in every stage of this mighty experiment concessions were made to the landed interests. Thus the landlords received compensations at exorbitant rates, large-scale eviction of tenants went unheeded, the proposal for imposing a ceiling on landholding was ceremoniously dropped by certain State governments and the landless proletariat for whose benefit the experiment was undertaken remained as poor and landless as before.

Again, in another major socio-economic field which is vital to our country's economic prosperity no experiment has even been undertaken to change certain old institutional relationships. And this is the field of labour-management relationship. What we have to remember here is that mere transformation of private industries into nationalized undertakings would not solve the conflict of class interests. In a socialist society labour

has to be accorded its due place of honour and prestige and has to be increasingly associated in the task of management of industries. This is what transforms the character of state-capitalism into cooperative socialism. But here we are yet to begin at the beginning.

In fact, our national plans have not yet launched any frontal attack on the citadels of vested interest. But mass enthusiasm in the task of national reconstruction can never be created except curtailing the rights and privileges of those classes which have come to be associated in the public mind with the inequities and deficiencies of the old order. Such actions, it may be urged, would transcend the boundaries of democratic planning and set us on the high roads to authoritarianism. Planning for socialism under a democratic framework is a difficult task, it is true, and a delicate balance has always to be preserved between coercion and cooperation. Any upset of this balance may produce harmful results but the effects would be still more disastrous if democratic planning aims at a mere preservation of the 'status quo'.

A national plan has to be an expression of a basic unity of purpose in the community. It is this unity which would constitute the ultimate sanction behind the plan, give it driving force and evoke the necessary sacrifice on the part of members. But such a unity can never be forged unless it is clearly visible to the people that out of their ordeal would emerge a new and desired type of society.

III

To explore the possibility of a synthesis of democracy and socialism in our country we cannot help enter the controversial arena of politics. After all, in a democratic form of government such as ours, it is the political parties which would shape the society of our future. Hence an analysis of their trends and goals is central to the understanding of the process of transformation of our society.

During the period of colonial rule all the parties in India had one common objective—national liberation and all other differences were submerged behind this common aspiration. When this goal was reached, for a moment there was confusion and chaos in the political scene. But it is heartening to find that in the present period of national reconstruction all the major political parties of our country are once again finding a common base of unity. And this common base is provided by their acceptance of the democratic path and the goal of socialism.

While the parties of the Left have realized the futility of revolutionary struggle under the present circumstances, the parties of the Centre have also this sober realisation that only a socialist society can today embody the hopes and aspirations of our vast multitude.

Such a broad identity of national aims should not, however, make us too much complacent. Socialism is such a vague objective that it may be interpreted differently to suit the interests of different people. It is quite possible that if any single party enjoys the monopoly of political power, vested interests would infiltrate into its ranks, capture positions of vantage within it and use the prestige of the party to serve their own selfish ends while paying a lip-service to the ideal of socialism. And if such a process continues for long, people will be slowly driven to despair and in a mighty upheaval of the discontented masses all our schemes of economic development, social uplift, cultural revolution will be swept away.

Hence the need for vigilance, the need for a ceaseless struggle against vested interests is all the more necessary today. And for this the country needs a strong democratic opposition and (if possible) an alternative government in one or two States to provide the requisite 'check and balance'. Such a change in the political perspective of our country should be welcomed by all for that would help us to renew our efforts in the task of national reconstruction on a broad united basis.

Contemporary India is seeking to achieve in decades what the Western world has taken centuries to accomplish. The development of the West was spread over at least three hundred years during which old barriers were removed and there was a liberation of man's energies that found expressions in all forms of creative activity. There is no reason why the same experience should not be repeated in India. And with our ancient traditions and the immense resources of our past culture such an efflorescence in our country will enrich the heritage not only of our countrymen but of the whole humanity.

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Editors :

- 1914-15 PRAMATHA NATH BANERJEE, B.A.
1915-16 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1916-17 MOHIT KUMAR SEN GUPTA, B.A.
1917-18 SAROJ KUMAR DAS, B.A.
1918-19 AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1919-20 MAHMOOD HASAN, B.A.
1920-21 PHIROZE E. DASTOOR, B.A.
1921-22 SYAMA PRASAD MOOKERJEE, B.A.
1921-22 BRAJAKANTA GUHA, B.A.
1922-23 UMA PRASAD MOOKERJEE
1923-24 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA
1924-25 SUBODH CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1925-26 ASIT KRISHNA MUKHERJEE, B.A.
1926-27 HUMAYUN Z. A. KABIR, B.A.
1927-28 HIRENDRA NATH MUKHERJEE, B.A.
1928-29 SUNIT KUMAR INDRA, B.A.
1929-30 TARAKNATH SEN, B.A.
1930-31 BHABATOSH DATTA, B.A.
1931-32 AJIT NATH ROY, B.A.
1932-33 SACHINDRA KUMAR MAJUMDAR, B.A.
1933-34 NIKHILNATH CHAKRAVARTY, B.A.
1934-35 ARDHENDU BAKSI, B.A.
1935-36 KALIDAS LAHIRI, B.A.
1936-37 ASOK MITRA, B.A.
1937-38 BIMAL CHANDRA SINHA, B.A.
1938-39 PRATAP CHANDRA SEN, B.A.
1938-39 NIRMAL CHANDRA SEN GUPTA, B.A.
1939-40 A. Q. M. MAHIUDDIN, B.A.
1940-41 MANILAL BANERJEE, B.A.
1941-42 ARUN BANERJEE, B.A.
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
1947-48 SUDHINDRANATH GUPTA, B.A.
1948-49 SUBIR KUMAR SEN, B.A.
1949-50 DILIP KUMAR KAR, B.A.
1950-51 KAMAL KUMAR GHATAK, B.A.
1951-52 SIPRA SARKAR, B.A.
1952-53 ARUN KUMAR DAS GUPTA, B.A.
1953-54 ASHIN RANJAN DAS GUPTA, B.A.
1954-55 SUKHAMOY CHAKRAVARTY, B.A.
1955-56 AMIYA KUMAR SEN, B.A.
1956-57 ASOKE KUMAR CHATTERJEE, B.A.
-

PRESIDENCY COLLEGE MAGAZINE

Secretaries :

- 1914-15 JOGESH CHANDRA CHAKRAVARTI, B.A.
1915-16 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1916-17 PRAFULLA KUMAR SIRCAR, B.A.
1917-18 RAMA PRASAD MUKHOPADHYAY, B.A.
1918-19 MAHMOOD HASAN, B.A.
1919-20 PARAN CHANDRA GANGOOLI, B.A.
1920-21 SYAMA PRASAD MOOKERJEE
1921-22 BIMAL KUMAR BHATTACHARYYA
1921-22 UMA PRASAD MOOKERJEE
1922-23 AKSHAY KUMAR SIRCAR
1923-24 BIMALA PRASAD MUKHERJEE
1924-25 BIJOY LAL LAHIRI
1926-27 LOKES CHANDRA GUHA ROY
1927-28 SUNIT KUMAR INDRA
1928-29 SYED MAHBUB MURSHED
1929-30 AJIT NATH ROY
1930-31 AJIT NATH ROY
1931-32 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1932-33 NIRMAL KUMAR BHATTACHARJEE
1933-34 GIRINDRA NATH CHAKRAVARTI
1934-35 SUDHIR KUMAR GHOSH
1935-36 PROVAT KUMAR SIRCAR
1936-37 ARUN KUMAR CHANDRA
1937-38 RAM CHANDRA MUKHERJEE
1938-39 ABU SAYEED CHOWDHURY
1939-40 BIMAL CHANDRA DATTA, B.A.
1940-41 PRABHAT PRASUN MODAK, B.A.
1941-42 GOLAM KARIM
1942-46 No publication due to Govt. Circular
Re. Paper Economy
1946-47 JIBANLAL DEV
1947-48 NIRMAL KUMAR SARKAR
1948-49 BANGENDU GANGOPADHYAY
1949-50 SOURINDRAMOHAN CHAKRAVARTY
1950-51 MANAS MUKUTMANI
1951-52 KALYAN KUMAR DAS GUPTA
1952-53 JYOTIRMOY PAL CHAUDHURI
1953-54 PRADIP KUMAR DAS.
1954-55 PRADIP RANJAN SARBADHIKARI
1955-56 DEVENDRA NATH BANNERJEE
1956-57 SUBAL DAS GUPTA
-

Statement about ownership and other particulars about Presidency College Patrika.

- | | | | |
|---|-----|-----|--|
| 1. Place of publication | ... | .. | Calcutta. |
| 2. Periodicity of its publication | ... | ... | 2 issues per year. |
| 3. Printer's Name | ... | ... | Prabhat Chandra Ray. |
| Nationality | ... | ... | Indian. |
| Address | ... | ... | 5, Chintamani Das Lane, Calcutta-9. |
| 4. Publisher's Name | ... | ... | Prabhat Chandra Ray. |
| Nationality | ... | ... | Indian. |
| Address | ... | ... | 5, Chintamani Das Lane, Calcutta-9. |
| 5. Editor's Name | ... | ... | Asoke Kumar Chatterjee (the name of the
Editor is changed from time to time). |
| Nationality | ... | ... | Indian. |
| Address | ... | ... | Presidency College, Calcutta-12. |
| 6. Names and addresses of individuals
who own the newspaper. | | | Presidency College, Calcutta-12. |

I, Prabhat Chandra Ray, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd/- PRABHAT CHANDRA RAY
Signature of Publisher



